বিচিত্র প্রতিভা

শ্রীদিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়

সংস্কৃতি ও গবেষণা কেন্দ্র

উৎসর্গ

গ্রন্থলোকের দরদী দিশারী

শ্রীচিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের

সু-করকমলে

সূচী

নিবেদন

জীবনী-লেখককে ঔপন্যাসিক বা গল্পকারের সমগোত্রীয় বলা যায়। কারণ তিনিও জীবনরহস্যের সন্ধানী। বিশেষ বিশেষ জীবনের রূপে আকৃষ্ট হয়ে তাঁদের আখ্যায়িকা লেখেন জীবনীর আকারে। অবশ্য উপন্যাস-গল্পের সঙ্গে জীবনচরিতের পার্থক্যও আছে। ঔপন্যাসিক-গল্পলেখক প্রত্যক্ষ জীবন থেকে উপকরণ সংগ্রহ করেন বটে কিন্তু নিজস্ব কল্পনার আদর্শে গড়ে নিতে পারেন কাহিনী। নানা জীবনের চিত্র থেকে উপলব্ধ জীবনদর্শনও প্রতিফলিত করেন। তিনি স্বরাট।

কিন্তু জীবনীরচয়িতার সে স্বাধীনতা নেই। উদ্দিষ্ট চরিত্রের বাস্তব উপাদানই তাঁর একমাত্র অবলম্বন। একান্ত তথ্যনির্ভর থাকতে হয় তাঁকে।

আমার 'বিচিত্র প্রতিভা'র ভূমিকাস্বরূপ একথা মনে হল, বইখানি যদিও জীবনী রচনার কোন বড় কাজ নয়। সাতটি জীবনচরিতের সংকলন। আকৃতিতে ছোটগল্পের মতন। তবে আকারে বৃহৎ না হলেও তাঁদের স্মরণীয় জীবনের রূপ পাওয়া যাবে অন্তরঙ্গভাবে।

প্রেমাঙ্কুর আতর্থী, রাজশেখর বসু, ধনগোপাল মুখোপাধ্যায়, দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার, গল্পদাদা (যোগেশচন্দ্র বসু), কর্ণেল সুরেশ বিশ্বাস এবং শিশিরকুমার ভাদুড়ি মহাশয়ের জীবনকথা নিয়ে এই বই।

তাঁদের সকলের প্রতিভার ক্ষেত্র অবশ্য এক নয়। প্রথম চারজন ত সাহিত্যিক। সে ক্ষেত্রেও তাঁদের বিভিন্ন প্রকৃতির মানস। শেষোক্ত-ব্যক্তি নাট্যাচার্য-নট। সুরেশ বিশ্বাস অভিযাত্রী। আর গল্পদাদার পরিচিতি লেখাটি না পড়লে জানা যাবে না।

তাঁরা সমবৃত্তির না হলেও তাঁদের জীবনচরিতের সহাবস্থানে বাধা কোথায়? তাঁদের দান, কৃতী ও বৈশিষ্ট্যের জন্যে স্মরণী রক্ষা করবার ইচ্ছা জাগে। তাঁদের কজনের সঙ্গে যে সাক্ষাৎ পরিচয় ছিল, তাও লেখার অন্যতম প্রেরণা। প্রতিভা বৈচিত্র্য নিয়েই আমাদের সাংস্কৃতিক সমৃদ্ধি। তাঁরা সকলেই আপন আপন ধারায় জাতীয় সংস্কৃতির সুবর্ণ-

ফল। কর্ণেল সুরেশ বিশ্বাসকেও সংস্কৃতিক্ষেত্রে গণ্য করা যায় তাঁর শেষ জীবনের আন্তর বিবরণ লক্ষ্য করলে। তাঁর সম্পর্কে সমস্ত উপকরণই নিয়েছি উপেন্দ্রকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত 'কর্ণেল সুরেশ বিশ্বাস' নামে তাঁর একমাত্র এবং দুষ্প্রাপ্য জীবনী পুস্তকটি থেকে।

লেখাগুলি অনেক বছর আগে 'প্রবাসী' ও 'দেশ' পত্রিকায় বেরিয়েছিল। এখন নতুন করে লেখা হল পরিমার্জিত আকারে। আতর্থী মহাশয়ের প্রসঙ্গটি তাঁর 'মহাস্থবির জাতক' অখণ্ড সংস্করণেও প্রকাশিত হয়েছে।

প্রেমাঙ্কুর, দক্ষিণারঞ্জন ও শিশিরকুমারের অনেকখানি বৃত্তান্ত তাঁদের মুখেই শোনা। সাংবাদিকতা-সুলভ একদিনের 'সাক্ষাৎকার' বিবরণ নয়, নানাদিকের কথাবার্তায় জানা। তা ভিন্ন ভাদুড়ি মহাশয়ের প্রথম অভিনয় জীবনের কিছু তথ্য দিয়েছেন তাঁর স্নেহভাজন অমল মিত্র। নাট্যাচার্যের শেষদিনের সংবাদ তাঁর অনুজ মুরারিমোহন জানিয়েছেন। আতর্থী মহাশয়ের পুস্তক ইত্যাদির তালিকাটি তাঁর স্নেহাস্পদা, কবি উমা দেবীর প্রস্তুত এবং তাঁর সৌজন্যে প্রাপ্ত। ধনগোপালের অনেক কথাই পেয়েছি তাঁর অগ্রজ, স্বনামপ্রসিদ্ধ বিপ্লবী যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়ের কাছে। ধনগোপালের চিঠিখানিও তিনি আমায় মুদ্রণের জন্যে দিয়েছিলেন। রাজশেখর বসু মহাশয়ের প্রায় সব বিবরণই জানান তাঁর সুদীর্ঘকালের সুহৃদ, চিত্রশিল্পী যতীন্দ্রকুমার সেন। গল্পদাদাকে আমি ছেলেবেলায়, ১৯৩০ সাল থেকে বহুবার দেখেছি। মাঝে মাঝে তাঁর বেতার আসরে আবৃত্তি করতে গেছি আসরের একজন হিসেবে। সেখানে সামনে বসে তাঁর তাৎক্ষণিক (extempore), বহু-বিচিত্র সব গল্প বলা কতদিন উপভোগ করেছি। বড় হয়ে, অনেক পরে তাঁর বিষয়ে কৌতূহল জেগেছে—সেই আশ্চর্য প্রতিভাধর মানুষটির পরিচয় কি, পটভূমি কেমন? তখন তাঁর প্রথম ও দ্বিতীয় পুত্র, কমল বসু (লণ্ডন বি.বি.সি.তে দীর্ঘকাল নিযুক্ত) ও সাংবাদিক বিমল বসুর কাছে গল্পদাদার জীবনকথার সন্ধান পেয়েছি। বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র মহাশয়ও কোন কোন তথ্য জানিয়েছেন।

তাঁদের সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই।

বইটি সযত্নশোভনভাবে এবং সহৃদয়তার সঙ্গে প্রকাশের জন্যে পরিমল চন্দ্র মহাশয়কে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ। বিখ্যাত 'বঙ্গ-সংস্কৃতি সম্মেলন' অনুষ্ঠানের সঞ্চালক এবং অন্যতম প্রতিষ্ঠাতারূপে তাঁর সংস্কৃতি-প্রীতি ও সংগঠনী শক্তি সম্মেলনের গবেষণা বিভাগেও মূর্ত ও সার্থক হোক, এই শুভকামনা করি। ইতি

১৬ই ডিসেম্বর, ১৯৬০
ললিত নিলয়
৩৯ একবালপুর রোড,
কলিকাতা-২৩

শ্রীদিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়

১ | মরমী কথাশিল্পী

"যখন গল্প লিখলুম, লোকে বললে, এসব আমার নিজের কথা। আর যখন আত্মজীবনী লিখলুম, সবাই বললে গল্প লিখেছি।"

সাহিত্যশিল্পী প্রেমাঙ্কুর আতর্থী বলতেন ঈষৎ মনঃক্ষুণ্ণ হয়ে। নিজের সাহিত্যকর্মের বিচারে পাঠকদের বিবেচনা-শক্তিকে যেন বিশ্লেষণ করতেন। পাঠকদের এ কেমন সিদ্ধান্ত? গল্পের কল্পনাকে তাঁরা লেখকের নিজের কথা অর্থাৎ বাস্তব এবং জীবনস্মৃতিকে অলীক কাহিনী সাব্যস্ত করেছেন! তাঁর লেখা পড়ে কল্পনাকে বাস্তব এবং বাস্তবকে কল্পনা মনে করায় তিনি যেন হতাশা বোধ করেন। তাঁর হয়তো ধারণা হয়েছিল, তাঁর সাহিত্যের আবেদন সেই পাঠকদের মনে সঠিক সাড়া জাগাতে পারেনি। তাই সে নিবিড় দুঃখ-সুখের বিচিত্র জীবন-লীলা, বাস্তবের নানা অঘটন-ঘটন লোকের কাছে অ-যথার্থ বোধ হয়েছে। কল্পিত মানস-বিলাসের কলা-কৌশল দেখা দিয়েছে সত্যের রূপে। লেখক হয়তো চিন্তা করে দেখেননি, তাঁর রচনা সার্থক হওয়ার জন্যেই পাঠকদের এই চিত্তবিভ্রম। পাঠকের মন এমন ক'রে হরণ করে যে সাহিত্য তা শিল্পকর্মরূপে সাফল্যেরই নিদর্শন।

প্রেমাঙ্কুর আতর্থীর সাহিত্যকৃতি এই শ্রেণীর। তাঁর রচনায় অলীক ও সত্য, ভাব ও বস্তু অঙ্গাঙ্গী মিশে গিয়ে, ঘটনা ও মানস একান্ত অন্তরঙ্গ হয়ে পাঠকের চিত্তে এক গভীর অনুভব সৃষ্টি করে। আন্তরিক হৃদয়াবেগে উদ্বেল তাঁর সাহিত্য দেখা দেয় পরম উপভোগ্য হয়ে। পাঠকের মন এক অপরূপ

আনন্দ-বেদনার রসে আপ্লুত হয়। দরদী লেখকের অসামান্য বর্ণনাশক্তির গুণে ঘটনাবলীর সত্য ও মিথ্যা কতখানি, এ প্রশ্ন তখন অবান্তর। জীবনের সত্য সাহিত্যের সত্য হয়ে পাঠকের চেতনায় একাকারে মিশে যায়। এমন জীবন্ত, এমন রস-সমুজ্জ্বল তাঁর সাহিত্য-রচনা। মানুষের রূপলোক ও অন্তরলোকের শিল্পসুন্দর উদ্‌ঘাটনে, সজীব নিসর্গ-চিত্র, মর্মস্পর্শী প্রকাশরীতি ও বর্ণনাশৈলীতে তিনি পাঠকদের মন অধিকার করে নেন।

মরমী কথাশিল্পী প্রেমাঙ্কুর আতর্থী ছিলেন জাত-সাহিত্যিক। প্রাণের প্রতপ্ত আবেগ, যথার্থ শিল্পীমানস এবং বিপুল অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ জীবনকে তিনি সাহিত্যায়নে নিয়োজিত করেছিলেন। তিনি বলতেন—"Feel করলেই লেখা যায়।" এটি তাঁর বিনয়ের কথা। অর্থাৎ তিনি অনুভব করতে পেরেছিলেন ব'লেই যেন লিখতে সক্ষম হন। লেখা এমন কিছু কঠিন ব্যাপার নয়।

কথাটি সঠিক ব'লে মেনে নেওয়া যায় না। অনুভব তো মানুষমাত্রেই ক'রে থাকে। কিন্তু তার প্রকাশ-ক্ষমতা আছে ক'জনের? শিল্পী ভিন্ন তা সম্ভব নয়। আর যেমন-তেমন প্রকাশ হ'লেও চলে না। শিল্পসৃষ্টির মাধ্যমে সেই ভাব সঞ্চারিত করা চাই অপরের মনে।

তিনি নিজেও এ-কথা অন্যরকমভাবে একবার লিখে-ছিলেন: "মানুষমাত্রেই, সে নারী হোক বা পুরুষই হোক, ভালবাসার শক্তি তার সহজাত; কিন্তু ভালবাসা প্রকাশ করবার শক্তি যে দেবদুর্লভ। ঠিক রসিক ও কবিতে যে পার্থক্য।" ('মহাস্থবির জাতক', দ্বিতীয় পর্ব)

তিনি ছিলেন দুর্লভ শক্তির অধিকারী, স্বভাবশিল্পী। তাই তাঁর মর্মোৎসারিত রচনা পাঠকের প্রাণে প্রত্যক্ষ সাড়া জাগায়। মনে হয়, তাঁর সৃষ্ট সব চরিত্র জীবন থেকে উঠে এসেছে তাঁর লেখায়। লিপি-নৈপুণ্যে তাদের চোখের সামনে দেখা যায়, এমন সজীব। পাঠকদের ধারণা হয় যে গল্পের পাত্রপাত্রীরা বাস্তব জগতের মানুষ, বর্ণিত কাহিনী একদিন সত্যই ঘটেছিল।

আরো একটি কারণে তাঁর গল্পগুলি তাঁর 'নিজের কথা' অর্থাৎ সত্য মনে হয় অনেক পাঠকের। তা হ'ল—তাঁর উৎকৃষ্ট অনেক গল্পের মূল চরিত্র ও আখ্যান বাস্তব-জীবন থেকে নেওয়া। দৃষ্ট ও শ্রুত জগৎকেই তিনি আপন অনুভবের রঙে রঞ্জিত ক'রে তাঁর সাহিত্যের উপাদানস্বরূপ ব্যবহার করেছেন।

এ-বিষয়ে কয়েকটি দৃষ্টান্ত এখানে দেওয়া যায়। তাঁর গল্পগুলির মধ্যে একটি শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি 'মতিলাল', বাস্তবের ভিত্তিতে রচিত। বাস্তব-জগতের মতিলাল প্রেমাঙ্কুরের সুপরিচিত ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁর চরিত্র সমগ্রভাবে গল্পটির আকারে প্রকট হয়নি। গল্পের প্রয়োজনে শিল্পী প্রেমাঙ্কুর তাঁর জীবন-কাহিনী সুসমঞ্জসভাবে পরিবর্তিত ও অনুরঞ্জিত ক'রে দেন। তাঁর অপর একটি গল্প 'বড়দা' সম্পর্কেও এ-কথা প্রযোজ্য।

'পাগলিনী'র আখ্যানভাগ সম্পূর্ণ সত্য। উত্তর কলকাতার সুকিয়াস স্ট্রীট অঞ্চলে একসময় এই ভিখারিনীকে সকলে জানত। পাগলিনীর সঙ্গে কয়েকদিন কথা বলেন প্রেমাঙ্কুর। এই গল্পে তাঁর নিজস্ব সংযোজন হ'ল, শেষাংশের শ্যাম (কৃষ্ণ)

সম্পর্কে বিবৃতিটি। তাঁর দেখা পাগলিনীর জীবনে এই মহৎ উপসংহার ছিল না। এই অংশটুকু যুক্ত ক'রে দিয়ে গল্পটিতে তিনি যে অভাবনীয় উচ্চাঙ্গের ব্যঞ্জনা দেন, তা তাঁর নিজস্ব শিল্পকর্ম—শিল্পী-মানসের এক উজ্জ্বল স্বাক্ষর। 'শেফালী' গল্পের মূলেও সত্য আছে, তবে পরিবেশ রচনার জন্যে অনুকূল কাল্পনিক আবহ সৃষ্টি করেন। পশ্চিমাঞ্চলের সেই কুষ্ঠরোগীর ছোটগল্পটি সম্পূর্ণ বাস্তব উপকরণ নিয়ে হুবহু লেখা।

'হিন্দু-মুসলমান ফ্যাক্ট' গল্পে যে ওস্তাদজীর বর্ণনা আছে তা সাক্ষাৎভাবে বিখ্যাত সরোদ যন্ত্রবাদক করামৎউল্লার চরিত্র অবলম্বনে গঠিত। ওস্তাদ করামৎউল্লার কথা প্রেমাঙ্কুরের সঙ্গীত-শিক্ষা-প্রসঙ্গে উল্লেখ করা হবে। এই গল্পে করামৎ-উল্লার চরিত্র, ধ্যান-ধারণা ও কথাবার্তার ধরন-ধারণ সঠিক ভাবে বর্ণনা ক'রে লেখক দেখিয়েছেন যে হিন্দু-মুসলমান মিলনের জন্যে pact যতই হোক, মুসলমানের ধর্মাহঙ্কারের জন্যে আসল fact অন্যরকম। ১৯২৬ সালে কলকাতার দাঙ্গার অব্যবহিত পরে তিনি এই গল্পটি লেখেন।

তাঁর 'তখ্ত-এ-তাউস' শিশিরকুমার ভাদুড়ীর পরিচালনায় ও প্রধান ভূমিকায় শ্রীরঙ্গম মঞ্চে অভিনীত হয়েছিল। সেই ব্যক্তিগত কথা নিয়ে লেখা একটি হালকা সরস রচনা হ'ল তাঁর 'নাট্যকার' নামে গল্পটি। এমনিভাবে দেখা যায়, তাঁর বেশীরভাগ গল্পে তিনি সম্পূর্ণ বাস্তব উপাদানে তাঁর গল্পগুলি গঠন করেছেন। এ-বিষয়ে অধিক উল্লেখের প্রয়োজন নেই। নিজের অভিজ্ঞতার বাইরে যেমন বেশি যাননি, তেমনি কল্পনার আশ্রয়ও বেশি নেননি সাহিত্য-

সৃষ্টির ক্ষেত্রে। তাঁর অনেক সার্থক গল্প এই পর্যায়ের। অবশ্য কিছু গল্প তাঁর আছে যা নিজের অভিজ্ঞতা-প্রসূত নয়। কিন্তু সেখানেও কল্পিত কাহিনী তেমন স্থান পায়নি। এসব ক্ষেত্রে তিনি অন্যের জানাশোনা ঘটনা বা বিবৃতি নিয়ে কাজ করেছেন গল্পের উপকরণ হিসাবে। তাই থেকে আখ্যানভাগ পুনর্গঠিত করেছেন। তাঁর একটি অনবদ্য সৃষ্টি 'দুই রাত্রি' এই শ্রেণীর রচনা। এই মর্মস্পর্শী কাহিনীকে ছোট উপন্যাস না ব'লে বড়গল্প বলাই সমীচীন। এমন আন্তরিকতার রসে 'দুই রাত্রি' গল্পটি নিষিক্ত, বর্ণনাশক্তির গুণে এর মূল চরিত্রদুটি, বিশেষ নায়িকার, এমন জীবন্ত এবং ঘটনা-বৈচিত্র্য এমন আকর্ষক যে পাঠকের স্বভাবতই মনে হয়, এ গল্প লেখকের নিজের কথা। অন্তত তাঁর স্বচক্ষে দেখা। কিন্তু তা নয়।

এর মূল আখ্যান অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত এবং সংবাদপত্রে প্রকাশিত একটি ঘটনার বিবরণ মাত্র। শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথ খবরের কাগজের এই অংশটি প্রেমাঙ্কুরকে গল্প-রচনার জন্য দিয়েছিলেন। জামাতা, সাহিত্যিক মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের অন্তরঙ্গ সুহৃদ প্রেমাঙ্কুরকে বিশেষ স্নেহ করতেন অবনীন্দ্রনাথ।

সংবাদপত্রের সেই সামান্য বিবৃতিটিকে প্রেমাঙ্কুর এক অসামান্য সাহিত্যশিল্পে পরিণত করেন। গল্পের ভূমিকা, পরিবেশ, বিস্তারিত আখ্যান এবং নায়ক-চরিত্র লেখকের কল্পনা। এই নায়ক মূল গল্পে ছিল না। তাকে গল্পের ঘাত-প্রতিঘাতের সঙ্গে যুক্ত ক'রে দিয়ে যেভাবে পরিণতির পথে নিয়ে গেছেন তা তাঁর বিশিষ্ট প্রতিভার দ্যোতক।

গল্পের অনেক স্থানে এমন প্রগাঢ় জীবনবোধের প্রকাশ ঘটেছে যে পাঠকদের অভিভূত হতে হয়। যথা: "জীবনযাত্রা শুরু করবার আগে রানী খুব চড়াপর্দায় সুর বেঁধেছিল। কিন্তু সংসার তাকে বুঝিয়ে দিলে, যে-পর্দায় সুর বেঁধেছিল সে-পর্দায় সুর বাঁধাই চলে, বাজানো চলে না। জীবন-যন্ত্রের সমস্ত তারগুলি আলগা ক'রে দিয়ে আবার সে নতুন পর্দায় সুর বাঁধলে।" তাঁর 'বৌঠান' গল্পের আখ্যান বস্তুত 'দুই রাত্রি'র মতন সংবাদপত্রের একটি ঘটনা। এটিও অবনীন্দ্রনাথ তাঁকে খবরের কাগজ থেকে দেন। তাঁর আর একটি গল্পের ঘটনাস্থল হ'ল পশ্চিমের এক দেহাতী অঞ্চল। 'আমি'র জীবনীতে বিবৃত এই গল্পে সেখানকার এক নারীর নিরুদ্দিষ্ট স্বামী ভ্রমে নির্যাতিত হবার কৌতুক-করুণ বর্ণনা এমন নিখুঁত-ভাবে করা হয়েছে যে, মনে হয়, তা লেখকেরই এক প্রাণান্তকর অভিজ্ঞতা। আসলে এটি সেসিল বি. ডি. মিলি-র একটি বইয়ের এক ঘটনার পরিবর্তিত রূপ।

এমনিভাবে তাঁর হৃদয়গ্রাহী রচনাশক্তির গুণে চরিত্রগুলি জীবন্ত হয়ে পাঠকের মনশ্চক্ষুতে দেখা দেয়। তা সে-কাহিনী তাঁর নিজস্ব অভিজ্ঞতা কিংবা অন্যের কাছে পাওয়া গল্প, যাই হোক। এমন বেশ কয়েকটি ছোটগল্প তাঁর আছে যা ভুলে যাবার নয়।

তাঁর সাহিত্যসৃষ্টির একটি গূঢ় কথা এই যে, মানুষকে তিনি অন্তস্তল পর্যন্ত গভীরভাবে দেখতেন। তাকে স্বরূপে উদ্‌ঘাটিত করতেন যথার্থ শিল্পীর হাতে। তাঁর অতিশয় সংবেদনশীল ও স্পর্শকাতর মনে বিশেষ ধরণের (টাইপ) চরিত্র আকর্ষণ জাগাতো বেশি। মানুষটিকে তিনি ছাঁকা তুলে

নিতেন মনের পটে। সেই বিশিষ্ট মানুষটিকে। তার সংসার বা পরিবার এসবের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ক'রে নয়। তারপর গাঢ় হৃদয়ানুভবে তাকে সঞ্জীবিত ক'রে প্রকাশ করতেন। বাস্তব চরিত্র বা ঘটনা বা কাহিনী সংগ্রহ করবার সঙ্গে তিনি তাদের স্বাভাবিক পটভূমিও উপস্থাপিত করেন রচনায়। গল্পের প্রয়োজনে ঘটনা-সংস্থানের অদলবদল ক'রে নিয়ে। তাঁর সাহিত্য-রচনার মূল অনুসন্ধানের প্রশ্নে বর্তমান লেখককে তিনি ওইভাবে ব্যাখ্যা করেছিলেন।

তাঁর লেখার এক প্রধান আকর্ষণ হ'ল বর্ণনাশক্তি সৌকর্য। সে বর্ণনা একাধারে বাস্তব এবং কবিত্বময়। চিত্রধর্মী এবং অতি মনোগ্রাহী বর্ণনার গুণে জীবন্ত হয়ে ওঠে প্রত্যেক বিষয়। বহিরঙ্গ জীবনযাত্রার নানা প্রসঙ্গ থেকে আরম্ভ ক'রে প্রাণের গোপন কথা। মানুষের নন্দন-কান্তি কিংবা চিরবৈচিত্র্যময় নিসর্গ-চিত্র। রস-রসিকতা কিংবা মর্মন্তুদ বেদনা। অন্তস্থলের সূক্ষ্মতম অনুভূতি কিংবা স্থূল ইন্দ্রিয়গ্রামের বৃত্তান্ত। স্মৃতির বিভিন্ন রহস্য-স্বাদ কিংবা বর্তমানের চেতনা-অনুভবের সচকিত উদ্‌ঘাটন। ভোগবিলাস ও দেহাত্মবাদ কিংবা অদৃষ্টবাদ ও অধ্যাত্ম-জিজ্ঞাসা ইত্যাদির চিত্তাকর্ষক প্রসঙ্গ পাওয়া যায় তাঁর বর্ণচ্ছটাময় বর্ণনায়।

ভাষা এবং প্রকাশশৈলী দুই-ই তাঁর নিজস্ব সম্পদ। কারুর অনুকৃতি নয়। আত্মবিকিরণের আকুতিতে স্বভাব-সুন্দর ভাষণ। সংস্কৃত ও প্রাকৃত, মার্জিত ও কথ্য রূপের সম্মিলনে ঐশ্বর্যময় তাঁর ভাষা। সেইসঙ্গে বিচিত্র জীবন-রসের জন্যে তাঁর সাহিত্যের এক স্বতন্ত্র আস্বাদ। পাঠকের মনেও তার অনুরূপ অনুরণন জাগায়। তাঁর রচনা বৈশিষ্ট্যের কিছু

নিদর্শন এখানে উদ্ধৃত ক'রে দেওয়া হ'ল: "আকাশ থেকে একটা পৃথিবী-জোড়া অন্ধকার নিচের দিকে নেমে আসতে-আসতে হঠাৎ মাঝপথে থমকে দাঁড়িয়ে গেল। আমার বহুদিন-বিস্মৃত ছেলেবেলার কথাগুলো একে-একে মনে পড়তে লাগল।" (বাজীকর)

"জ্ঞান ফিরে আসবার পর দেখতে পেলুম দূরে স্মৃতি-সাগরের ওপারে আমার অতীত জীবনটা এই সুখদুঃখমাখা সংসারের মধ্যে ফিরে আসবার জন্যে দু'হাত বাড়িয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। উপরে চেয়ে দেখলুম সন্ধ্যাকুমারী অস্তরবির সোনালী পাড়ওয়ালা নীলাম্বরী প'রে পৃথিবীর সামনে এসে মোহন বেশে দাঁড়িয়েছে। চারিদিকে পরিপূর্ণ সৌন্দর্যের মাঝখানে আমার এ-জীবনটা নিষ্ফলে কেটে গেছে।" (বাজীকর)

"সামনে চেয়ে দেখলুম, দিনান্তের নিভন্ত চিতার শেষ-রশ্মিটি তখনও কুতুবমিনারের চূড়ার ওপরে ধ্বক-ধ্বক করে জ্বলছে। পূর্বদিক থেকে একটা বিরাট অন্ধকার পাখা মেলে সেই আলোটুকুকে গ্রাস করবার জন্যে ছুটে আসছে।" (বাজীকর)

"মাথার ওপর তো চাদর টেনে দিয়ে শুয়ে পড়া গেল। কিন্তু মনের ওপর যেই চাদর মুড়ে দেবার চেষ্টা করি, অমনি সেই নূপুরের আওয়াজ যেন চাদরের একটা খুঁট তুলে ধরে বলতে থাকে—কোথায়? দেখি দেখি, এত লজ্জা কিসের?"
(নিশির ডাক)

"বাঁশীর সুর গুমরে-গুমরে আমার রুদ্ধ দুয়ারে এসে আঘাত করতে লাগল। সে কি করুণ অনুনয়—যাস্‌নে! ওরে যাস্‌নে! আমাকে ফেলে যাস্‌নে।" (চাষার মেয়ে)

"দারিদ্র্য কাকে বলে এতদিন তা আমার জানা ছিল না, কুকুরের মতো সে আমার শ্বশুরের সংসারের পেছনে ঘুরতে থাকত···।" (চাষার মেয়ে)

"পরের দিনের সকালটা যেন দিনের বুকে অসাড় হয়ে পড়ে রইল। কিছুতেই আর সে যেতে চায় না।"

(চাষার মেয়ে)

"সুখের আনাচে-কানাচে দুঃখ ঘুরে বেড়াচ্ছে, জীবনের পায়ে-পায়ে মৃত্যু ঘুরে বেড়ায় এ আমরা দেখেও দেখি না।"

(চাষার মেয়ে)

"সন্ধ্যার অন্ধকারে আমরা দৈন্যের লজ্জা ঢেকে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়লুম।" (চাষার মেয়ে)

"মানুষের হৃদয় বিচিত্র উপাদানে তৈরি। অপরে তো দূরের কথা, মানুষ নিজের হৃদয়কেই চিনতে পারে না। মানুষ সুখে দুঃখে হাসে কাঁদে, বাঁচে মরে, কিন্তু তার নিজের মধ্যে যে রহস্যময় জগৎ রয়েছে, তার কোন্ কোঠায় কি সঞ্চিত আছে তা সে জানেও না।" (চাষার মেয়ে)

"কে যেন স্মৃতিসাগর থেকে এক আঁজলা জল তুলে নিয়ে আমার চোখে ঝাপটা মারলে। আমার দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে এল।" (চাষার মেয়ে)

"কিন্তু বিয়ে জিনিসটা তো আর ভালবাসার টিকে নয়।"

(কল্পনাদেবী)

"বয়সে সে বৃদ্ধা কিন্তু যৌবন যে তার ঝড়ের মধ্যে দিয়ে কেটেছে, এ-বয়সেও তার চিহ্ন বর্ত্তমান।" (কল্পনাদেবী)

"আকাশে তখনো মেঘের ছুটোছুটি থামেনি। সেদিন প্রতিপদের চাঁদখানা মেঘের ওড়নায় মুখ ঢেকে কার অভিসারে

ছুটে চলেছিল, কিন্তু চঞ্চল বাতাস বারবার তার মুখের বসন খসিয়ে দিয়ে তাকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলছিল। নিচে ছায়ানটের গম্ভীর করুণ তানে ঘাটের ওপর বার বার আছড়ে কি কথা জানাচ্ছিল কে জানে। (অচল পথের যাত্রী)

"উমার চোখ-দু'টো ছিল আশ্চর্য উপাদানে তৈরি। আমার মনে হ'ত সে-দু'টো যেন সর্বদা জ্বলছে। সেই আগুনের পশ্চাতে যে অশ্রুসাগর লুকোনো আছে, ঘুণাক্ষরে সে-কথা জানতে পারা যেত না।" (অচল পথের যাত্রী)

"সমুদ্রতীর। আমার সামনে দিগন্তবিহীন নীল জল থৈ থৈ করছে। সমুদ্রে একটুও ঢেউ নেই। মধ্যে মধ্যে আমারই বুকের দীর্ঘশ্বাসের মতো সমুদ্রের বুকখানা একটু ফুলে উঠছে মাত্র। তারপর দিগন্তব্যাপী একটা শব্দ—হা হা হা।" (অচল পথের যাত্রী)

"শীত কেটে গেল। নিশান্তে সুন্দরীর জাগরণের মতো প্রকৃতি সবেমাত্র তার চোখ খুলেছে। চোখের জড়তা ও আলস্য তখনো কাটেনি। ধরণীর এই যৌবন-সৌন্দর্য দেখবার জন্য আকাশ তার চোখ থেকে কুয়াশা মুছে ফেলেছে। এই-রকম একটা সময়ে একদিন দুপুরবেলা চিররহস্যময় চিরমৌন হিমালয়ের প্রতিচ্ছবি আকাশে ফুটে উঠল। আমি ভাবলুম, এবার আমার যাবার সময় হয়েছে।" (অচল পথের যাত্রী)

"যে-চোখ শরৎপ্রভাতের সৌরকরোজ্জ্বল শিশিরবিন্দুর মতো ঝলমল করত, সে-চোখ যেন নিষ্প্রভ হয়ে গিয়েছে, যেন ঊর্মিমুখর সাগর একটা প্রাকৃতিক বিপ্লবে শান্ত হয়ে গিয়েছে।"

(মহাস্থবির জাতক, দ্বিতীয় পর্ব)

"আমার মূর্ছিত অতীত চমকে উঠে বিস্মিত বর্তমানের

দিকে চেয়ে রইল।" (মহাস্থবির জাতক, দ্বিতীয় পর্ব)

এই ধরণের ভাষা ও ভঙ্গীতে তাঁর রচনা দীপ্তিময় হয়ে আছে। আরও উদ্ধৃত করবার অবকাশ থাকলে দেখানো যেত, জীবন-সত্যের কত দুর্লভ চকিত প্রকাশে তাঁর নানা গল্প, উপন্যাস ও আত্মজীবনী সমৃদ্ধ।

তাঁর আত্মস্মৃতি-কথন 'মহাস্থবির জাতক' প্রেমাঙ্কুরের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকর্ম। চারখণ্ডের এই জাতক-গ্রন্থাবলী বাংলা-সাহিত্যে তাঁর নামকে স্মরণীয় ক'রে রাখবে। এই পরিণত বয়সের এবং শেষ সৃষ্টিকে শ্রীমণ্ডিত করেছে তাঁর রচনার সমস্ত মনোহারী বৈশিষ্ট্য। আত্মজীবনীর উপকরণে গঠিত তাঁর জাতক। বিষয়বস্তু ও দৃষ্টিভঙ্গীর অভিনবত্বে বাংলা-সাহিত্যে এক অনাস্বাদিতপূর্ব রসের সন্ধান দিয়েছে। শরৎ-চন্দ্রের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি 'শ্রীকান্ত' প্রথম পর্বের সগোত্র হয়েও প্রেমাঙ্কুরের 'মহাস্থবির জাতক' আপন বিশিষ্ট ঐশ্বর্যে ভাস্বর।

বিংশ শতকের এই জাতকের ঘটনাবলী রচয়িতার নিজের উক্তি অনুসারে—"শতকরা ৯০ ভাগ সত্যি"। অপরপক্ষে, শরৎচন্দ্রের সৃষ্টিতে বাস্তব ও কল্পনার অনুপাত কি, তা বলা যায় না। কিন্তু দুই গ্রন্থের মধ্যে বিষয় ও গুণগত সাদৃশ্য হ'ল—অনন্য, বিচিত্র চরিত্রাবলী ও নাটকীয় ঘটনা-পরম্পরায় বিধৃত সুগভীর জীবন-জিজ্ঞাসা এবং স্বকীয় শিল্পদৃষ্টির আলোকপাতে প্রাণ-রহস্যের উদ্ভাসন। এই দু'টি গ্রন্থের জীবনবোধের কোনো তুলনাত্মক আলোচনা এখানে লক্ষ্য নয়। তাদের সাজাত্য উল্লেখ করাই উদ্দেশ্য। 'মহাস্থবির জাতক'-লেখক অল্পবয়স থেকেই বিদ্যালয়ের

বাইরে জীবনের বৃহত্তর পাঠশালার শিক্ষা সাক্ষাৎভাবে পেয়েছিলেন। তাঁর আপন বিশিষ্ট সত্তা বিকাশলাভ করেছিল অন্তরের প্রেরণায়। নিজস্ব অন্তর্দৃষ্টিতে জীবন, জগৎ ও মানুষকে তন্নিষ্ঠ হয়ে দেখেছিলেন। জীবনের পঙ্কে-পঙ্কজে যে অমৃতের সন্ধান ক'রে বেড়িয়েছিলেন আকুল আবেগে—জাতকের ছত্রে ছত্রে সেই পিয়াসী মনের, সেই ভূয়োদর্শনের, সেই স্বেচ্ছা-যাযাবরের বৃত্তান্ত দীপ্যমান হয়ে আছে। লেখকের মহৎ আত্মজিজ্ঞাসা এবং আত্মপ্রকাশের এক সুকর স্বাক্ষর 'মহাস্থবির জাতক' ঃ

"আমার চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক, মন ও বুদ্ধির অগোচরে যে আরো একটা রহস্যলোক আছে সেখানকার ইঙ্গিত এই প্রথম এলো আমার জীবনে। তারপর সারাজীবন ধরে আভাসে ইঙ্গিতে সেখানকার কত বার্তাই আমার কাছে এসে পৌঁছল কিন্তু সে-লোকে প্রবেশ করবার হদিশ আজও পেলুম না। জীবনের এই অভিজ্ঞতা প্রকাশ করবার জন্যেই এই জাতকের অবতারণা; এই অভিজ্ঞতার জন্যেই আমি মহাস্থবির।" (মহাস্থবির জাতক, দ্বিতীয় পর্ব)

"আমি খুঁজব তাঁকে যিনি আমার ভাগ্যলিপি লিখেছেন। জিজ্ঞাসা করব তাঁকে, কেন তিনি দিলেন আমার মধ্যে এই আবেগ ও আকুলতা, অথচ সংসারের প্রতিটি জিনিষকে লেলিয়ে দিলেন আমার বিরুদ্ধে যেন কোনো কাজেই আমি সাফল্যলাভ না করতে পারি।"

(মহাস্থবির জাতক, তৃতীয় পর্ব)

"কবি বলেছেন সুখদুঃখ দু'টি ভাই। কিরকম ভাই? মায়ের পেটের ভাই কি চোরে-চোরে মাসতুত ভাই—সে-

বিষয়ে তিনি নীরব, তাই সুখ ও দুঃখ সম্বন্ধে এইখানে তেড়ে একটি ভাষণ ঝাড়বার প্রলোভন হচ্ছে।"

(মহাস্থবির জাতক, তৃতীয় পর্ব)

"আমার মনে হতে লাগল, আমি যেন এই রহস্যের গভীরতম গভীরে প্রবেশ করছি, নিজের ইচ্ছায় নয়, কে যেন আমাকে টেনে নিয়ে চলেছে। তার কাজ শুধু টেনে নিয়ে যাওয়া আর আমার কাজ শুধু বিস্মিত হওয়া। বিস্ময়-রসই জগতের একমাত্র রস। সমস্ত রসেরই অন্তরতম প্রদেশে আছে বিস্ময়। যে বিস্মিত হয় না, সেই শুধু অন্য রসে মজতে পারে।" (মহাস্থবির জাতক, দ্বিতীয় পর্ব)

এই ধরণের তত্ত্বদর্শী মন্তব্য জাতকের মাঝে মাঝে দেখা যায়, তার দু'-একটি নিদর্শন এখানে দেওয়া হ'ল। নিয়ম-শৃঙ্খলা ও বিধি-নিষেধের গণ্ডী ভেদ ক'রে তিনি বেরিয়েছিলেন বৃহত্তর জীবনের পথে-বিপথে। স্বচক্ষে জগৎটাকে দেখতে গিয়ে দুঃখসুখের ও সুদুর্লভের বিপুল অভিজ্ঞতায় তাঁর জীবনের পাত্র প্রায় পূর্ণ হয়েছিল। ভূয়োদর্শী লেখকের সেইসব লব্ধ জ্ঞানের নানা পরিচয় ইতস্ততঃ ছড়িয়ে আছে জাতকের নানা স্থানে। যথা:

"মানুষের মধ্যে যতপ্রকার শ্রেণী আছে—অর্থাৎ জ্ঞানী, অজ্ঞানী, বিদ্বান, বুদ্ধিমান, বিবেচক, অবিবেচক, ধূর্ত, নির্বোধ, সুবোধ, দুর্বোধ—এদের কারুকেই স্রেফ দেখেই বোঝা যায় না কোন্ শ্রেণীর মানুষ। কিন্তু একটি বিশেষ শ্রেণীর মানুষ যারা পরশমণির ছোঁয়া পেয়েছে—তাদের দেখলেই চেনা যায়। অন্তত এই শ্রেণীর যত লোকের সাহচর্যে আমি এসেছি তাদের দেখেই চিনতে পেরেছি।" (মহাস্থবির জাতক, তৃতীয় পর্ব)

"দুষ্ট লোক পরের সুখে হিংসা করে ও পরের দুঃখে আনন্দিত হয়। সাধারণ লোক পরের সুখে হিংসা করে এবং পরের সুখ সম্বন্ধে উদাসীন থাকে। অসাধারণ লোক পরের দুঃখে দুঃখী হয় এবং পরের সুখ সম্বন্ধে উদাসীন থাকে। ভালো লোক পরের দুঃখে দুঃখী এবং পরের সুখে সুখী হয়। কিন্তু পরের সুখদুঃখকে এমনভাবে ভোগ করা যে সম্ভব হতে পারে তা এখানেই প্রথম দেখলুম।"

(মহাস্থবির জাতক, দ্বিতীয় পর্ব)

এবারে প্রেমাঙ্কুরের পারিবারিক জীবনের প্রসঙ্গ।

পিতা মহেশচন্দ্র আতর্থীর পূর্বনিবাস ছিল ঢাকা-বিক্রমপুরের শিমুলিয়া গ্রামে। ইনি মানিকগঞ্জের বিপিনবিহারী রায়চৌধুরীর জমিদারিতে নায়েব ছিলেন। সেই সময়ে কর্মোপলক্ষ্যে কোনো সময়ে ফরিদপুরে অবস্থানকালে দ্বিতীয় পুত্র (তৃতীয় সন্তান) প্রেমাঙ্কুর আতর্থীর জন্ম হয় ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দের পয়লা জানুয়ারী। তাঁর একমাস বয়সে মহেশচন্দ্র আতর্থী স্থায়িভাবে কলকাতায় বসবাস করতে থাকেন।

মহেশচন্দ্র আতর্থী সমাজসেবা ও সমাজ-সংস্কারের প্রবল প্রেরণায় ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেন সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে। তিনি বিবাহ করেছিলেন জনাই-এর মুখুজ্জে-পরিবারে। তাঁদের দশটি সন্তান হয়েছিল—পাঁচ পুত্র ও পাঁচ কন্যা।

'একটি বিচিত্র জীবন' শীর্ষকে শ্রীপ্রভাতকুমার গঙ্গোপাধ্যায় মহেশ আতর্থী সম্বন্ধে লিখেছেন ('রবিবাসরীয় যুগান্তর সাময়িকী', ৫ জুলাই ১৯৬৪)।

মহেশচন্দ্রের চরিত্রের একটি দিক এমন ছিল, যার প্রতিক্রিয়ায় সম্ভবত প্রেমাঙ্কুরের জীবনের গতিপ্রকৃতি স্বতন্ত্র ধারায়

বিবর্তিত হয়। ধর্মীয় আচার-ব্যবহার সংস্কারাদিতে নিষ্ঠার আতিশয্য গোঁড়ামির পর্যায়ে পৌঁছেছিল মহেশচন্দ্রের জীবনে। উপরন্তু তিনি অত্যন্ত ক্রোধী ছিলেন। পুত্রদের শিক্ষাদান ইত্যাদি বিষয়ে সদা-শাসন নিতান্ত কঠোরতায় পর্যবসিত হয়েছিল। বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমে প্রেমাঙ্কুর স্বভাবতই বীতরাগ ও অমনোযোগী ছিলেন। পিতার নিষ্ঠুর তাড়নার ফলে পাঠ্যপুস্তক ও গৃহজীবন দুই-ই বিভীষিকাময় হয়ে ওঠে তাঁর কাছে। পিতা-পুত্রের সম্পর্কিত এইসব অধ্যায় যথাযথভাবে 'মহাস্থবির জাতকে' চিত্রিত আছে। বাল্যকাল থেকেই দুরন্ত-স্বভাব প্রেমাঙ্কুর পিতার প্রবল পীড়নেও বশ্যতা স্বীকার করলেন না। বিদ্যাচর্চাতেও উন্নতি হ'ল না আদৌ। আধ-ডজন স্কুল অদল-বদল করেও কোনো-ক্রমে সেকেণ্ড ক্লাস পর্যন্ত পৌঁছতে পেরেছিলেন। ব্রাহ্ম গার্লস্ স্কুল, ব্রাহ্ম বয়েজ স্কুল, ডাফ্ স্কুল, সিটি স্কুল, কেশব অ্যাকাডেমি ইত্যাদিতে তিনি যাতায়াত করেন ঐ পর্যন্ত। গৃহ এবং পিতার কবল থেকে পলায়ন করতে আরম্ভ করেন বারো-তেরো বছর বয়স থেকেই। প্রথমদিকে বেশিদূর যেতে পারতেন না। গ্রেপ্তার হয়ে গৃহ ও স্কুল-কারায় আবদ্ধ হতে হ'ত যথারীতি। পনেরো-বছর বয়স থেকে দূরযাত্রায় পশ্চিমাঞ্চলে পাড়ি দিতে লাগলেন। এসব প্রসঙ্গে নাটকীয়-ভাবে অনেকাংশেই বর্ণনা করা আছে 'জাতকে'।

পিতার চরিত্রও সমস্ত মহত্ত্ব, সরলতা, ত্যাগ, সেবাধর্ম, আদর্শবাদ এবং কঠোরতা-সমেত প্রেমাঙ্কুর আশ্চর্য দক্ষতায় 'মহাদেব' নামে জাতকে অঙ্কন করেছেন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা নরেশচন্দ্রকে বর্ণনা করেছেন 'স্থির' ব'লে। পিতার

শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে নরেশচন্দ্র ভাগ্যান্বেষণে বিদেশে চ'লে যান। প্রথমে লণ্ডনে ও পরে আমেরিকায়। সেখানে চিকিৎসাবিদ্যায় এম্. ডি. ডিগ্রী লাভ ক'রে Plastic Surgeon রূপে সুপ্রতিষ্ঠিত হন; স্বদেশে আর প্রত্যাবর্তন করেননি। তৃতীয় ভ্রাতা জ্ঞানাঙ্কুরকে জাতকে 'অস্থির' নামে বর্ণনা করা হয়েছে। নায়ক নিজের ডাকনাম 'বুড়ো'কেই স্মরণ ক'রে বোধহয় গ্রহণ করেছেন 'স্থবির' নামটি। লেখকরূপে সেই নাম থেকে হয়েছেন মহত্তর তাৎপর্য-ময় 'মহাস্থবির'।

পাঠ্যপুস্তক-নির্ভর বিদ্যাচর্চায় ব্যর্থতার অন্তরালে কিন্তু প্রেমাঙ্কুরের জীবনে এক সার্থকতার প্রস্তুতি আরম্ভ হয়েছিল। অদম্য আগ্রহে এবং গোপনে তিনি নানা সাহিত্য-গ্রন্থ পাঠ করতেন বাল্যবন্ধু প্রভাতচন্দ্রের সহযোগে। উত্তরজীবনে খ্যাতনামা দেশব্রত-সংবাদপত্রসেবী প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় ছিলেন প্রেমাঙ্কুরের নিকটতম প্রতিবেশী। ব্রাহ্ম গার্লস্ স্কুলে (এখানকার নিম্নশ্রেণীতে বালকরাও যোগ দিতে পারত) তাঁর সহপাঠী। সে-যুগের অন্যতম ব্রাহ্মনেতা, 'অবলা বান্ধব'-পত্রিকার সম্পাদক দ্বারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের পুত্র প্রভাতচন্দ্র বাল্যজীবনে, ১৩ কর্নওয়ালিস স্ট্রীটে (সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ মন্দির'- এর বিপরীত বা পূর্বদিকে) বাস করতেন। সেই বাড়ির দক্ষিণে সংলগ্ন বাড়িটিতে থাকতেন সপরিবারে মহেশচন্দ্র আতর্থী। যে ১৩-সংখ্যক গৃহের উত্তরাংশে দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় ও তাঁর জ্যেষ্ঠ জামাতা —বহুমুখী প্রতিভাধর উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর বাস ছিল, তারই দক্ষিণ অংশে ছিল ব্রাহ্ম গার্লস্ স্কুল। সেই বাড়ীতে

প্রভাতচন্দ্রের মাতুলেরা এক পারিবারিক লাইব্রেরি গড়ে তুলেছিলেন। লাইব্রেরির গ্রন্থসংগ্রহের মধ্যে অনেকসময় সাহিত্যপাঠে নিমগ্ন থাকতেন প্রভাতচন্দ্র ও প্রেমাঙ্কুর। স্কুল-পাঠ্য-বহির্ভূত এইসব পাঠ্যের বিষয়ে দুই বন্ধুতে প্রচুর আলোচনাও হ'ত। তার কিছুকাল পরে তাঁদের দু'জনের সঙ্গেই আলাপ হ'ল প্রসাদ রায়ের সঙ্গে। প্রেমাঙ্কুরের তখন ১৪ বছর বয়স। প্রসাদ তাঁর চেয়ে বছর-দুয়েকের জ্যেষ্ঠ। যে-ছদ্মনামে তখনই প্রসাদ রায় বাংলা পত্র-পত্রিকায় রচনা আরম্ভ করেছিলেন পরবর্তীকালে সেই হেমেন্দ্রকুমার রায় নামেই সাহিত্যক্ষেত্র সুপরিচিত হন। সেই কিশোরবয়সে সাহিত্যের সঙ্গী হলেন তিনজনে। প্রেমাঙ্কুর, প্রভাপচন্দ্র ও হেমেন্দ্র-কুমার। সাহিত্য ও শিল্পাদি ক্ষেত্রে আকুল পিপাসা তৃপ্ত করতে তিন বন্ধু যাতায়াত আরম্ভ করেন তখনকার ইম্পি-রিয়াল লাইব্রেরিতে। স্ট্র্যাণ্ড রোডের মেট্‌কাফ হল্‌-এ। সেখানেই তাঁদের সঙ্গে কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের পরিচয় ও বন্ধুত্ব হয়, সত্যেন্দ্রনাথ যদিও প্রেমাঙ্কুরের আটবছরের বয়োজ্যেষ্ঠ। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় যে, প্রেমাঙ্কুরের শেষ রচনায় প্রকাশিত হয়েছিল সত্যেন্দ্রনাথেরই স্মৃতিকথা। সত্যেন্দ্রনাথের পরে প্রেমাঙ্কুরের সঙ্গে সাহিত্যিক মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের আলাপ-পরিচয় ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বে পরিণত হয়েছিল। মণিলালের সঙ্গে সবচেয়ে বেশী হৃদ্যতা ছিল অবশ্য হেমেন্দ্রকুমারের। প্রেমাঙ্কুর সাহিত্যরচনার প্রথমজীবনে হেমেন্দ্রকুমার এবং মণিলাল দু'জনের কাছেই উপকৃত ছিলেন, এ-কথা তিনি বৃদ্ধবয়সেও ব'লে গেছেন। প্রেমাঙ্কুরের সাহিত্যকর্ম ষোলো-সতেরো বছরের মধ্যেই আরম্ভ হয়

বটে। কিন্তু তা কখনো অব্যাহতভাবে অগ্রসর হয়নি। কারণ, আগেও বলা হয়েছে, পলাতকজীবন তাঁর আরম্ভ হয়েছিল কিশোরবয়স থেকেই। বার বার বাড়ি থেকে পলায়ন করেছেন ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে, বহু বিচিত্র মানুষের সম্বন্ধে অভিজ্ঞ হয়েছেন।

বেদনা-আনন্দে বিজড়িত বৃহত্তর জীবন তাঁকে নিরন্তর আহ্বান জানিয়েছে আর সে-ডাকে সাড়া দিতে বারংবার গৃহছাড়া হয়েছেন গতানুগতিক ধারায় ইস্তফা দিয়ে। তাঁর পাঠ এইভাবেই সম্পন্ন হয়েছে বিদ্যালয়ের বাইরে। আপাত রিক্ততার মধ্যেও অন্তর তাঁর জীবনদেবতার অজস্র দাক্ষিণ্যে পূর্ণ হয়ে ওঠে। জীবনের পথে কিছুই যায় না ফেলা। চিত্তের সেই সঞ্চিত অমৃত ক্ষরিত হয় সাহিত্যসৃষ্টিতে। জীবনে যত প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যে দিয়েই তাঁকে যেতে হোক, শিল্পী-সাহিত্যিকের মন ও দৃষ্টি তাঁর চিরদিন অক্ষুণ্ণ ছিল। সংসার-যাত্রার জন্যে যতপ্রকার জীবিকাই অবলম্বন করুন, মনে-প্রাণে তিনি ছিলেন সাহিত্যিক। জীবনের নানা বাঁকে সাহিত্যকর্মে ছেদ পড়লেও জাত-সাহিত্যিক তিনি থাকেন ঠিকই। 'জাহ্নবী' মাসিক পত্রিকায় প্রেমাঙ্কুরের সতেরো বছর বয়সে প্রথম গল্প প্রকাশিত হয়। সে-গল্পটি তাঁর কোনো গল্পপুস্তকে দরে অন্তর্ভুক্ত করেননি তিনি। তখন 'জাহ্নবী'র সম্পাদক ছিলেন সুধাকৃষ্ণ বাগচী নামে একজন অর্বাচীন। কিন্তু পত্রিকাটি আসলে কবি গিরীন্দ্রমোহিনীর ছিল। নলিনীরঞ্জন পণ্ডিতের পরিচালনায় কিছুকাল থাকবার পর এটি আসে ঐ ব্যক্তির হাতে। সুধাকৃষ্ণের অযোগ্যতার ফলে পত্রিকা বানচাল হবার উপক্রম করলে, তিন বন্ধু হেমেন্দ্র-

কুমার, প্রেমাঙ্কুর ও প্রভাতচন্দ্র সম্পাদনার ভার গ্রহণ করেন এবং কয়েক বছর সংশ্লিষ্ট থাকেন।

তার কয়েক বছর পরে প্রেমাঙ্কুর বিখ্যাত 'ভারতী' মাসিক পত্রিকায় গল্প প্রকাশ করেন এবং ক্রমে সুপরিচিত হন 'ভারতী' গোষ্ঠীর অন্যতম শক্তিশালী লেখকরূপে। 'ভারতী'র কর্ণধার তখন মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়। তাঁকে লেখকরূপেও প্রেমাঙ্কুর অতিশয় শ্রদ্ধা করতেন। হেমেন্দ্র-কুমার ভিন্ন সাহিত্য-রচনার বিষয়ে বিশেষ ঋণী ছিলেন তিনি মণিলালের কাছে। "মণিলাল আমার লেখা দেখে-শুনে দিতেন, এটা এইরকম হলে ভালো হয় ইত্যাদি জানাতেন।" —প্রথম সাহিত্য-জীবনের প্রসঙ্গে বলতেন প্রেমাঙ্কুর। কিন্তু সাহিত্যিক-রূপে সে-অগ্রগতির আগে ও পরে তাঁর জীবনে অন্য নানা কর্মপ্রচেষ্টাও ছিল। প্রথম যৌবন থেকে আরম্ভ ক'রে বিভিন্ন সময়ে জীবন-সংগ্রামের বহু পর্যায়ের মধ্যে দিয়ে যেতে হয় তাঁকে। জীবিকা-অর্জনের জন্যে অনেক-রকমের কাজই তিনি করেছিলেন। অল্পবয়সের পলাতক জীবনে বিদেশে নানা উঞ্ছবৃত্তি গ্রহণ করতে বাধ্য হন তিনি। পথে কায়িক শ্রম থেকে আরম্ভ ক'রে গৃহস্থের পরিচারক ও পাচকের কাজ পর্যন্ত কিছুই তাঁর বাকি ছিল না। কলকাতাতেও নানা রকমের সামান্য কাজ করেন। এসপ্ল্যানেড অঞ্চলে কার এণ্ড মহলানবীশ-এর ক্রীড়া সরঞ্জামের দোকানে সাধারণ বিক্রেতার কর্মে অতিবাহিত হয় ছ'বছর। ১৯১১ থেকে ১৯১৭ খ্রীঃ। এই দোকানে কাজ করবার সময়েও সাহিত্যচর্চায় তাঁর বিরতি ছিল না। "ফুটবলে পাম্প্ করতে হ'ত, লেখাও চলত।"—নিজ উক্তি।

ঠন্‌ঠনে অঞ্চলে পশ্চিমের এক চশমা-ব্যবসায়ীর কার-বারেও বেশ কিছুদিন কাজ করেছিলেন।

নিজে কয়েক রকমের ব্যবসাও করেন নানা সময়ে। প্রত্যেকটিতে ব্যর্থ হন। বেনেপুকুর অঞ্চলে জুতোর ব্যবসা। দুধ-ঘিয়ের ব্যবসা। বোম্বাইয়ে সিগারেটের ব্যবসা। সবেতেই কিছু-না-কিছু লোকসান দিয়ে বন্ধ করতে হয়। সিনেমা-জগতেও তিনি যোগ দিয়ে দীর্ঘকাল অবস্থান করেছিলেন। তাঁর জীবনে ছায়াচিত্রের স্থান ছিল সাহিত্যের নিচেই। সে প্রসঙ্গ কিছু বিস্তারিত। পরে তার পরিচয় দেওয়া হবে। সাংবাদিকতার ক্ষেত্রেও দেখা দিয়েছেন একাধিকবার। শখ ক'রে নয়, পেশা হিসাবেই। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ প্রতিষ্ঠিত সান্ধ্য দৈনিকপত্র 'বৈকালী'-তে প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় ও হেমেন্দ্রকুমার রায়ের সহযোগে লেখনী চালনা করেছেন। এই 'বৈকালী' সংবাদপত্রের সম্পাদকরূপে নির্মলচন্দ্র চন্দ্রের নাম মুদ্রিত থাকলেও, সম্পাদনার প্রায় যাবতীয় দায়িত্বই পালন করতেন তাঁরা তিন বন্ধুতে। সম্পাদকীয় প্রবন্ধও তাঁরা লিখতেন। 'বৈকালী' ভিন্ন আরো একটি দৈনিক পত্রিকায় প্রেমাঙ্কুর সাংবাদিক-লেখকরূপে যোগ দিয়েছিলেন। সেই সংবাদপত্রটির নাম 'হিন্দুস্থান'।

দু'জায়গাতেই কাজ তাঁর দীর্ঘদিন স্থায়ী হয়নি। পরে আর একটি বিশেষ ধরনের পাক্ষিক পত্রিকা তিনি সম্পাদনা করেছিলেন—'বেতারজগৎ'। তিনিই 'বেতারজগৎ'-এর প্রথম সম্পাদক। কিন্তু সৃজনী সাহিত্যের পথে যে পরিক্রমা আরম্ভ করেছিলেন, নানা বাধা-বিঘ্নে তার গতি সাময়িকভাবে রুদ্ধ হলেও, স্তব্ধ হ'তে পারেনি কোনোদিন। 'যমুনা' ও পরে

'ভারতী' মাসিক পত্রিকায় তাঁর গল্প মাঝে মাঝে প্রকাশিত হয়ে গুণিজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সে-যুগের 'যমুনা' ও 'ভারতী'তে তাঁর প্রত্যেক গল্প শরৎচন্দ্র পড়তেন। তাঁর সম্পর্কে বিশেষ আশা পোষণ করতেন, এ-কথা শরৎচন্দ্র প্রেমাঙ্কুরকে জানিয়েছিলেন। প্রেমাঙ্কুরের সেইসব সাহিত্যকর্ম সার্থক সৃষ্টি হলেও অর্থকরী ছিল না। তখনকার কালের প্রথা অনুসারে তিনি মাসিকপত্র থেকে কিছুই পেতেন না গল্প লিখে। বই প্রকাশিত হলে পেতেন, তাও সামান্য। এ-কথা উল্লেখ করবার উদ্দেশ্য এই যে, তিনি সাহিত্যসেবা করতেন সে-যুগের অনেকেরই মতন অন্তরের প্রেরণায়। সাহিত্যচর্চা তাঁর শিল্পীসত্তার আত্মপ্রকাশের শ্রেষ্ঠ মাধ্যম ছিল। তাঁর প্রথম গল্পপুস্তক 'বাজীকর' আট আনা সংস্করণের বই (প্রকাশক: গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স)। 'বাজীকর' প্রকাশের সময় তাঁর বয়স ৩০ পার হয়েছে। এই বইয়ের আগে অন্য একটি গ্রন্থ তিনি সম্পাদনা ও পরিকল্পনা করেছিলেন, তাঁর অন্যতম বন্ধু চিত্রশিল্পী চারুচন্দ্র রায়ের সহযোগিতায়। সেটি ছোটদের জন্যে গল্প, কবিতা, রঙীন ছবি ইত্যাদির সংকলন-গ্রন্থ। নাম 'রং-মশাল।' সে-যুগে ছেলেমেয়েদের জন্যে এমন উচ্চমানের সচিত্র সংকলন পুস্তক বাংলা সাহিত্যের এই বিভাগে পথিকৃতের কাজ করেছিল। তাঁর সম্পাদিত এই গ্রন্থের লেখক ও শিল্পীদের তালিকা থেকে বোঝা যায় কত উচ্চশ্রেণীর হয়েছিল সংকলনটি। অবনীন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, সুকুমার রায়, হেমেন্দ্রকুমার রায়, জলধর সেন, মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, নরেন্দ্র দেব প্রভৃতির লেখা এবং গগনেন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ, নন্দলাল, যতীন্দ্রকুমার সেন,

সুরেন্দ্রনাথ কর প্রভৃতির অঙ্কিত পূর্ণপৃষ্ঠার ছবি। তা ছাড়া, চারুচন্দ্র রায়ের আঁকা তেত্রিশটি খুচরো ছবি। বইখানির আর একটি লক্ষণীয় বিষয় হ'ল—মুখপাতে প্রত্যেক লেখকের কবিতায় পরিচয়-রচনা। দেখা যায়, তখনই (১৯২০ সালে এই গ্রন্থ প্রকাশিত) অবনীন্দ্রনাথ 'ছবির রাজা অবীন ঠাকুর' আখ্যাত হয়েছেন। যথা :

"ছবির রাজা অবীন ঠাকুর রংয়ের নেশায় আছেন ভুলি,
পেয়েছি তাঁর চিত্র, লেখা বিচিত্র সে ভাবের তুলি।"

লেখক-পরিচিতির শেষ দু'ছত্র হ'ল :

"ভুল চুক সব মাপ কোরো ভাই, এটাই প্রথম চেষ্টা যখন,
শ্রীচারু রায় প্রেমাঙ্কুরের যুক্ত করে এই নিবেদন।"

কবিতাটি প্রেমাঙ্কুরের রচনা। এখানে ব'লে রাখা যায় যে, কবিতা লেখাতেও তাঁর হাত ছিল। শেষজীবনে প্রকাশিত তাঁর সর্বশেষ গল্পের বই 'শেফালী'র উৎসর্গপত্রে একটি কবিতা লেখেন বাল্যবন্ধু অমল হোমের উদ্দেশে। ছোটদের জন্যে প্রেমাঙ্কুরের প্রথম উচ্চশ্রেণীর সংকলন-গ্রন্থ 'রং মশাল'-এর প্রসঙ্গে এ কথাও উল্লেখযোগ্য যে, তাঁর সাহিত্য জীবনে বরাবরই শিশুসাহিত্য একটি স্থান অধিকার ক'রে ছিল। ছোটদের জন্যে তিনি নানা সময়ে নানা ধরনের মনোজ্ঞ রচনা প্রকাশ করেন—গল্প, ঐতিহাসিক কাহিনী, পুরাণকথা ইত্যাদি। সে-সবের মধ্যে কিছু কিছু বিভিন্ন পত্রিকায় রয়ে গেছে। পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় 'আনারকলি', 'ডানপিটে', 'ছোটদের ভাল ভাল গল্প'।

'রং-মশাল'-এর পর প্রথম গল্পের বই 'বাজীকর' প্রকাশিত হয়। তাঁর প্রথম উপন্যাস 'ঝড়ের পাখী'। তার প্রায় তিন বছর পরে তাঁর দ্বিতীয় উপন্যাস প্রকাশিত হয়েছিল—'চাষার মেয়ে'। সে যুগের নির্বাক ছায়াচিত্রে এটি রূপায়িত হয়েছিল বীরেন্দ্রনাথ সরকারের The International Film Craft থেকে। পরিচালনা করেছিলেন চারু রায়। 'চাষার মেয়ে'র পরের বছর বেরোয় 'আনারকলি'। তার প্রায় দু'বছর পরে 'দুই রাত্রি' আত্মপ্রকাশ করে। তারপর 'অচল পথের যাত্রী' ইত্যাদি আরো কয়েকটি উপন্যাস প্রকাশিত হয়ে তিনি ক্রমে সাহিত্যক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠালাভ করেন।

তা ছাড়াও তাঁর আরো কয়েকখানি পুস্তক—তাঁর অত্যুৎকৃষ্ট রচনা—প্রকাশিত হয়েছিল, যেসব পরে উল্লেখ করা হবে। আপাতত তাঁর সাহিত্য-জীবনের পরিণতির আলোচনায় আর অগ্রসর না হয়ে, তাঁর প্রথম ও মধ্য-জীবনের অন্যান্য প্রসঙ্গের অবতারণার প্রয়োজন। কারণ আরো একাধিক সাংস্কৃতিকক্ষেত্রে তাঁর বিচিত্র প্রতিভা পুষ্পিত হয়েছিল।

প্রথমত তাঁর সঙ্গীতচর্চার কথা।

প্রেমাঙ্কুরের শিল্পীমন সহজাত ছিল। অনেক প্রতিভাবান সাহিত্যিক বা শিল্পীর জীবনে যেমন দেখা যায় ললিতকলার অন্য কোনো কোনো বিভাগেও তাঁদের অন্তরের গভীর যোগ এবং খানিক পরিমাণে নৈপুণ্য আছে, প্রেমাঙ্কুরের ক্ষেত্রেও তা লক্ষণীয়। তাঁর জীবনে সঙ্গীত ও অভিনয়কলার স্থান ছিল। তার মধ্যে প্রথমটির চর্চা তিনি রীতিমত করেছিলেন বেশ কিছুকাল ধরে।

সঙ্গীতের আকর্ষণ যে বাল্যকাল থেকে তাঁর মনে নিবিড়-ভাবে অনুভূত হ'ত, তার অন্তরঙ্গ পরিচয় তিনি 'মহাস্থবির জাতক'-এর প্রথম পর্বে যথার্থ শিল্পীর মতনই প্রকাশ করেছেন। নৌকার ওপর সেই পশ্চিমা বাঈজীর মর্মস্পর্শী ঠুংরি বালকের চেতনায় যে অপূর্ব অনুভব সৃষ্টি করেছিল তা প্রেমাঙ্কুরের নিজেরই অভিজ্ঞতা। তাঁর 'চাষার মেয়ে' উপন্যাসে, মনের ওপর বাঁশীর সুরের আচ্ছন্ন করা প্রভাবের কথা একাধিক আছে। তাঁর 'অচল পথের যাত্রী' এবং 'দুই রাত্রি'র মধ্যেও পাওয়া যায় মাদকতাময় সঙ্গীত-অনুষ্ঠানের বিবরণ। 'বাজীকর' পুস্তকের অন্তর্ভুক্ত 'মল্লারের সুর', 'স্বর্গের মাটি'র অন্তর্গত 'মরু-মরীচিকা' ইত্যাদি গল্পও তাঁর রাগ-সঙ্গীত-প্রীতির এক-একটি নিদর্শন। রচনাবলীর আরো নানা স্থানে প্রেমাঙ্কুরের সঙ্গীতজ্ঞতার পরিচয় বিধৃত আছে।

তিনি যে সঙ্গীতচর্চা করেন ব'লে উল্লেখ করা হয়েছে, তা অবশ্য কণ্ঠসঙ্গীত নয়, যন্ত্রসঙ্গীত—সেতার। রাগসঙ্গীতের সুরবৈচিত্র্যে আকৃষ্ট হয়ে যৌবনে তিনি সেতার শিক্ষা আরম্ভ করেছিলেন। কয়েকজন ওস্তাদের কাছে শিক্ষার্থী হয়ে যেতেন। তাঁদের মধ্যে ওস্তাদ করামৎউল্লা খাঁ'র সঙ্গ করেছিলেন সবচেয়ে বেশী। খাঁ সাহেবের আগে তাঁরই কনিষ্ঠ কৌকভ খাঁ'র কাছে কিছুদিন শিখেছিলেন। মেটিয়াবুরুজের নবাব ওয়াজিদ আলি শা'র দরবারে আগত সরোদী নিয়ামৎউল্লা খাঁ'র এই পুত্রদ্বয় কৃতী হয়েছিলেন পিতার শিক্ষাধীনে। পরবর্তীকালে তাঁদের সঙ্গীত জীবনের এক উল্লেখযোগ্য অংশ কলকাতায় অতিবাহিত ক'রে, কয়েকজন গুণী বাঙালীকে সঙ্গীতশিক্ষা দিয়েছিলেন। দুই ভ্রাতার মধ্যে প্রথমে কলকাতায় আসেন

ওস্তাদ কৌকভ খাঁ, মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের উদ্‌যোগে। প্রায় আট বছর কলকাতায় সগৌরবে অবস্থানের পর ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়। তিনি ছিলেন স্যার আশুতোষ চৌধুরী ও প্রতিভা দেবী প্রতিষ্ঠিত, বিখ্যাত 'সঙ্গীত সঙ্ঘ'র প্রধান যন্ত্রসঙ্গীত-শিক্ষক। তাঁর মৃত্যুতে তাঁর অভাবপূরণের জন্যে উক্ত সঙ্ঘের কর্তৃপক্ষ এলাহাবাদ থেকে ওস্তাদ করামৎউল্লাকে আনিয়েছিলেন। করামৎউল্লা কলকাতায় দশ বছরেরও অধিক কাল একজন বিখ্যাত ওস্তাদরূপে বসবাস করেন। খাঁ-ভ্রাতৃদ্বয়ের কাছে ধীরেন্দ্রনাথ বসু, হরেন্দ্রকৃষ্ণ শীল, কালিদাস পাল, কৃষ্ণচন্দ্র দে, নাটোররাজ যোগীন্দ্রনাথ রায়, নৃপেন্দ্রনাথ বসু, ননী মতিলাল, যতীন্দ্রচরণ গুহ (গোবরবাবু) প্রমুখের সঙ্গীতশিক্ষা। তাঁদের মধ্যে একমাত্র কৃষ্ণচন্দ্র দে কণ্ঠসঙ্গীতে খেয়ালের তালিম পান। অবশিষ্ট সকলেই ছিলেন যন্ত্রসঙ্গীতের শিষ্য। প্রেমাঙ্কুর দুই ভ্রাতার কাছেই, বিশেষ ওস্তাদ করামৎউল্লার কাছে সেতার শিক্ষা করেন। তা ছাড়া, তিনি এনায়েৎ খাঁ'র পিতা সেতার-সুরবাহার-বাদক ইম্‌দাদ খাঁ'র কাছেও কিছুদিন শিখেছিলেন। আধুনিককালে ঠুংরিগানের নেতৃস্থানীয় কলাবত গণপৎ রাও (ভাইয়া-সাহেব)-এর শিষ্য শ্যামলাল ক্ষেত্রীর কাছেও যাতায়াত করতেন প্রেমাঙ্কুর। সেখানে কণ্ঠসঙ্গীতের চর্চা না করলেও সঙ্গীত বিষয়ে কিছু উপকৃত হয়েছিলেন।

তাঁর জীবনের নানামুখী গতি, প্রধান শিল্পকর্ম সাহিত্য-সেবায় আত্মনিয়োগ, ইত্যাদি কারণে তাঁর সেতার শিক্ষা অগ্রসর হতে পারেনি। রাগসঙ্গীতের সাধনায় একান্ত নিমগ্ন না হলে তা সম্ভবও হয় না কারুর পক্ষে।

প্রেমাঙ্কুরের জীবনে আর একটি উল্লেখ্য অধ্যায় হ'ল—কলকাতা বেতারকেন্দ্রে কার্যকাল। কলকাতা বেতারের আদিযুগে, প্রতিষ্ঠানটি যখন বেসরকারী ছিল, তিনি সেখানে যোগ দেন। প্রায় সাতবছর একাদিক্রমে নিযুক্ত থেকে শুধু নিজের একাধিক গুণের পরিচয় দেননি, বেতারের উন্নতি ও জনপ্রিয়তা বৃদ্ধির জন্যেও কিছু দান ছিল তাঁর।

বেতারকেন্দ্রে তাঁর প্রধান পরিচয় ছিল বক্তা এবং 'বেতার জগৎ' পত্রিকার সম্পাদকরূপে। তা ছাড়া, স্বরচিত অনেক গল্পও এখানে তিনি পাঠ করতেন। প্রথম যুগে এবং নিয়মিত কার্যকাল শেষ হবার বহু পরে পর্যন্তও। তবে এখানে প্রথম যুগে তাঁর কাজের কথাই বিশেষ ক'রে উল্লেখ্য।

বক্তারূপে বেতারে তাঁর একটি ছদ্মনাম ছিল—সোমদত্ত। এই নামে তিনি নিয়মিত বিভিন্ন বিষয়ে ভাষণ দিতেন। সে-যুগের বেতারকেন্দ্রের যে ক'টি বিভাগ বিশেষ জনপ্রিয় হয়েছিল, তাদের মধ্যে অন্যতম বিশিষ্ট ছিল—'মহিলা মজলিস'। শ্রোত্রীদের জন্যে বিশেষ আসর। 'মহিলা মজলিস'-এর পরিচালক ছিলেন বিষ্ণুশর্মা ছদ্মনামে বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র। তিনি 'বেতার নাটুকে দল' (সেকালের বেতারের নাট্যগোষ্ঠী) এর প্রধান অভিনেতা ও প্রযোজকরূপে এবং হাস্যরসিক বক্তা হিসাবেও বিখ্যাত ছিলেন। বিষ্ণুশর্মা পরিচালিত সেই মহিলা মজলিসের আসরে প্রেমাঙ্কুর আতর্থী সোমদত্ত ছদ্মনামে ভাষণ দিতেন বিভিন্ন বিষয়ে। পাণ্ডিত্যপূর্ণ অথচ প্রাঞ্জল আলোচনার জন্যে 'সোমদত্ত' বেতার-শ্রোতাদের কাছে সুপরিচিত ছিলেন।

বেতারকেন্দ্রের মুখপত্ররূপে 'বেতারজগৎ' পত্রিকা

প্রকাশের পরিকল্পনা যাঁরা করেছিলেন, তাঁদের অন্যতম প্রেমাঙ্কুর। 'বেতারজগৎ'-এর তিনি শুধু অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা নন, প্রথম সম্পাদকও। ১৯২৯ সালে প্রকাশিত তার প্রথম সংখ্যা থেকে প্রায় ছ'বছর তিনি এর সম্পাদনার দায়িত্ব বহন করেছিলেন। 'বেতারজগৎ' শুধু বেতারের অনুষ্ঠানলিপি ছিল না। পাঠযোগ্য বিষয়াদির সমাবেশে তা জনপ্রিয় হয়েছিল তাঁর সম্পাদন নৈপুণ্যে।

কলকাতা বেতারকেন্দ্রের আর একটি বিশেষ ও বিখ্যাত অনুষ্ঠানের জন্যেও প্রেমাঙ্কুরের নাম স্মরণযোগ্য। তা হ'ল—প্রতিবছরের মহালয়া তিথির ব্রাহ্মমুহূর্তে অনুষ্ঠিত 'মহিষাসুর-মর্দিনী'। বেতারের সেই বেসরকারী এবং প্রথম যুগের প্রতিষ্ঠানটিতে এক অন্তরঙ্গ পরিবেশ ছিল। যে ক'জন বাঙালী তার সঙ্গে কর্মসূত্রে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিলেন, তাঁরা শুধু শুষ্ক কর্তব্য পালন ক'রে দায়িত্ব শেষ করতেন না। রেডিওর উত্তরোত্তর জনপ্রিয়তা বৃদ্ধির জন্যে নানাপ্রকার জল্পনা-কল্পনা করতেন নতুন নতুন বিভাগ ও অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা ক'রে। একদিন অভাবিত সময়ে বেশিক্ষণ ধরে এমন একটি বিশেষ ধরনের অনুষ্ঠান পত্তন করলে হয়, যাতে শ্রোতাদের মধ্যে একটা আলোড়ন জাগে, বেতার সম্পর্কে লোকে নতুন ক'রে সচেতন হ'য়ে ওঠে—এমন একটি 'আইডিয়া' প্রেমাঙ্কুরের মাথায় আসে। অন্যান্য কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনার ফলে মহালয়ার ভোর-রাত্রির এই অনুষ্ঠানটি পরিকল্পিত হয় সেসময়। প্রতিবছর বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের শ্রীশ্রীচণ্ডী থেকে সুরেলা আবৃত্তি, পঙ্কজকুমার মল্লিকের সুরসংযোজনা, অন্যান্য গায়ক-গায়িকা সহযোগে

সঙ্গীতাগুলি এবং বাণীকুমার লিখিত এই 'মহিষাসুরমর্দিনী' কলকাতা বেতারকে অগণিত শ্রোতাদের ঘরে ঘরে আপন ক'রে নিতে অনেকখানি সাহায্য করে।

বেতারকেন্দ্রের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকবার সময়ে প্রেমাঙ্কুরের যোগাযোগ ঘটে ফিল্ম জগতে স্বনামপ্রসিদ্ধ নিউ থিয়েটার্সের সঙ্গে। তাঁর জীবনের আর একটি পরিচ্ছদের সূচনা হয়। অর্থাৎ তাঁর সিনেমা-জীবন।

সিনেমা জগতের সঙ্গে এবার তিনি ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হয়ে পড়েন। এ যোগাযোগের সূত্রপাত হয়েছিল আরো কয়েক বছর আগে অবশ্য। তাঁর অন্যতম অন্তরঙ্গ সুহৃদ, উত্তরকালের স্বনামধন্য নট ও নাট্যাচার্য শিশিরকুমার ভাদুড়ীর উদ্‌যোগে। নাট্যাচার্য হবার আগে, নির্বাক চলচ্চিত্রের যুগে শিশিরকুমার এক ফিল্ম সংস্থার পত্তন করেছিলেন—তাজমহল ফিল্ম কোং। প্রেমাঙ্কুরকে তিনি চিত্রনাট্য রচনা করবার জন্যে আহ্বান করলেন। প্রেমাঙ্কুরও সোৎসাহে যোগ দেন শিশিরকুমারের সঙ্গে। কিন্তু সে-চলচ্চিত্রের কাজ শিশিরকুমারের বেশিদিন চলেনি, সুতরাং প্রেমাঙ্কুরেরও সে-জীবনে তখনকার মতন ছেদ পড়ে।

কিন্তু শিশিরকুমারের সেই সিনেমা-প্রচেষ্টার সংস্পর্শে এসে প্রেমাঙ্কুর ফিল্মের জগতে আকৃষ্ট হয়েছিলেন। তারপর মাঝে মাঝে সিনেমার কাজ করেন নানা ধরনের। নানা জায়গায় সাময়িক কাজ। সেও একরকমের বোহেমীয় জীবন। কিছুকাল লাহোরের এক ফিল্ম-প্রতিষ্ঠানে যুক্ত থাকেন। তাঁদের 'আনারকলি' ছবির 'কন্টিনিউইটি-ম্যান' হন প্রেমাঙ্কুর। তাঁদের কার্যালয় লাহোর, কিন্তু কর্মক্ষেত্র অর্থাৎ

'শুটিং' চল্‌ত দিল্লীতে। সে-সব দিনের স্মৃতি তাঁর কোনো কোনো গল্পে ('শেফালী' পুস্তকের অন্তর্গত) দেখা যায়।

তারও আগে প্রেমাঙ্কুর কিছুদিন ছিলেন নির্বাক যুগের বিখ্যাত অভিনেত্রী সীতা দেবীর প্রচার-সচিব। সীতা দেবী নামে সুপরিচিতা হ'লেও তিনি ইঙ্গ-ভারতীয়। ম্যাডন কোম্পানীর বহু সফল ছবির নায়িকা (ভ্রমর, সরলা, আয়েষা প্রভৃতি) রূপে সেকালের সিনেমা জগতের একজন শীর্ষস্থানীয়া ছিলেন সীতা দেবী।

তারপর প্রেমাঙ্কুর কিছুদিন প্রচার-সচিবের কাজ করেন এক ভ্রাম্যমাণ প্রতিষ্ঠানে। একটি থিয়েটারের দল গঠন ক'রে একসময় ভারতের নানা স্থানে অভিনয় প্রদর্শন করতেন নিরঞ্জন পাল। ভারতীয় সিনেমার অন্যতম আদি পরিচালক তিনি ; এবং ব্রাহ্ম নেতা বিপিনচন্দ্র পালের পুত্র। প্রেমাঙ্কুর ছিলেন সেই দলের প্রচার ও বিজ্ঞাপনের ভারপ্রাপ্ত।

সিনেমা-সংশ্লিষ্ট জগতে এমনি নানা বিচিত্র কাজ তিনি আগেই করেছিলেন। তা ছাড়া, তাঁর নিজের প্রথম উপন্যাস 'চাষার মেয়ে' নির্বাক-চলচ্চিত্রে রূপায়িত হয় আরো আগে।

এইসব পর্বের পর প্রেমাঙ্কুর কলকাতা বেতারকেন্দ্রে যোগ দিয়েছিলেন এবং সেখানে অবস্থান করবার সময়ে আবার নতুন ক'রে তাঁর সিনেমা জগতে প্রবেশ ঘটে। এবার আরো প্রত্যক্ষ অংশ নিয়ে এবং প্রথমে গল্প লেখক ও চিত্র নাট্যকার রূপে।

এ-যাত্রায় বিখ্যাত বীরেন্দ্রনাথ সরকার মহাশয়ের সঙ্গে প্রেমাঙ্কুরের যোগাযোগ হয়ে গেল। তখন নির্বাক ছবির শেষ পর্যায় চলেছে এবং বীরেন্দ্রনাথের ছবির জন্যে প্রেমাঙ্কুর

রচনা করলেন কাহিনী ও চিত্রনাট্য। চলচ্চিত্রটি নির্মাণের সমস্ত প্রস্তুতি শেষ হ'ল। এমন সময় বাধা পড়ল অকল্পিত-ভাবে, যেমন বাধা দেখা গেছে প্রেমাঙ্কুরের সারাজীবনে অসংখ্যবার।

হঠাৎ সবাক্ ছবির যুগ আরম্ভ হয়ে গেল। ম্যাডান প্রতিষ্ঠান থেকে বেরুল প্রথম সবাক্ চিত্র। সরকারমহাশয় নির্বাক্ ছবির পথে আর অগ্রসর হলেন না। চিন্তা করতে লাগলেন সবাক্-চিত্র-নির্মাণের বিষয়। প্রেমাঙ্কুরের সেই গল্প ও চিত্রনাট্য সবই নষ্ট হ'ল। তবে বীরেন্দ্রনাথের সঙ্গে যে-কর্মসূত্রে পরিচিত হয়েছিলেন, তার সুফল লাভ করলেন কিছুদিনের মধ্যেই।

বীরেন্দ্রনাথের নিউ থিয়েটার্সের সবাক্-চিত্র-প্রস্তুতির অন্যতম পরিচালক নিযুক্ত হলেন প্রেমাঙ্কুর। নিউ থিয়েটার্সে তাঁর পরিচালনায় শরৎচন্দ্রের 'দেনা পাওনা' সবাক্ ছবি রূপালী পর্দায় প্রথম আত্মপ্রকাশ করে। সিনেমা পরিচালক রূপে প্রেমাঙ্কুরের জীবন কয়েক বছর ধরে এগিয়ে চললো। এতদিন পরে এই প্রথম তিনি আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করলেন বটে, কিন্তু সাহিত্য জীবন হ'ল রাহুগ্রস্ত। দশবছরেরও বেশি সাহিত্যের সঙ্গে প্রায় সম্পর্করহিত হয়ে গেল। নিউ থিয়েটার্সে তাঁর পরিচালনায় পর পর সবাক ছবি মুক্তিলাভ করতে লাগল—'কপালকুণ্ডলা', 'ইহুদী-কী লেড়কী' (হিন্দী), 'পুনর্জন্ম', 'দিক্‌শূল', 'সুধার প্রেম' ইত্যাদি।

শুধু পরিচালনায় নয়, এখানে তাঁর আরো একটি কৃতিত্বের প্রকাশ দেখা যায় তা তাঁর অভিনয়নৈপুণ্য। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'পুনর্জন্ম' নাটকের সবাক্ চিত্রে প্রেমাঙ্কুর প্রধান

ভূমিকা যাদবের অংশ অভিনয় করেন। চমৎকার হয় তাঁর যাদবের অভিনয়। 'কপালকুণ্ডলা' চিত্রেও তিনি একটি ছোট অংশে অভিনয় করেছিলেন এবং 'ইহুদী-কী লেড়কী'-তেও একটি ক্ষুদ্র ভূমিকা নেন। প্রসঙ্গত বলা যায় যে, অভিনয়-শক্তি তাঁর ছিল, কিন্তু তার অভ্যাস তিনি করেননি কখনো। তাঁর কথাবার্তার ধরনই ছিল নাটকীয়। অত্যন্ত সরস ও আকর্ষক কথার ভঙ্গিতে তিনি কোনো বিষয়কে বর্ণনা করতে পারতেন রীতিমত জীবন্ত ক'রে—(তাঁর লেখারও যা বিশেষত্ব)।—বর্ণনার সময়ে তাঁর মুখে-চোখে যে ভাবের অভিব্যক্তি প্রকাশ পেত, তা নিপুণ অভিনেতার। হাবভাব যথোচিত প্রকট ক'রে শ্রোতাদের মনে বিষয়ের ছবি এঁকে দেবার জন্যে তিনি কথাবার্তার মধ্যে দাঁড়িয়ে উঠে হস্তাদি, অঙ্গ সঞ্চালন করতেন। ফলে তাঁর বর্ণিত বিষয়ই শুধু প্রাণবন্ত হ'ত না, সে-আসরও হয়ে উঠত সজীব। এও তাঁর অভিনেতা সত্তার এক লক্ষণ। সে যা হোক, নিউ থিয়েটার্সের পর সিনেমা জীবনে তিনি 'ভারতলক্ষ্মী পিকচার্স'-এও কিছুকাল ছিলেন। তারপর চলে যান বোম্বাইয়ের চলচ্চিত্র জগতে।

বোম্বাই অঞ্চলেও কয়েক বছর থেকে যান। সেখানে তাঁর পরিচালনায় 'সরলা', 'ভারত-কী বেটী' এবং অন্যান্য হিন্দী-উর্দু কয়েকটি চিত্র গৃহীত হয়। সেখানে তাঁকে কাজ করতে হয়েছিল হিন্দী উর্দু ছবিতে। সেজন্যে ভাষা দু'টিও বেশ খানিক শিখতে হয়েছিল। উর্দুতে অভিনয় শিক্ষাও দিতে হ'ত তাঁকে।

বোম্বাইতে বাসের মধ্যে কোলাপুরে কয়েকমাস চাকরিসূত্রে কাটিয়ে আসেন। এইভাবে বোম্বাইয়ের পালা শেষ ক'রে

প্রত্যাবর্তন করেন বাংলাদেশে। এই দীর্ঘকাল সাহিত্যসৃষ্টি স্তব্ধ ছিল, বলা যায়। তবে প্রবাসজীবনের এসব ঘটনাবলীর কিছু কিছু তাঁর সাহিত্যের বিষয়বস্তু হয়ে দেখা দিয়েছে উত্তরকালে।

কলকাতায় ফিরে আসবার পরে আবার তাঁর সাহিত্যচর্চার কিছু ফসল ফলে। 'স্বর্গের চাবি' নামে স্মরণীয় গল্পগ্রন্থ প্রকাশিত হয় তাঁর পরিণত প্রতিভার স্বাক্ষর নিয়ে। তাঁর সাহিত্য-প্রতিভার শ্রেষ্ঠ ফলন অবশ্য 'মহাস্থবির জাতক'। যার তিনটি পর্ব তাঁর জীবনের অপরাহ্নে দশবছরের মধ্যে পর্যায়ক্রমে প্রকাশিত হয়। 'জাতক' তাঁর শেষ সৃষ্টিও। তৃতীয়পর্ব জাতক প্রকাশের পর তিনি আরো দশবছর বর্তমান ছিলেন এবং তাঁর সৃষ্টিক্ষমতা অব্যাহত ছিল। সেপ্রসঙ্গ উল্লেখ করবার আগে তাঁর ব্যক্তিজীবন ও সাহিত্যজীবনের আরো কিছু তথ্য জানাবার আছে।

সাহিত্যজীবনের মধ্যে আছে তাঁর নাটকের প্রসঙ্গও। ছু'খানি নাটক তিনি লিখেছিলেন। তার মধ্যে একখানির নাম বাংলার নাট্যামোদীদের সুপরিচিত। 'তখ্ত-এ-তাউস' অর্থাৎ ময়ূরসিংহাসন। মোগল বাদশাহীর পতনের যুগে আওরঙ্গজেবের পৌত্র জাহান্দার শা'র একবছরের বাদশাগিরি ও পরে নিজের ভ্রাতুষ্পুত্র ফর্রুখ্‌শিয়ারের দ্বারা নিহত হওয়ার বৃত্তান্ত অবলম্বনে রচিত এই নাটক। নাট্যাচার্য শিশিরকুমারের পরিচালনায় ১৯৫১ খ্রীঃ ১০ মে থেকে শ্রীরঙ্গম্ রঙ্গমঞ্চে মহাসমারোহে অভিনীত হয়। যে মুষ্টিমেয় কয়েকটি নতুন নাটক ভাহুড়ীমহাশয়ের শেষজীবনে তাঁর প্রতিভার যোগ্য বাহন হয়েছিল, প্রেমাঙ্কুরের এই শক্তিশালী নাটকটি তার

অন্যতম। 'তখ্‌ত-এ-তাউস' এর নায়ক জাহান্দার শা'র চরিত্রে অভিনয় ক'রে শিশিরকুমার নিজের অভিনীত 'দিগ্বিজয়ী' যুগের প্রতিভার পরিচয় খানিক দিয়েছিলেন—নাট্যকার প্রেমাঙ্কুরের পক্ষে তা কম গৌরবের কথা নয়। নাটকটির স্বাতন্ত্র্য পূর্ণ ঐতিহাসিকত্বে। প্রত্যেকটি চরিত্র ও ঘটনা এমন নিষ্ঠার সঙ্গে ইতিহাস থেকে নাট্যকার গ্রহণ করেছেন যে, কোনো কাল্পনিক ব্যক্তি বা ঘটনা-সংস্থানের স্থান নাটকে দেননি। অথচ আদ্যোপান্ত নাটকীয় উপাদান, আবেদনে ও শক্তিশালী সংলাপে রীতিমত চিত্তাকর্ষক। এই দিক থেকে প্রেমাঙ্কুরের এই নাটক বাংলায় অনন্য।

নাটকটি তিনি লেখেন ১৯২৫ সালে। —অর্থাৎ ছাব্বিশ বছর পরে তা মঞ্চস্থ হয়। কারণ শিশিরকুমার এটি হারিয়ে ফেলেছিলেন সে-সময়। প্রেমাঙ্কুর রচিত আর একখানি নাটকও শিশিরকুমারের কাছে ছিল। সেটিও হারিয়ে ছিলেন নাট্যাচার্য। আর পাওয়া যায়নি। সে নাটকও শিশির-কুমারের অত্যন্ত পছন্দ হয়েছিল এবং অভিনয় করবেন ব'লে রেখেছিলেন। প্রেমাঙ্কুরের ভাষায়—"এমন যত্ন ক'রে শিশির রাখলে যে আর খুঁজে পাওয়া গেল না"।

সেই লুপ্ত নাটকখানির নাম 'মাটির ঘর'। রুশ লেখক ম্যাক্‌সিম গোর্কীর Lower Depths নাটকের ছায়া অবলম্বনে প্রেমাঙ্কুর রচনা করেন 'মাটির ঘর'। তবে তিনি বলতেন—"এরকম স্তরের জীবন আমি নিজে বিস্তর দেখেছি, আমার এ-বিষয়ে খুব অভিজ্ঞতা আছে।" গোর্কীর Lower Depths-এর ভাব-অনুসরণে এবং এদেশে তাঁর নিজের দেখা ঐ শ্রেণীর মানুষের জীবনযাত্রা ও চরিত্র নিয়ে নাট্যসূত্র গ্রথিত

ক'রে প্রেমাঙ্কুর লিখেছেন 'মাটির ঘর'। শিশিরকুমার যখন সেটি আগ্রহ ক'রে নিয়েছিলেন নিজে মঞ্চস্থ করবার জন্যে তখন 'মাটির ঘর' যে একটি সার্থক নাটক-রচনা হয়েছিল তা অনুমান করা যায়। সেইসঙ্গে 'তখ্‌ত-এ-তাউস'-এর সাফল্য স্মরণ করলে মনে হয় যে, আরও নাটক রচনা করলে প্রেমাঙ্কুর এ-বিভাগেও স্মরণীয় অবদান রেখে যেতেন।

আরও কিছু লেখা তাঁর ছিল, যা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়নি। 'দক্ষিণে' শিরোনামায় তাঁর দক্ষিণ-ভারতের একটি ভ্রমণ বৃত্তান্ত 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় চার সংখ্যায় বেরিয়েছিল একটি ঐতিহাসিক বিষয়ে তাঁর অনুবাদ রচনা আর একটি মাসিক পত্রিকায় কয়েক মাস ধ'রে প্রকাশিত হয়। কিন্তু তাও সম্পূর্ণ করতে পারেননি গুরুতর শারীরিক পীড়ার জন্যে সে-লেখাটি ছিল দিল্লীর মোগলদের বিষয়ে ইতালীয় গ্রন্থকার Manucci-র পুস্তকের অনুবাদ। তা ছাড়াও ছোটদের জন্যে লেখা কয়েকটি গল্পাদি, সাধারণ সাহিত্যের আসরে রাজশেখর বসু, দেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী, সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের স্মৃতিকথা প্রভৃতি তাঁর কিছু রচনা সাময়িক পত্র-পত্রিকায় বিক্ষিপ্ত হয়ে আছে।

'মহাস্থবির জাতক' তাঁর শেষ ও সর্বোত্তম গ্রন্থ প্রেমাঙ্কুরের শিল্পীমানসের যথার্থ সৃষ্টিক্ষেত্র সাহিত্যের আসরে। সেখানে তাঁর গৌরবোজ্জ্বল পুনরাবির্ভাব ঘটে যে 'মহাস্থবির জাতক' নিয়ে, তার রচনা আরম্ভ করেন কিন্তু এক বাহ্যিক উপলক্ষ্যের ফলে। স্বয়ং শরৎচন্দ্র হয়েছিলেন এই উপলক্ষ্য। আর অমল হোমের উৎসাহে আপন জীবনকথা নিয়ে 'মহাস্থবির' রচনা শুরু করেন প্রেমাঙ্কুর।

শরৎচন্দ্র প্রেমাঙ্কুরের স্বকীয় প্রত্যেকটি লেখা সেই অতীতের 'ভারতী'-'যমুনা'র যুগেও পাঠ করতেন। তাঁর সাহিত্যিক ভবিষ্যৎ অত্যুজ্জ্বল ব'লে শরৎচন্দ্রের ধারণা ছিল। সাহিত্যকর্মের জন্যে অতি স্নেহের চক্ষে দেখতেন তিনি প্রেমাঙ্কুরকে। সেই শরৎচন্দ্র একদিন তাঁকে তীব্র ভাষায় তিরস্কার করলেন। সিনেমায় মেতে সাহিত্যের সঙ্গে সম্পর্ক ঘুচিয়েছেন বলে ধিক্কার দিলেন নিউ থিয়েটার্স স্টুডিওতেই অনেকের সামনে। প্রেমাঙ্কুর তখন সদলে আড্ডা দিচ্ছিলেন। প্রতিভার যোগ্যক্ষেত্র ত্যাগ করে নিজের চূড়ান্ত ক্ষতি করেছেন প্রেমাঙ্কুর—তাঁকে এই ধরনের ভর্ৎসনা সেখানে শরৎচন্দ্র করলেন।

শিল্পী শরৎচন্দ্রের সেই মর্মান্তিক অভিযোগের ফল—মহাস্থবির জাতক!

তারই প্রতিক্রিয়ায় নতুন সৃষ্টির প্রেরণা প্রেমাঙ্কুর মনের মধ্যে লাভ করলেন। লেখা অবশ্য সঙ্গে-সঙ্গেই আরম্ভ হ'ল না। বেশ কিছুদিন পরে, নিজেরই বর্ণচ্ছটাময় অতীতের বিষামৃত মন্থন ক'রে, সমগ্র জীবনের নির্যাসে সুরভিত ক'রে লিখতে লাগলেন 'মহাস্থবির জাতক'। অতিশয় নিষ্ঠার সঙ্গে লিখলেন, জীবন-পাত্র থেকে সপ্রাণ উপকরণ নিয়ে।

প্রথম পর্বটি সম্পূর্ণ করতেই ছু'বছর লাগল। লিখেছেন, সংশোধন করেছেন। আবার লিখেছেন নতুন ক'রে। শিল্পকর্ম-হিসেবে যতদিন না মনের মতন হয়েছে, প্রকাশ করেননি "শতকরা নব্বুই-ভাগ সত্য" এই রচনা। ছু'বছর ধরে লেখা প্রথম পর্ব শেষ হবার পর, 'শনিবারের চিঠি' মাসিকে ধারাবাহিক প্রকাশিত হয়। বই আকারে দেখা

দেয় তারও পরে। বাংলা-সাহিত্যে 'মহাস্থবির জাতক' রীতিমত আলোড়ন সৃষ্টি করে। প্রেমাঙ্কুরের স্থান সুনির্দিষ্ট হয়ে যায় বহুকালের জন্যে।

তবে শরৎচন্দ্র 'মহাস্থবির জাতক' দেখে যেতে পারেননি।

কিন্তু প্রেমাঙ্কুর সেই সস্নেহ তিরস্কার এবং প্রেরণা পাবার কথা ভোলেননি। বৃদ্ধ বয়সেও উল্লেখ করতেন স্বভাবসিদ্ধ আন্তরিকতার সঙ্গে।

তাঁর স্বভাবের এই এক বৈশিষ্ট্য ছিল যে, নিজের সাহিত্যকৃতি নিয়ে অহমিকা প্রকাশ করতেন না। তাঁর লেখা পাঠ ক'রে বিশেষ তৃপ্তি পাওয়া যায় এ-কথা বললে তাঁর মুখ প্রসন্নতায় উদ্ভাসিত হত, এই পর্যন্ত।

একদিকে অহঙ্কারের অভাব, অন্যদিকে নিজের সমস্ত দোষত্রুটি দুর্বলতা স্বীকারের মধ্যে দিয়ে তাঁর চরিত্রের সরলতা প্রকাশ পেত। নিজের কোনো গুণের কথা ফলাও ক'রে গৌরব নেবার চেষ্টা করতেন না, সহজাত-বিনয়-বশত। তাঁর সাহিত্যে যেমন, ব্যক্তিচরিত্রেও আন্তরিকতার গভীরে এক নিরাসক্ত মন প্রচ্ছন্ন ছিল। এই নিরাসক্তি নিয়েও কিন্তু তিনি জীবন ও জগৎকে দেখেছিলেন প্রাণ ভরে। তাই অতি স্থূল বাস্তবের মধ্যে তিনি জীবনে বহুবার অবগাহন করলেও, পঙ্ক তাঁর অন্তরকে আবিল করতে পারেনি। পঙ্কজের মতন তিনি সুন্দরকে প্রকাশ করেছিলেন তাঁর অমৃত সাহিত্যে।

বোম্বাই থেকে ফিরে আসবার পরে ২, রঘুনাথ চ্যাটার্জি স্ট্রীটের বাড়িতে বারো বছর বাস করেন। তাঁর পত্নী ও প্রিয় কনিষ্ঠ জ্ঞানাঙ্কুরের মৃত্যু হয় এখানে। ১৯৪১ থেকে ১৯৫৩

পর্যন্ত এ-বাড়িতে বাসের সময়ে ১৯৪৩ সালে তাঁর পত্নী পরলোকগতা হন। ১৯৫১ সালে প্রেমাঙ্কুর গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন অ্যাজ্‌মা টাইপের ব্রঙ্কাইটিসে। পরে 'হাই ব্লাড-প্রেসার' দেখা দেয়।

১৯৫৩ সালে সেই নিঃসঙ্গ বাড়ি ছেড়ে চলে আসেন বিবেকানন্দ রোডের পাশে, ৭-এ চালতাবাগান লেনে। তাঁর দুই কন্যার মধ্যে কনিষ্ঠার গৃহে। এখানেই তাঁর শেষের প্রায় এগারো বছর অতিবাহিত হয়েছিল।

কৈশোর থেকে চির-অশান্ত প্রেমাঙ্কুর শান্ত হয়ে পড়লেন শেষপর্বে। তখনকার প্রায় ন'-দশ বছর সেই অশ্রান্ত যাযা-বরের যেন বন্দী-জীবন। 'রক্তচাপের আধিক্য' রোগ তারও আগে থেকেই দেখা দেয়। অন্তিমের বছরগুলি পর্যুদস্ত ক'রে ফেলে তাঁকে। ক্রমে বাড়ির বাইরে বেরুনো বন্ধ, তারপর ঘর থেকেও। চার দেয়ালের মধ্যে এতকালের মুক্ত-বিহঙ্গের গতি রুদ্ধ হয়ে যায়।

এখন অখণ্ড অবসর,—অতীতে যা ছিল অভাবিত। সেই-সঙ্গে শিল্পমন, সাহিত্যিকের অতিশয় সংবেদনশীলতা সবই অবিকৃত আছে। সমগ্র বিগত জীবনের স্মৃতি মনের মুকুরে জাজ্বল্যমান হয়ে পরম আকুলতা জাগায়। এখনো যে অনেক কথা রয়ে গেছে লেখবার অপেক্ষায়। অপরিসীম বৈচিত্র্যে ভরা এই প্রাণের পাত্র। তার সব স্বাদ তো এখনো প্রকাশ করা হয়নি। চিন্তার পটে এখনো কত স্মৃতি-রঙ্গ! কত অপরূপ আনন্দ-বেদনার অভিজ্ঞতা। ভূয়োদর্শনের সঙ্গে নিজের জীবনদর্শন মিলিত হয়ে অন্তর থেকে প্রেরণা আসে। কলম নিয়ে বসেন জাত-সাহিত্যিক প্রেমাঙ্কুর আতর্থী। আরম্ভও

করেন 'মহাস্থবির জাতক' চতুর্থপর্ব রচনা। কিন্তু দেহপট এখন অপটু। ইচ্ছামতন কাজ এগোয় না। এক-একদিন অসুস্থ হয়ে পড়েন আকস্মিকভাবে। বন্ধ হয়ে যায় লেখা······

শেষ দশবছর শয্যা আশ্রয়ী হয়ে পড়লেন। নিজের হাতে কিছু লিখতে পারেন না, হাত কাঁপে।

তাঁর সাহিত্য জীবনের এই পর্যায়ে রচনার প্রসঙ্গ অসম্পূর্ণ থেকে যাবে কবি উমা দেবীর উল্লেখ না করলে। আলোচ্য কালের ক'বছর আগে 'জাতক' তৃতীয়পর্ব যখন 'শনিবারের চিঠি'তে প্রকাশিত হ'তে আরম্ভ করে, তখনই আতর্থী মহাশয় অসুস্থ হয়ে পড়েন। সে-সময় 'শনিবারের চিঠি'-তে 'জাতক' ধারাবাহিক প্রকাশ সম্ভব হ'ত না যদি উমা দেবী লেখকের খাতা থেকে নিয়মিত প্রেস-কপি প্রস্তুত ক'রে না দিতেন। এ-কথা গ্রন্থকার স্বয়ং জানিয়েছেন তৃতীয়পর্ব পুস্তকের

শেষের বছরগুলিতে অসুস্থতার জন্যে লেখা স্তব্ধ হতে দেখে উমা দেবী এ-বিষয়ে সাহায্য করেন। যেদিন প্রেমাঙ্কুর অপেক্ষাকৃত সুস্থ থাকেন, তিনি মুখে মুখে ব'লে যান এবং লিখে নেন উমা দেবী। এইভাবে 'জাতক' চতুর্থপর্বের বাকি তিন-চতুর্থাংশ লেখা সম্পূর্ণ হয়। লেখকের জীবদ্দশায় তার বিচ্ছিন্ন একাধিক অধ্যায় পত্রিকায় প্রকাশ পেলেও পরিপূর্ণ আকারে দেখা দেয়নি। তাঁর মৃত্যুর তিন বছর পরে উমা দেবীর উদ্‌যোগে প্রথমে দেশ সাপ্তাহিকে ধারাবাহিক প্রকাশিত হয়ে 'মহাস্থবির জাতক' চতুর্থপর্ব গ্রন্থাকারে দেখা দেয় ১৯৬৯ সালে।

তাঁর জীবনের সেই শেষ পর্বে প্রকাশিত এবং শেষ গল্পের বই 'শিউলি'ও অনেকাংশেই লেখকের মুখে বলা এবং উমা দেবীর লিখে-নেওয়া থেকে মুদ্রিত। 'শিউলি'র উৎসর্গপত্রে প্রকাশিত, লেখকের বাল্যবন্ধু অমল হোমের উদ্দেশে রচিত কবিতাটিও প্রেমাঙ্কুর-বর্ণিত ভাব অনুসারে লিখিত। জীবনের এই সমাপ্তি-পর্যায়ে বিভিন্ন সাময়িক পত্রাদিতে প্রকাশিত প্রেমাঙ্কুরের রাজশেখর বসু, দেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী ('নব্য-ভারত' মাসিকের সম্পাদক), সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত সম্পর্কে স্মৃতি-কথা এইভাবেই রচিত।

শেষপর্যন্ত, অসুস্থতা সত্ত্বেও, প্রেমাঙ্কুর ছিলেন বুদ্ধিদীপ্ত, পরিহাস-রসিক বেশে বর্ণে ভাষণে উজ্জ্বল এবং চিত্তাকর্ষক সদালাপী।

এক গল্পের নায়ক মতিলাল যেমন অন্তিমে বলে যায়, 'বেশ কাটানো গেল পৃথিবীতে, কি বল ভাই ?'

প্রেমাঙ্কুরের গ্রন্থ-তালিকা

বাজীকর	(গল্পগ্রন্থ)	দুই রাত্রি	(উপন্যাস)
ঝড়ের পাখী	(উপন্যাস)	কল্পনাদেবী	,,
অচল পথের যাত্রী	,,	প্রবাসী	,,
চাষার মেয়ে	,,	স্বর্গের চাবি	(গল্পগ্রন্থ)
অরুণা	,,	প্রভাত সঙ্গীত	(রম্যরচনা)

বিচিত্র লোক (গল্পগ্রন্থ)
শিউলি ,,
তখ্ত-এ-তাউস (নাটক)
স্বনির্বাচিত গল্প (গল্পসংগ্রহ)
মহাস্থবির জাতক [প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ পর্ব (উপন্যাস)
আনারকলি (ছোটদের উপন্যাস)
ডানপিটে (ছোটদের উপন্যাস)
ছোটদের ভাল ভাল গল্প

কিছু কিছু অনুবাদ-কর্মও তিনি করেছিলেন। এ ছাড়া তাঁর অসংখ্য ছোটগল্প 'মৌচাক', 'যাদুঘর' 'রংমশাল' ইত্যাদি পত্রিকায়। 'মৌচাক'-এ 'দুষ্টু ছেলের ডায়েরি'-নামক ছোটদের উপন্যাস ছড়িয়ে আছে। বিভিন্ন মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত বড়দের গল্প সব এখনো পর্যন্ত গ্রন্থস্থ হয়নি।

প্রথম লেখা—'জাহ্নবী'-পত্রিকায় প্রকাশিত একটি সমালোচনা।
প্রথম বই—'বাজীকর' গল্পসংগ্রহ।
প্রথম উপন্যাস—'ঝড়ের পাখী'।

'বাংলা ছায়াছবির ইতিহাস' এই নামে ২ সংখ্যায় ও পরে 'ছায়ালোকের কথা' নামে ২০ সংখ্যায় তিনি (১৩৫৭ সালের ২৬ ফাল্গুন থেকে ১৩৫৮ সালের ২৭ পৌষ) ধারাবাহিকভাবে চলচ্চিত্র সম্বন্ধে রচনা 'দৈনিক বসুমতী'তে প্রকাশ করেন।

পত্রিকা সম্পাদনা (সম্পাদক অথবা সম্পাদকমণ্ডলীর অন্যতম)

১। 'জাহ্নবী'— মাসিক
২। 'ভারতী' — ,,
৩। 'মৌচাক'— ,,
৪। 'যাদুঘর' — ,,
৫। 'রংমশাল'— ,,
৬। 'নাচঘর'— সপ্তাহিক
৭। 'হিন্দুস্থান'—দৈনিক
৮। 'বেতার-জগৎ' [প্রথম সম্পাদক (১৯২৯)] —পাক্ষিক

২ | নেপথ্যের রাজশেখর

"আমি আধা মিস্ত্রি আধা কেরানী।'

রাজশেখর বসুর এই ছিল আত্মপরিচয়।

পরশুরাম নামে তিনি রসসাহিত্যের অমর স্রষ্টা। সেই সঙ্গে, বিখ্যাত বেঙ্গল কেমিক্যাল প্রতিষ্ঠানের রাসায়নিক বিজ্ঞানী ও কর্মাধ্যক্ষ। তাই তাঁর নিজের সম্পর্কে ওই নম্র উক্তি।

কিন্তু সে বিনয়ভাষণও রাজশেখরের সম্পূর্ণ পরিচিতি নয়। আরও নানা গুণের তিনি অধিকারী। বহুমুখী প্রতিভার আধারই তাঁকে বলা উচিৎ। এমন বিভিন্ন ও বিচিত্র প্রকারের গুণী অল্পই দেখা যায়। একাধারে তিনি সৃজনশীল সাহিত্যিক, শাস্ত্রজ্ঞ, বিবুধ, বৈজ্ঞানিক, ব্যবসায়িক সংস্থার পরিচালক, চিত্রশিল্পী, ব্যবহারিক যন্ত্র নির্মাতা, আইনজ্ঞ এবং পণ্য দ্রব্যের প্রচার কুশলী। তবে রাজশেখর মুখ্যত রসসাহিত্যের লেখক এবং বিজ্ঞান কর্মী। এই দুর্লভ যুগল-সত্তার সহজ সহাবস্থান তাঁর মধ্যে ঘটেছিল। চিত্তের দুই বিপরীতমুখী উৎকর্ষ স্ফূর্ত হয় তাঁর স্বভাবের প্রেরণায়। দুটি ক্ষেত্রেই তিনি আচার্যের সম্মানে প্রতিষ্ঠা পেয়েছিলেন।

প্রথম পুস্তক 'গড্ডালিকা' প্রকাশের সঙ্গেই অভাবিত যশস্বী হন রাজশেখর। অযাচিত লাভ করেন রবীন্দ্রনাথের অকুণ্ঠ অভিনন্দন। বঙ্গের বরণীয় সন্তান প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের বেঙ্গল কেমিক্যালের কর্ণধার তখন রাজশেখর। তাঁর সাহিত্য জীবনের সেই উদ্বোধন লগ্নে সে সময়েই একটি সমস্যা দেখা

দেয়। তিনি কি লেখক-বিজ্ঞানী হয়ে থাকতে পারবেন একযোগে? না, বিভক্ত হবে তাঁর বৈজ্ঞানিক-সাহিত্যিকের দ্বৈত স্বরূপ? সক্রিয় বিজ্ঞানের পথ ত্যাগ করে রাজশেখর কি সাহিত্যের সরণিতে উপনীত হবেন?

রবীন্দ্রনাথের উচ্ছ্বসিত প্রশংসায় উৎকণ্ঠিত হন প্রফুল্লচন্দ্র। রাজশেখর সম্পর্কে উদ্‌বেগ প্রকাশ করে কবিকে বিজ্ঞানাচার্য পত্র লেখেন—

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

...সম্প্রতি দেখিতেছি আপনি সত্য সত্যই আমার ক্ষতি করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। 'গড্ডলিকা'র প্রথম সংস্করণ বিক্রয় হইয়া গিয়াছে। কিন্তু যখন দেখি স্বয়ং সাহিত্য সম্রাট তাহার সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তখন অচিরে পর পর বারো হাজার কপি যে বিক্রয় হইবে তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। সেদিন গ্রন্থকার পরশুরামকে আমি বলিলাম, এ প্রকার সৌভাগ্য কদাচিৎ কোন লেখকের ঘটিয়া থাকে। এখন তাঁহার মাথা না বিগড়াইয়া যায়। তিনি আমারই হাতের তৈয়ারি একজন রাসায়নিক এবং আমার নির্দিষ্ট কোন বিশেষ কার্যে অনেকদিন যাবৎ ব্যাপৃত। কিন্তু তিনি এখন বুঝিলেন যে তিনি সাহিত্যক্ষেত্রেও একজন "কেষ্ট-বিষ্টু"। সুতরাং আমাকে অসহায় রাখিয়া ত্যাগ করিতে ইচ্ছুক হইতে পারেন।...

আসল কথা এই যে, আপনাকে কি অনুরোধ করিব যে আর একটি এমন তীব্র সমালোচনা করুন যে পরশুরামের হাত হইতে কুঠার খসিয়া পড়ে? এক সময় পড়িয়াছিলাম যে অনেক তত্ত্ব ও শক্তি গুহায় নিহিত থাকে; কিন্তু ভগবানের

লীলা কে বুঝিবে, কাহাকে কখন গুপ্ত অবস্থা হইতে সুপ্রকাশ করিয়া তুলেন!

ভবদীয়

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায়

রবীন্দ্রনাথ উত্তর দেন—

ওঁ

সুহৃদ্বর, শান্তিনিকেতন

বসে বসে Scientific American পড়ছিলুম। এমন সময় চিঠির খামের কোণে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান-সরস্বতীর পদাঙ্ক দেখতে পেয়ে সন্দেহ হল, আমার হৃদ-পদ্ম থেকে কাব্য সরস্বতীকে বিদায় করে তিনি স্বয়ং আসন নেবেন এমন একটা চক্রান্ত চলচে। খুলে দেখি, যাকে ইংরেজিতে বলে টেবিল ফেরানো—আমারই পরে অভিযোগ যে, আমি রসায়নের কোঠা থেকে ভুলিয়ে ভদ্রসন্তানকে রসের রাস্তায় দাঁড় করাবার দুষ্কর্মে নিযুক্ত। কিন্তু আমার এই অজ্ঞানকৃত পাপের বিরুদ্ধে নালিশ আপনার মুখে শোভা পায় না; একদিন চিত্রগুপ্তের দরবারে তার বিচার হবে। হিসাব করে দেখবেন, কত ছেলে যারা আজ পেটমোটা মাসিকপত্রে ছোটগল্প আর মিল হারা ভাঙা ছন্দের কবিতায় সাহিত্যলোকে একেবারে কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড বাধিয়ে দিতে পারত, এমন কি লেখাদায়গ্রস্ত সম্পাদক মণ্ডলীর আশীর্বাদে যারা দীপ্ত শিখা সমালোচনায় লঙ্কাকাণ্ড পর্যন্ত বড় বড় লাফে ঘটিয়ে তুলত, তাদের আপনি কাউকে বি এস সি কাউকে ডি এস সি লোকে পার করে দিয়ে ল্যাবরেটরির নির্জন নিঃশব্দ সাধনায় সন্ন্যাসী করে

তুললেন। সাহিত্যের তরফ থেকে আমি যদি তার প্রতি-শোধ নিতে চেষ্টা করে থাকি, কতটুকুই বা কৃতকার্য হয়েছি। আপনার রাসায়নিক বন্ধুটিকে বলবেন, মাসিকপত্র-বলে যে সব জীবাত্মা হয়ত বা সাহিত্য-বীর হতে পারত ভূশণ্ডীর মাঠে তাদের অঘটিত সম্ভাবনার প্রেতগুলির সঙ্গে আপনার মোকাবিলার পালা যেন তিনি রচনা করেন।

আমার কথা যদি বলেন—আপনার চিঠি পড়ে আমি অনুতপ্ত হইনি, বরঞ্চ মনের মধ্যে একটু গুমোর হয়েছে। এমন কি ভাবচি স্বামী শ্রদ্ধানন্দের মতো শুদ্ধির কাজে লাগব, যে সব জন্ম-সাহিত্যিক গোলেমালে লেবরেটরির মধ্যে ঢুকে পড়ে জাত খুইয়ে বৈজ্ঞানিকের হাটে হারিয়ে গিয়েছেন তাঁদের ফের একবার জাতে তুলব। আমার এক একবার সন্দেহ হয় আপনিও বা সেই দলের একজন হবেন, কিন্তু আপনার আর বোধহয় উদ্ধার নেই। যাই হোক আমি রস যাচাইয়ের নিকষে আঁচড় দিয়ে দেখলুম, আপনার বেঙ্গল কেমিক্যালের এই মানুষটি একেবারেই কেমিক্যাল গোল্‌ড্‌ নন, ইনি খাঁটি খনিজ সোনা।

এ অঞ্চলে যদি আসতে সাহস করেন তাহলে মোকাবিলায় আপনার সঙ্গে ঝগড়াঝাঁটি করা যাবে। ইতি—১৮ অগ্রাণ ১৩৩২

আপনার

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কিন্তু প্রফুল্লচন্দ্রের আশঙ্কা অমূলক হয়। লেবরেটরির হাট থেকে রাজশেখরকে জাতে তোলবার ব্যবস্থাও করেননি রবীন্দ্রনাথ। পরশুরাম এবং বেঙ্গল কেমিক্যালের অধ্যক্ষ

অপূর্ব সমন্বয় সাধন করে নেন। স্বদেশের মঙ্গল চিন্তায় ও কার্যে উৎসর্গকরা জীবন প্রফুল্লচন্দ্রের। তারই এক মহৎ প্রয়াস—বাংলার প্রথম যুগের শিল্পপ্রতিষ্ঠান বেঙ্গল কেমিক্যাল এ্যাণ্ড্ ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্ক্স লিমিটেড স্থাপনা। দেশব্রত বিজ্ঞানীর এই মানস সন্তানটিকে রাজশেখর শৈশব থেকে লালন পালন করেন। প্রতিষ্ঠিত করে দেন স্বনির্ভর সাবালকত্বে। আচার্যের ভাবাদর্শ বাস্তবে রূপায়িত হয়। তাঁর পরম আস্থাভাজন রাজশেখর। তাঁর অর্ধশতাব্দের অধিককালের সেবায় এ প্রতিষ্ঠানের জয়যাত্রা সম্ভব। তারই প্রায় সমকালীন তাঁর নিরলস সাহিত্যকর্ম।

সংস্থাটির কর্ণধাররূপেও রাজশেখরের কর্মজীবন ছিল বৈচিত্র্যময় এবং পরিচিত মহলের পরম বিস্ময়। তিনি তার একই সঙ্গে কার্যাধ্যক্ষ (ম্যানেজার), রাসায়নিক, প্রচার সচিব, আইন পরিদর্শক ইত্যাদি নানা লিখিত ও অলিখিত পদে কাজ করে যান। বেঙ্গল কেমিক্যালের ঔষধ, সুগন্ধী, প্রসাধন এবং রাসায়নিক দ্রব্যাদির উৎপাদন ব্যবস্থা শুধু নয়, তাদের নামকরণ, বিজ্ঞাপন রচনা ইত্যাদি থেকে বিবিধ যান্ত্রিক কর্ম, পরিকল্পনা, নতুন নতুন বিভাগ স্থাপন, এমন কি গৃহনির্মাণাদির প্রকল্পও করতেন রাজশেখর। প্রস্তুত বাড়ি ও বিভাগে কোন্ যন্ত্র কিভাবে স্থাপন করা হবে, কি কি আসবাবপত্রের কোথায় প্রয়োজন ইত্যাদির নকসা পর্যন্ত পূর্বাহ্ণেই করে রাখতেন। উৎপন্ন নানা বস্তুর আবরণীর জন্যে অলঙ্করণ ও চিত্রাদির জন্যে নির্দেশও দিতেন শিল্পীকে। পণ্য প্রচারের উদ্দেশ্যে সংবাদপত্রাদিতে বিজ্ঞাপন, সুদৃশ্য ক্যালেণ্ডার মুদ্রণ সবই তার সযত্ন ব্যবস্থাপনায় থাকত। বাংলা দেশে

প্রচার-শিল্পের একজন প্রবর্তক রূপেও গণ্য করা যায় তাঁকে।

কিন্তু এহ বাহ্য। বেঙ্গল কেমিক্যাল এ্যাণ্ড ফার্মাসিটিউক্যাল ওয়ার্কসে তাঁর সর্বময় সফল পরিচালনায় অর্থাৎ প্রশাসক-সংগঠক রাজশেখরের পরিচয় দান নিবন্ধের লক্ষ্য নয়। এখানে অনুধাবন ও অনুশীলনের বিষয় তাঁর বহুবিচিত্র সত্তা। তাঁর উল্লেখিত কর্মজীবনে যেমন নানা গুণের প্রকাশ, তেমনি তাঁর সাংস্কৃতিক মানসও বৈচিত্র্যময় রূপে প্রকটিত। অথচ, ঢক্কানিনাদে আত্মবিজ্ঞপ্তির এই যুগে, নিজে প্রচার-বিশারদ হয়েও তিনি ছিলেন স্ব-বিজ্ঞাপনে বিমুখ। সেজন্যই নেপথ্যচারী। তাঁর অন্তরঙ্গ জীবনের বিবরণ দানও তাই প্রায় নেপথ্যে দর্শনই হবে।

যে সাহিত্য জগতে প্রথম পদার্পণেই রাজশেখর অতিশয় যশ ও সম্মানে ভূষিত হন সেখানেও তিনি অন্তরালবাসী। সভা সমিতি, সম্বর্ধনা ইত্যাদির আড়ম্বর ও আকর্ষণ থেকে মুক্ত। বিদ্যাচর্চায় মগ্ন নিভৃতচারী জ্ঞান-তাপস। তাই তাঁর সাহিত্যিক সত্তার বার্তা, তাঁর সাহিত্য জীবনের উৎস-কথা এবং অন্তরসংবাদ পাঠকবর্গের কাছে অবিদিত আছে।

রাজশেখরের পরিচয়-কথায় প্রথমে উল্লেখ্য তাঁর সাহিত্য রচনার প্রসঙ্গ। তাঁর রসসাহিত্য রচনার প্রথম প্রেরণা ও আদর্শের কথা। তাঁর আকস্মিক সাহিত্যসৃষ্টির অপ্রকাশিত কাহিনী।

রাজশেখরের প্রথম সার্থক রচনা হিসাবে 'শ্রীশ্রীসিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড'-ই গণ্য হয়ে থাকে। তিনি নিজেও আগেকার সাহিত্যকর্মের মধ্যে উল্লেখনীয় কিছু মনে করতেন না। কিন্তু তাঁর সাহিত্যচর্চা আরম্ভ হয়েছিল কিশোর বয়সেই, যদিও

তাতে ছেদ পড়ে কলেজের ছাত্রজীবনে। 'সন্ধ্যেবেলায় প্রদীপ জ্বালাবার আগে সকালবেলায় সলতে পাকানো।' কৈশোরে তাঁর সেই সব রচনার বেশীর ভাগই ছিল কবিতা বা পদ্য। কিছু গল্প ইত্যাদি গদ্যও তিনি সেই বয়সে লিখেছিলেন। তাঁর বাল্যরচনাগুলি লিখিত হত তাঁদের পারিবারিক সাহিত্যচর্চার খাতায়। তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শশিশেখরের পত্নীর কাছে দেবরের রচনাবলী সংগৃহীত থাকত। রাজশেখরের মৃত্যুর পর তাঁর কৈশোরের সাহিত্যচর্চার এই প্রসঙ্গ জানান শশিশেখর বসু, 'যা দেখেছি যা শুনেছি' নামে সরস পুস্তকটির লেখক। রাজ-শেখরের সেই প্রথম বয়সের রচনা প্রায় সবই লুপ্ত হয়ে যায়। তার ক'টি মাত্র প্রকাশ হয় বহুকাল পরে, রাজশেখরের মৃত্যুরও পরে, 'পরশুরামের কবিতা'-য়।

পরিণত বয়সী রাজশেখরের প্রথম রসরচনা সৃষ্টি—'শ্রীশ্রী সিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড'। 'ভারতবর্ষ' মাসিকে এটি প্রকাশের সঙ্গেই বাংলার সাহিত্যক্ষেত্রে আলোড়ন জাগে। সূক্ষ্ম-দৃষ্টি বোদ্ধা থেকে সাধারণ পাঠককে পর্যন্ত চমৎকৃত করে গল্পটি। বাংলা সাহিত্যে সম্পূর্ণ নতুন স্বাদ ও শক্তির দানকে সকলে সাদরে বরণ করে নেন। লেখকের বয়স তখন ৪২ বছর এবং লেখনী-নাম পরশুরাম।

তীব্র ব্যঙ্গ-শ্লেষাত্মক এই রচনার উপলক্ষ্যও বলবার মতন। এমন স্মরণীয় সাহিত্যসৃষ্টির কারণ স্বরূপ একটি গুরুতর ঘটনা বেঙ্গল কেমিক্যাল প্রতিষ্ঠানেই ঘটেছিল। রাজশেখর সেই অভিজ্ঞতারই নব রূপায়ণ করেন গল্পটিতে। ঘটনাটি যদি তিনি প্রত্যক্ষ না করতেন হয়ত এভাবে তাঁর সাহিত্য জীবনের উদ্বোধন হত না।

যে বয়সে তাঁর রসসাহিত্য রচনার সূচনা তার উদাহরণও ক্বচিৎ দৃষ্ট। প্রথম লেখাতেই এমন পরিপক্ক হাতের চরিত্র চিত্রণও দুর্লভ। রাজশেখরের প্রখর বিবেকবান চিত্তে উপলক্ষ্যটি গভীর রেখাপাত করার ফলেই সম্ভবত গল্পটি এত জীবন্ত ও সার্থক হয়ে ওঠে।

'শ্রীশ্রীসিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড' তিনি লেখেন ১৯২২সালে। তার কিছুদিন আগেই বেঙ্গল কেমিক্যালের জীবনে একটি ঘোরতর সঙ্কট এসেছিল। বিপন্ন হয়ে উঠেছিল তার স্বাধীন অস্তিত্ব। রাজশেখর তখন তার সংগঠন ও উৎপাদনের সমস্ত কাজেই আত্মনিয়োগ করেছিলেন। কেবল তার শেয়ার সংক্রান্ত বিষয়টি ছিল আচার্যের ব্যবস্থায়।

আদর্শবাদী প্রফুল্লচন্দ্র তাঁর দেশসেবার স্বপ্ন থেকে এই প্রতিষ্ঠানের পত্তন করেন। স্বদেশী শিল্প ব্যবসায় গড়ে তুলতে হবে বাংলায়। দেশের অর্থ বিদেশে না গিয়ে দেশেই থাকবে। অন্নসংস্থান হবে বঙ্গ সন্তানদের। বিলাতী ঔষধ, রাসায়নিক, প্রসাধন দ্রব্যাদি আমদানী রহিত করে জাতীয় যন্ত্রশিল্পে সে সব উৎপন্ন হবে। এমনি মহান আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে বেঙ্গল কেমিক্যাল স্থাপন করেন বিজ্ঞানাচার্য। সেই লক্ষ্য রেখে তার উন্নতি ও সম্প্রসারণের জন্যে মূলধন সংগ্রহ করতে থাকেন। পাবলিক লিমিটেড কোম্পানী সংস্থার শ্রীবৃদ্ধির উপায় হিসাবে তৎপর হন শেয়ার বিক্রয়ে।

আশাপ্রদভাবে শেয়ার বিক্রীত হতে লাগল। বাংলার নিজস্ব প্রতিষ্ঠানটির উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কল্পনা করে উৎসাহিত হলেন সরল দেশহিতব্রত প্রফুল্লচন্দ্র। কিন্তু একটি কুটিল বাস্তবের বিষয়ে তাঁর কোন ধারণাই ছিল না। যত্রতত্র শেয়ার বিক্রয়ের

অন্তরালে কি বিষাক্ত কীট প্রবেশ করেছে তাঁর সাধের বেঙ্গল কেমিক্যালের অঙ্গে! তিনি আদৌ লক্ষ্য করেননি, শতকরা পঞ্চাশেরও অধিক শেয়ার এক অসৎ বিত্তশালী অবাঙ্গালীর হস্তগত হয়ে পড়েছে। কোম্পানী আইন-বলে সেই ব্যক্তি এখন প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার হবার অধিকারী। ধূর্ততা এবং দুর্নীতির জন্যে কুখ্যাত এক বণিকগোষ্ঠীর তিনি অন্যতম ধুরন্ধর।

অকস্মাৎ বেঙ্গল কেমিক্যালের বিপর্যস্ত অবস্থার বিষয় কর্তৃপক্ষ জানতে পারলেন। সেই মারো-কড়ি সম্প্রদায়ের রত্নটি ইচ্ছা করলেই ছিনিয়ে নিতে পারেন সর্বময় কর্তৃত্ব। বিপদের গুরুত্ব বোঝা গেলেও অবস্থা তখন আয়ত্তের বাইরে। আইন-বিদ্‌দের পরামর্শ নেওয়া হতে লাগল।

এমন সময়—হয়ত আচার্যের পুণ্যে—সেই 'লুটবিহারী' চালে সাংঘাতিক ভুল করে ফেলেন। হয়ত প্রমাদও নয়। আরো কড়ি লুঠের লোভে বেচাল হয়ে তাঁর শেয়ারের অংশ বিক্রয় করেন জাপানী এক জাহাজ প্রতিষ্ঠানকে। কিন্তু সংস্থার অজ্ঞাতে এ-ভাবে শেয়ার বিক্রয় বে-আইনী। দুর্যোগের ঘন মেঘের ফাঁকে এই আশার বিদ্যুৎঝলক কর্তৃপক্ষ দেখতে পেলেন। অর্থাৎ দেখালেন তাঁদের পক্ষীয় আইনবেত্তারা।

বিষয় নিষ্পত্তির জন্যে হাইকোর্টে মোকদ্দমা রুজু হল। কর্তৃপক্ষ অভিযোগ আনলেন মারো-কড়ি পুঙ্গবের বিরুদ্ধে। ব্যারিস্টারপ্রবর স্যার নৃপেন্দ্রনাথ সরকার প্রতিষ্ঠানের পক্ষে অবতীর্ণ হলেন। এই মামলা প্রসঙ্গে রাজশেখরের ভূমিকার কথা উল্লেখ করা হবে পরে। এখানে বক্তব্য যে, অনেকদিনের অনেক কাণ্ডের পর বেঙ্গল কেমিক্যাল জয়লাভ করে।

মোকদ্দমা সমাপ্তির কিছুদিন পরেই রাজশেখর লেখেন

'শ্রীশ্রীসিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড'। ওই নাটকীয় ঘটনাবলীর শয়তান (villain of the piece) চরিত্রটি মানসপটে রেখেই তিনি গণ্ডেরিরাম বাটপাড়িয়াকে চিত্রিত করেন। গণ্ডেরিরামের মতন তাঁর নামের প্রথম অংশেও 'রাম' বিদ্যমান। গ আদ্য অক্ষরটিও ছিল মডেলটির পদবীতে। সে ব্যক্তির অবয়ব, নাসিকা, কাপড় পরবার ধরন ইত্যাদি গণ্ডেরিরামের প্রতিকৃতিতে কেমন প্রতিফলিত হয়েছে, সেকথা রাজশেখরের চিত্রাঙ্কন প্রসঙ্গে বর্ণনা করা হবে।

এক অসৎ, স্বার্থসর্বস্ব ব্যক্তি যে জাতীয় প্রতিষ্ঠানটিকে গ্রাস করতে উদ্যত হয়েছিলেন এই গভীর বেদনা জাগে রাজশেখরের হৃদয়ে। তারই মর্মজ্বালায় জন্ম নেয় 'শ্রীশ্রীসিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড'। রাজশেখর সে অর্থ-শিকারীটিকে সশরীরে উপস্থাপিত করেন। গল্পের সূত্র যোজনা হয় তাকে সরাসরি বাটপাড়িয়া নামে অভিহিত করে। গল্পটির অন্যান্য চরিত্র এই অর্থে কাল্পনিক যে তারা এমন কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তির আদর্শে গঠিত হয়নি।

শ্রীশ্রীসিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড-এর নায়ক অবশ্য গণ্ডেরিরাম বাটপাড়িয়া নয়। শ্যামানন্দ ব্রহ্মচারী। মনে হয়, বিচক্ষণ রাজশেখর এই 'ব্রহ্মচারী এণ্ড ব্রাদার-ইন্-ল'র পরিচালক অসাধু বাঙ্গালী ব্যবসায়ীকে আমদানী করেছেন ভারসাম্য বা নিরপেক্ষতা রাখতে। একদেশদর্শী প্রাদেশিক বিদ্বেষ যেন রচনায় ফুটে না ওঠে, এই উদ্দেশ্যেই হয়ত শ্যামানন্দ ব্রহ্মচারীকে সামনে রেখেছেন। কিন্তু পার্শ্বচরিত্র গণ্ডেরিরামই সবচেয়ে সজীব হয়ে আছে গল্পের মধ্যে। ভেজাল ঘিয়ের কারবারে পাপ হবার কথায় যে বিবেকহীন সাফাই গায়—

'পাঁপ? হামার কেনে পাঁপ হোবে? বেবসা তো করে কাসেম আলি। হামি রহি কল্‌কাত্তা, ঘিউ বনে হাথরাস মে‌া- হামি না আঁখ্‌সে দেখি, না নাকসে শুংখি—হনুমানজী কিরিয়া। হামি ত সির্ফ মহাজন আছি—রূপয়া দে কর্‌ খালাস। সুদ লি, মুন্‌ফার আধা হিসাব ভি লি। যদি হামি টাকা না দি, কাসিম আলি দুসরা ধনীসে লিবে। পাঁপ হোবে তো শালা কাসিম আলিকা হোবে। হামার কি?' এমন জীবন্ত সংলাপও বেশী নেই গল্পটিতে!

সেসময় রাজশেখর বেঙ্গল কেমিক্যালের সংলগ্ন কোয়া- র্টারে থাকতেন। ১৪, পার্শিবাগান লেনের বাড়িতে আসতেন সপ্তার শেষে।

মানিকতলার সেই কোয়ার্টারে দোতলার ঘর। তার সামনেকার ছাদে রাজশেখর একদিন যতীন্দ্রকুমারকে বল্‌লেন, 'যতীন, একটা গল্প লিখে ফেলেছি।'

তাঁর আকৈশোর সুহৃদ, চিত্রশিল্পী যতীন্দ্রকুমার সেন। সেটি শুনতে চাইলে, রাজশেখর পড়ে শোনালেন 'শ্রীশ্রীসিদ্ধে- শ্বরী লিমিটেড।' যতীন্দ্রকুমার সেসময় শুধু চিত্রকর নন, কয়েকটি হাস্যরসের গল্পেরও রচনাকার। 'মানসী ও মর্মবাণী' প্রভৃতি পত্রিকায় তা প্রকাশিত হয়েছিল তাঁর স্বরচিত ছবির সঙ্গে। রাজশেখরের অভিনব রচনা শুনে মুগ্ধ হয়ে তিনি বললেন, 'আমি এর ছবি আঁকব।'

রাজশেখর জানালেন, 'বেশ, তা এঁকো। কিন্তু আমার এ বিষয়ে কিছু করা আছে। তোমায় দেখাব।'

পার্শিবাগানের বাড়িতে তাঁদের উৎকেন্দ্র সমিতির আসর বসত সেসময়। রাজশেখর গল্পটি সমিতিতেও শোনালেন।

সেই উৎকেন্দ্র সমিতির কেন্দ্রে ছিলেন যতীন্দ্রকুমার এবং গিরীন্দ্রশেখর বসু, রাজশেখরের কনিষ্ঠ ভ্রাতা, মনস্বী লেখক ও চিকিৎসক। রাজশেখরেরই দেওয়া ইংরেজী নাম থেকে গিরীন্দ্র-শেখর সমিতির নামকরণটি করেছিলেন। সেখানে সমাগত হতেন সে যুগের বাংলার নানা সাহিত্যিক, বিজ্ঞানী, অধ্যাপক, চিত্রকর, ঐতিহাসিক প্রভৃতি সাংস্কৃতিক জগতের কৃতী পুরুষ। গল্প এবং চা সহযোগে মনস্তত্ত্ব, কাস্তকলা, ইতিহাস, পুরাণ, কাব্য, নাটক, সাহিত্য প্রভৃতি বিষয়ের পাঠ আলোচনাদি চল্‌ত। সবচেয়ে চিত্তাকর্ষক হত সেখানকার রবিবাসরীয় মজলিস। সমিতিতে নিয়মিত বা মাঝে মাঝে উপস্থিত হতেন যদুনাথ সরকার, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, যোগেশচন্দ্র রায়, প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায়, জলধর সেন, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় (গল্পলেখক), বিরজাশঙ্কর গুহ, সুহৃদচন্দ্র মিত্র, রঙ্গীন হালদার, শৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা প্রমুখ।

সমিতির আসরে যখন শ্রীশ্রীসিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড পড়া হল, বিদ্বান শ্রোতারা পুলকিত এবং চমকিত বোধ করলেন। 'ভারতবর্ষ' সম্পাদক জলধর সেন গল্পটি আদায় করে নিয়ে গেলেন তাঁর পত্রিকার জন্যে। ভারতবর্ষে প্রকাশিত হতেই সাহিত্যজগতে সাড়া পড়ে গেল।

তারপর থেকেই একটির পর একটি উৎসারিত হতে লাগল রাজশেখরের রসরচনা। ভারতবর্ষের পক্ষে জলধর সেন এবং প্রবাসীর পক্ষ থেকে কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় সে-সব সংগ্রহ করে পত্রিকা দুটিতে প্রকাশ করতে লাগলেন। পরে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হল তাঁর স্মরণীয় দান : গড্ডলিকা,

কজ্জলী, হনুমানের স্বপ্ন ইত্যাদি।

গড্ডলিকা পুস্তক প্রকাশের সঙ্গে বাংলা সাহিত্যে তিনি যে চমক সৃষ্টি করেন তার উপযুক্ত বর্ণনা পাওয়া যায় রবীন্দ্রনাথের অভিনন্দন বাণীতে—'সকালে হঠাৎ ঘুম ভাঙ্গিয়া যদি দ্বারের কাছে দেখি একটা উইয়ের ঢিবি, আশ্চর্য হই না, কিন্তু যদি দেখি মস্ত একটা বটগাছ তবে সেটাকে কি ঠাউরাইব ভাবিয়া উঠা যায় না।' যে তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ শক্তি, স্বকীয় সৃজনী প্রতিভা, মানুষের চরিত্রে গভীর অন্তর্দৃষ্টি এবং রসনির্ঝর চিত্ত এতদিন ছিল লোকচক্ষুর অন্তরালে, তা উদ্বুদ্ধ হল আত্মপ্রকাশে। সাহিত্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে তাঁর বিশিষ্ট মানসিকতার রূপ তাঁর পরিকল্পিত ছদ্মনামে পরিস্ফুট ছিল। পরশুরাম নয়। এ নাম তাঁদের পারিবারিক স্বর্ণকারের। হাতের কাছে পেয়ে তাৎক্ষণিক ব্যবহার করেন বিনা চিন্তায়। কিন্তু যে লেখনী-নামটি তিনি ভেবে স্থির করেছিলেন, তা হল —উপরিচর বসু। উর্ধ্বলোক থেকে সংসার রঙ্গশালার বিচিত্র জীবগুলিকে পর্যবেক্ষণ করা এবং নির্বিকার নাটকীয় মনে তাদের অবলম্বনে রসসাহিত্য রচনা। রাজশেখরের সাহিত্য-মানসের ব্যাখ্যাকারী উপরিচর নামটি তিনি শেষপর্যন্ত ব্যবহার করেননি।

গণ্ডেরিরাম বাটপাড়িয়া যেমন বাস্তবের ছাঁচে গড়া, তেমনি আরো কিছু গঠিত চরিত্র ছড়িয়ে আছে তাঁর বিভিন্ন গল্পে। যেমন 'বিরিঞ্চিবাবা'র প্রফেসর ননী। বেঙ্গল কেমিক্যালেরই এক রাসায়নিক ছিলেন অমনি নানা অদ্ভুত প্রয়োগের বাতিকগ্রস্ত। 'চিকিৎসা সঙ্কট'-এর নেপাল ডাক্তার তেমনি এক হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকের সাহিত্য সংস্করণ।

রাজশেখরের বালক বয়সে একবার অসুখের সময় ঐ রকম একজন হোমিওপ্যাথ তাঁর চিকিৎসা করেছিলেন। তিনি কথা বলতেন নেপাল ডাক্তারের মতন ধমক দিয়ে দিয়ে। 'আমার তামাকে সালফার থার্টি মেশানো থাকে'-এটি তাঁর মৌখিক বাক্য। তারিণী কবিরাজও রাজশেখরের দেখা জনৈক কবিরাজ, হাতল-ভাঙা চেয়ারে বসে তামাকু সেবন করতেন। 'হয়, Zান্তি পার না' কথাটি উৎকেন্দ্র সমিতির এক রসিক ব্যক্তির উচ্চারিত। কবিরাজের জবানীতে প্রযুক্ত হয়েছে গল্পে। এক হেকিমী চিকিৎসককেও তিনি দেখেছিলেন ট্রেনের কামরায়। তাঁরও দাড়ি তিনরঙা ছিল। এমনিভাবে সংসারের রঙ্গশালা থেকে একেকটি টাইপ চরিত্র নির্বাচন করে তিনি সাজিয়েছিলেন রসচিত্রের এ্যালবামে।

রাজশেখরের চিত্রাঙ্কন প্রসঙ্গেও এমনি আনুষঙ্গিক তথ্য পাওয়া যায়। তাঁর ছবি আঁকার হাতও আবাল্য। পরিণত বয়সে তিনি ভালবাসতেন বিশেষ বিশেষ টাইপ মানুষের নক্সা আঁকতে। স্কুলের ছাত্রজীবনে তিনি ছিলেন দ্বারবঙ্গ নিবাসী। পিতা চন্দ্রশেখর বসু সেসময় রাজ্যের দেওয়ান বা জেনারেল ম্যানেজার। সেখানে তাঁরা বাস করতেন যে পুরানা স্টেশন নামক স্থানে, তার বাড়িতে রাজশেখরের ১৩/১৪ বছর বয়সের আঁকা ছবির নিদর্শন দেখা যেত। পাখি, গাছপালা ইত্যাদির রঙীন চিত্র। তার মধ্যে কোন কোনটি টাঙানো থাকত বাড়ির দেওয়ালেও। শিল্পীর বয়সের বিচারে ত বটেই, ছবি হিসেবেও সেসব নিন্দনীয় ছিল না, যতীন্দ্রকুমার সেনের এই ধারণা।

বালক বয়সের পরে কলেজের ছাত্রজীবনেও রাজশেখর

অঙ্কন-চর্চা বেশ করেছিলেন। এই সময় জানা যায় তাঁর নানা নিসর্গ চিত্র আঁকবার কথা। লণ্ডনে রয়াল এ্যাকাডেমির প্রেসিডেণ্ট স্যার ই. জে. পয়েলনার প্রণীত চিত্রাঙ্কন শিক্ষার ৪ খণ্ড পুস্তক Landscape painting in water colour অনু-সরণ করে তিনি অনুশীলন করতেন। রঙ্ ব্যবহারেরও নির্দেশ দেওয়া ছিল এই গ্রন্থাবলীতে। প্রত্যেক পাতার বাম পৃষ্ঠায় রঙ-করা ছবি আর দক্ষিণে তার বহিঃরেখা (Outline), শূন্যস্থান পূরণ করবার জন্য রেখে। রীভ্সের বাকসের রঙে রাজশেখর সেই নির্দেশ অনুসারে রঙ ব্যবহারের অভ্যাস করতেন। স্বাধীনভাবেও আঁকতেন ছবি।

তার অনেককাল পরে তাঁর মধ্য বয়সে এ বিদ্যা আবার নতুন করে প্রকাশ পায়। প্রথম গল্প সম্পর্কে যতীন্দ্রকুমারকে যে রাজশেখর বলেছিলেন, 'আমার এ বিষয়ে কিছু করা আছে —' তারপর দেখিয়েছিলেন স্বহস্তে আঁকা আসল গণ্ডেরিরামের পেনসিল স্কেচ। হাইকোর্টে মামলা চলাকালীন সে ব্যক্তি যখন কাঠগড়ায় দাঁড়াতেন রাজশেখর তাঁর একাধিক প্রতিকৃতি পেনসিলে করে নেন। তাঁর আঁকা সেইসব নক্সা অবলম্বনে ছবি ড্রয়িং করেন যতীন্দ্রকুমার। তারপর গল্পের সঙ্গে প্রকাশিত হয়ে তা খ্যাতিলাভ করেছিল। সেই 'কুছভি নেহি', 'ঐসি গতি সন্সারমে' ইত্যাদি নকসায় গণ্ডেরিরামের যে মূর্তি দেখা যায় তা আসল মানুষেরই প্রতিকৃতি। সেই পাগড়ি-শোভন মুখাবয়ব, এমন কি কোঁচাটি ভাঁজ করে কাপড় পরবার ধরন পর্যন্ত অবিকল। সেই আসল বাটপাড়িয়া পরে বৃটিশ সরকারের 'স্যার' খেতাব অর্জন করেছিলেন। উত্তর কলকাতার বাণিজ্য অঞ্চলের একটি মুখরিত পথ আজো তাঁর

নামের স্মৃতিরক্ষা করছে সগৌরবে, একথাও প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায়।

যাই হোক, চিত্রী রাজশেখর তাঁর অনেক গল্পের চরিত্র নিজে প্রথমে নক্সা করতেন। তাই থেকে ড্রইং ও ফিনিশ করেন যতীন্দ্রকুমার। যেমন— 'ভূশণ্ডীর মাঠে'-র 'লজ্জায় জিভ কাটিয়াছিল,' 'গোবর গোলা জল ছড়াইয়া যায়', 'খেজুরের ডাল দিয়া রোয়াক ঝাঁট দিতেছিল', 'সড়াক করিয়া নামিয়া আসিল', 'সব বন্ধকী তমস্সুক দাদা' ইত্যাদি ছবির প্রথম নক্‌সা রাজশেখরের। 'শ্রীশ্রীসিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড'-এর অন্যান্য চরিত্র শ্যামানন্দ ব্রহ্মচারী, তিনকড়ি, অটল প্রভৃতির প্রথম স্কেচও লেখক কৃত। তিনকড়ি হলেন চিকিৎসক গিরীন্দ্রশেখরের একজন ডায়াবেটিক রোগী। 'মহেশের মহাযাত্রা'-র পেনসিল নকসাও তাঁর কায। 'প্রেমচক্রে'র সমস্ত ছবিও তিনি প্রথম আঁকেন। 'লম্বকর্ণ' গল্পের ক্ষীণকায় পাগড়িসর্বস্ব চুকন্দর সিং-এর 'হজৌর' চিত্রটি রাজশেখরের বাল্যে দেখা এক দারোয়ানের রূপ। স্মৃতি থেকে তিনি নক্‌সা করে যতীন্দ্রকুমারকে দেখান। পূর্বোক্ত সব ছবির মতন এটিও তিনি ড্রয়িং ও সম্পূর্ণ করেন রাজশেখরের আঁকা স্কেচ থেকে।

তাছাড়া, 'ধুস্তুরি মায়া', 'গড্ডলিকা', 'রামায়ণ', 'মহাভারত' প্রভৃতি স্বরচিত পুস্তকের প্রচ্ছদ অঙ্কনও রাজশেখরের। পিতা চন্দ্রশেখরের একটি পেন্‌সিল স্কেচ তিনি যে করেছিলেন, যতীন্দ্রকুমারের মতে তা একটি উৎকৃষ্ট শিল্পকর্ম।

অনেক ছবির ভাব (idea) ও দৃষ্টান্ত তিনি যতীন্দ্রকুমারকে বাস্তব উপাদান থেকে দেখিয়ে দিতেন, এমন শিল্পীর চোখ

তাঁর ছিল। সেনমশায় ড্রয়িং করতেন সেই অনুসারে। যথা—'চিকিৎসা সঙ্কটে'র এ্যালোপ্যাথ চিকিৎসক, হেকিম, কবিরাজ এবং বিপুলা মল্লিক। মিস বিপুলার মডেলটি ছিলেন পার্শিবাগান বাড়ির নিকটে এক বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা। ঈষৎ স্থূলাঙ্গিণী মহিলাটির প্রবল ব্যক্তিত্ব-ব্যঞ্জক হাবভাব দোতলার বারান্দা থেকে লক্ষ্য করতেন। সেই রকম আঁকতে বলেন যতীন্দ্রকুমারকে।

'কচি সংসদে'র কয়েকটি কচি তাঁর দেখা চরিত্র—যতীন্দ্রকুমার আঁকবার সময় তাদের বর্ণনা করতেন। নকুড় মামার মতন একটি লোককে একবার দার্জিলিঙে থাকতে শীতের রাতে প্রায়ই দেখতেন ছাতা মাথায় দিয়ে যেতে। 'জাবালি'র আদর্শও পার্শিবাগান ষ্ট্রীট দিয়ে যাতায়াতকারী শ্মশ্রুগুম্ফ সমাকীর্ণ জনৈক ব্রাহ্ম অধ্যাপক। যতীন্দ্রকুমারকে 'স্বয়ংবরা'র কেদার চাটুজ্যে আঁকবার সময় রাস্তার একটি লোককে দেখিয়ে বলেছিলেন—'ওইরকম খোঁচা খোঁচা দাড়ি আধবুড়ো লোকের ছবি কোরো।'

এইভাবে তার অনেক গল্পের চরিত্র-নক্সা বাস্তব জীবন থেকে নেওয়া। যথার্থ শিল্পীর চোখ ছিল রাজশেখরের। কারুর অবয়বে কিংবা ভাবভঙ্গিতে কোন অনন্য বৈশিষ্ট্য দেখলেই আকৃষ্ট হতেন। হয় নিজে তার নক্সা আঁকতেন, নচেৎ যতীন্দ্রকুমারকে স্কেচ করতে বলতেন। পার্শিবাগানের বাড়ীর দীর্ঘ বারান্দায় অবসরকালে বসে বসে রাস্তার লোকদের ওপর দৃষ্টিপাত করতেন। টাইপ নির্বাচন ও সংগ্রহ হয়ে যেত সঙ্গে সঙ্গে।

বেঙ্গল কেমিক্যালের বিজ্ঞাপন, প্রচার ইত্যাদির কাজেও

শিল্পী রাজশেখরের পরিচয় প্রকাশ পেত। অনেক লেবল্, বিজ্ঞাপনের নানা পরিকল্পনা তিনি করতেন। আঁকতেন অবশ্য যতীন্দ্রকুমার। তাঁকে বিজ্ঞাপন ইত্যাদি প্রচারশিল্পের কাজের একজন শিক্ষাদাতাও বলা যায়। কমার্সিয়াল আর্টের প্রখ্যাত শিল্পী যতীন্দ্রকুমার সেন এ বিষয়ে রাজশেখরের কাছে ঋণের কথা সানন্দচিত্তে স্মরণ করেন। যতীন্দ্রকুমারকে তিনি যখন প্রথম বেঙ্গল কেমিক্যালে বিজ্ঞাপন ইত্যাদির ছবি আঁকবার কাজ দিয়েছিলেন, সেন মহাশয়ের তখন সে সম্পর্কে বিশেষ অভিজ্ঞতা ছিল না। বিশেষত অক্ষর লেখা, যা এই শিল্পে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং কঠিন কাজ। রাজশেখরই তখন তাঁকে অক্ষর লেখা, লেবল্ আঁকা প্রভৃতি বিষয়ে বিশেষজ্ঞের নির্দেশ দিতেন। যতীন্দ্রকুমারের তুল্য সুনিপুণ শিল্পী সেজন্যে তাঁকে মান্য করেন গুরু বলে। রাজশেখরের হাতের অক্ষর রচনার নিদর্শন বেঙ্গল কেমিক্যালের প্রথম যুগের কোন কোন লেবলে সেই সূত্রে দেখতে পাওয়া যেত।

ছবির প্রসঙ্গে আরেকটি তথ্য জ্ঞাতব্য। 'কচি সংসদে'র কথক কেষ্ট-পদ্মের সাক্ষাৎকারের বিচারক ব্যক্তিটির এবং 'লম্বকর্ণ' গল্পের রায় বাহাদুর বংশলোচনের চিত্র স্বয়ং রাজশেখরের। এ ছবির প্রথম স্কেচ অবশ্য তাঁর নয়, পুরোপুরি যতীন্দ্রকুমারের কাজ। রসস্রষ্টার প্রতিকৃতিও অমর করে রাখবার জন্যে শিল্পীর এই সশ্রদ্ধ ও সার্থক প্রয়াস। আরো একটি কথাও প্রসঙ্গত বলা উচিত। 'কচি সংসদে'র উক্ত কথক মহাশয়ের পত্নীর চিত্রটি—যাঁর 'হোয়াট হোয়াট হোয়াট' নামে একটি ছবি আছে গল্পের মধ্যে—রাজশেখরেরই সহধর্মিণীর। শিল্পী যতীন্দ্রকুমার সস্ত্রীক রাজশেখরের চিত্র

চিরজীবী রেখেছেন গল্পের সঙ্গে।

চিত্রশিল্পীরূপে রাজশেখরের আর কোন পরিচয় তাঁর কন্যার অকাল মৃত্যুর পর থেকে পাওয়া যায় না। তিনি ছবি আঁকা একেবারে বন্ধ করে দিয়েছিলেন একমাত্র কন্যাকে হারিয়ে।

শুধু কর্মজীবনেই যে রাজশেখর বিজ্ঞানী ছিলেন, তা নয়। কলেজ জীবন থেকেই তিনি বিজ্ঞানের ছাত্র। তাঁদের কালে এম. এস-সি. ডিগ্রী ছিল না। তিনি এম. এ. পাশ করেছিলেন বিজ্ঞানের ছাত্ররূপে। রসায়ন শাস্ত্রে সেই উচ্চতম পরীক্ষায় তিনি প্রথম হয়েছিলেন। তার আগে বি. এ. তেও তাঁর পাঠ্যবিষয়ে রসায়ন ও পদার্থবিদ্যা ছিল এবং দু'টিতেই অনার্স পেয়ে বি. এ. পাশ করেন তিনি।

বেঙ্গল কেমিক্যালের কর্মজীবনেই রাজশেখরের বিজ্ঞানীরূপে শ্রেষ্ঠ পরিচয় প্রকাশ পায়। সেখানকার ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসনিক নানা কাজ যোগ্যতার সঙ্গে সম্পাদন করলেও আসলে তিনি technical man রাসায়নিক বিজ্ঞানী।

ছাত্রজীবনে রসায়ন চর্চায় অভিজ্ঞতার জন্যে তিনি বেঙ্গল কেমিক্যালের কাজে যোগ্য বলে বিবেচিত হন। রাসায়নিক বলেই তাঁকে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের সঙ্গে পরিচিত করিয়ে দেন ডাক্তার কার্তিকচন্দ্র বসু। সেই হিসাবেই তিনি বেঙ্গল কেমিক্যালের কর্ম গ্রহণ করেন। এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে রাজশেখরের যোগাযোগের কথা উঠত না· তিনি বিজ্ঞানের ছাত্র ও সেবক না হলে।

সুদীর্ঘকাল ধরে বেঙ্গল কেমিক্যাল এণ্ড ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কসে বিজ্ঞানের ব্যবহারিক ও ব্যাপারিক সাফল্য বিজ্ঞানী

রাজশেখরের চূড়ান্ত কৃতিত্ব। এখানকার কর্মে আত্মনিমগ্ন থাকবার সময় তিনি 'গড্ডলিকা' ইত্যাদি রচনার জন্যে অসামান্য যশ ও রবীন্দ্রনাথের অভিনন্দন অর্জন করেন। তখন প্রফুল্লচন্দ্র ভীত হয়েছিলেন যে, রাজশেখর হয়ত বিজ্ঞানের ক্ষেত্র ত্যাগ করে সাহিত্য-মার্গের পথিক হবেন।

কিন্তু এই দুই প্রশ্নে কোন বিবাদ তাঁর জীবনে বাধেনি। এ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ ও প্রফুল্লচন্দ্রের পত্র বিনিময় আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। দু'টি বিভিন্ন মানস ও সাধনের চমৎকার সমন্বয় রাজশেখর করে নিয়েছিলেন তাঁর অপূর্ব প্রতিভায়। বহিরঙ্গ জীবনে ব্যবহারিক বিজ্ঞান এবং অন্তরঙ্গ জীবনে সাহিত্যচর্চা। তাঁর বিরাট প্রতিভার উভয়মুখী সৃষ্টিধারায় প্রফুল্লচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ উভয়েই আশ্বস্ত হয়েছিলেন মনে হয়। অন্তত তাঁদের নিরাশ করেননি রাজশেখর।

বিস্তারিত রবীন্দ্র-জীবনী রচনাকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় তাঁর 'শান্তিনিকেতন বিশ্বভারতী' গ্রন্থে প্রকাশ করেছেন যে, রাজশেখরকে শান্তিনিকেতনে সংযুক্ত করার ইচ্ছা একসময়ে রবীন্দ্রনাথের হয়েছিল।...

কলকাতায় অমল হোমের বাসস্থলে ১৯২৬ সালের প্রথম দিকে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ হয়েছিল রাজশেখরের। তার পরের দিন রবীন্দ্রনাথ অমল হোমকে পত্রে লেখেন, 'কল্যাণীয়েষু অমল, কাল তোমার ওখানে রাজশেখরবাবুর সঙ্গে কথা বলে ভারি খুশি হয়ে এসেছি। ওঁর হাতে কুঠার আছে কিনা জানিনা কিন্তু ওঁর অন্তরে আছে পাবক যা নিঃশেষ করে চিত্তবুদ্ধির আবর্জনা। উনি সহজ করে সব জানেন—সহজ করে সব বলতে পারেন। ওঁকে একবার শান্তিনিকেতনে

নিয়ে আসবার ভার রইলো তোমার উপর।'

সে যা হোক, বেঙ্গল কেমিক্যাল ভিন্নও রাজশেখরের বিজ্ঞানচর্চার আরো কিছু ফলিত নিদর্শন আছে, যা থেকে তাঁর ব্যবহারিক বিজ্ঞানে পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি হাতে-কলমে যে ক'টি জিনিষ প্রস্তুত করেছিলেন তাদের মধ্যে কয়েকটি এখানে উল্লেখ করা হ'ল:

Ignus Stove। তাঁর দ্বারা প্রস্তুত এই স্টোভটি একসময়ে অনেক বাড়িতে ব্যবহার করা হ'ত। বেঙ্গল কেমিক্যালের উৎপন্ন বস্তু রূপে এটি বাজারে প্রচলিত হয়েছিল অতি সাফল্যের সঙ্গে। কিন্তু যুদ্ধের সময়ে পিতলের অভাবে এই স্টোভের উৎপাদন বন্ধ হয়ে যায়। এর নামকরণও করেন রাজশেখর। Ignition অর্থাৎ প্রজ্বলন থেকে এই নাম হয়নি। সংস্কৃত শব্দ ইগ্‌নাস মানে অগ্নি, সেই অর্থে এখানে ব্যবহার করা হয়েছে।

Idolep ও Borolep এই দু'টি মালিশের ওষুধ এবং Rodofen দাঁতের মাজন তাঁরই ফরমূলা থেকে বেঙ্গল কেমিক্যালে প্রস্তুত। তিনি অবশ্য বিলাতী নিদর্শনের অনুকরণে এইসব ফরমূলা তৈরী করেছিলেন। এসব নামও তাঁরই বিশিষ্ট পদ্ধতিতে দেওয়া। Lep শব্দটি ইংরেজী নয়—লেপন এই অর্থে সংক্ষেপ করে প্রযুক্ত হয়েছে। Rodofen কথাটিও ইংরেজী হিসেবে ব্যবহৃত হয়নি। সংস্কৃত শব্দ রদ অর্থে দাঁত এবং fen ফেনা। বেঙ্গল কেমিক্যালে উৎপন্ন অনেক দ্রব্যাদির নামকরণ এইভাবে রাজশেখর বাংলা ইংরেজী মিশ্রণে করেন।

বিজ্ঞানকে তাঁর ঘরোয়াভাবে প্রয়োগেরও, অর্থাৎ প্রতি-

ষ্ঠানের উৎপন্ন পণ্য নয় এমন, কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়। এইসবের মধ্যেও এমন জিনিষ একাধিক ছিল যা কারখানায় প্রস্তুত হয়ে ট্রেড মার্ক ধারণ করে বাজারে বিক্রীত হ'তে পারত। সেসব তিনি ব্যক্তিগতভাবে খেয়ালখুসিতে তৈরী করলেও রীতিমত বিজ্ঞানীর কর্ম। যথা ঃ

Hot Air Fan। যন্ত্রটির মধ্যে যে কেরসিন ল্যাম্প প্রজ্বলিত হ'ত তা থেকে উৎপন্ন গ্যাসে এই পাখা চালিত হ'ত। এই টেবল্ ফ্যানের পাখাও তিনি সেলুলয়েড থেকে নিজের হাতে তৈরী করেন। আদ্যোপান্ত স্বহস্তে প্রস্তুত এই যন্ত্র commercial scale-এ উৎপাদন করবার ইচ্ছা ছিল তাঁর। নানা কারণে তা' ঘটেনি। এই বস্তুটির তিনি নাম দিয়েছিলেন Aero Krit. Krit কথাটি কিন্তু ইংরেজী নয়— সংস্কৃত কৃৎ রোমান হরফে লেখা। Aero Krit অর্থাৎ হাওয়া করে।

Barometer। আবহাওয়ার চাপ পরিমাপের এই যন্ত্রটি তিনি স্বহস্তে coil থেকে তৈরী করেছিলেন। এ ব্যারো-মিটার এখনো (অর্থাৎ ১৯৬৩/৬৪ সালে) তাঁর বকুল বাগানের বাড়িতে আছে সচল অবস্থায়।

Air Brush। এই ধাতব কলমটি তিনি container pump ইত্যাদি সমেত প্রস্তুত করেন ফটোগ্রাফির কাজের জন্যে। ফিনিশিংএ রঙ্ দেবার কাজে ব্যবহার করবার জন্যে যতীন্দ্রকুমার সেনকে (তিনি একজন উৎকৃষ্ট ও পেশাদার ফটোগ্রাফারও ছিলেন অনেকদিন) দেন। এমনি air brush রাজশেখর তিনটি তৈরী করেছিলেন। একটি দিয়েছিলেন যতীন্দ্র কুমারকে এবং বাকি দু'টি বিক্রয় ক'রে দেন ৫০ টাকা হিসাবে।

যন্ত্রকুশল রাজশেখরের আরেকটি কৃতিত্বও এখানে উল্লেখনীয়। এ সম্পর্কে লাইনো টাইপ এবং আনন্দবাজার পত্রিকার তৎকালীন পরিচালক সুরেশচন্দ্র মজুমদারের প্রসঙ্গ স্মরণীয় হয়ে আছে।

বাংলা মুদ্রণ-যন্ত্রশিল্পে যুগান্তর এনেছে লাইনো টাইপের ব্যবহার। তার উদ্ভাবন ও প্রচলনে ঐতিহাসিক কীর্তির অধিকারী আনন্দবাজার পত্রিকার সুরেশচন্দ্র মজুমদার। আনন্দবাজার পত্রিকা মুদ্রণের জন্যে সুরেশচন্দ্র যখন লাইনো টাইপ প্রবর্তন করেন, তখন তিনি পেয়েছিলেন রাজশেখরের technical সাহায্য-সুরেশচন্দ্রের লাইনো টাইপ প্রবর্তনের প্রথম থেকেই রাজশেখরের সঙ্গে সক্রিয় যোগ ছিল।

রাজশেখরকে সুরেশচন্দ্র বিশেষ শ্রদ্ধা করতেন এবং তাঁর সঙ্গে অনেক পরামর্শও করেন এ বিষয়ে। তাঁর লাইনো টাইপ প্রস্তুত করার কাজে যান্ত্রিক দিকটিতে রাজশেখর মূল্যবান সহায়তা করেছিলেন।

কিভাবে লাইনো টাইপ গঠন করা যায় এ প্রসঙ্গে রাজশেখর তাঁকে বলেন, 'বাংলা অক্ষরের ছাঁদের সংস্কার করতে হবে, তা হ'লে লাইনো টাইপ সফল হ'তে পারে।'

একেবারে জ্যামিতিক প্রক্রিয়ায় পয়েণ্টের মাপ-জোক ক'রে রাজশেখর নির্দেশ দেন যতীন্দ্রকুমারকে। তিনি সেই অনুসারে গ্রাফ্ পেপারে ড্রইং করেন নতুন ছাঁদ বড় বড় অক্ষরে। তাই থেকে সংক্ষিপ্ত আকারে লাইনোর অক্ষরের রূপ গঠিত হয়।

সুরেশচন্দ্র লাইনো টাইপ প্রস্তুত করে ব্যবহার করতে বিশেষ অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছিলেন। তখন রাজশেখর

তাঁকে সাহায্য করেন উক্ত প্রকারে। রাজশেখরকে সুরেশচন্দ্র জানিয়েছিলেন যে, টাইপ বড় বেশি ভেঙ্গে যাচ্ছে। রাজশেখর ব্যাপারটি চিন্তা করে দেখলেন যে, বাংলা হরফের ছাঁদ সব সমান নেই। তারপর তিনি নতুন মাপ-জোক করে সামঞ্জস্যপূর্ণ ভাবে পরিমাপ স্থির করলেন এবং সেই হিসাবে ডিজাইন প্রস্তুত করালেন যতীন্দ্রকুমারকে দিয়ে। সেই সুসম (uniform) মাপের টাইপ থেকে সুরেশচন্দ্র পরে যখন নতুন লাইনো তৈরী করলেন, তখন আর বেশি অপচয় হ'ত না।...

বিজ্ঞানী রাজশেখরের আর একটি ঘনিষ্ঠ পরিচয় বিধৃত আছে তাঁর প্রণীত 'ভারতের খনিজ' এবং 'কুটির শিল্প' নামে দু'টি পুস্তিকায়। এই দু'টি সংক্ষিপ্ত বই, বিশেষে 'ভারতের খনিজ' বিজ্ঞানে নানা বিভাগে তাঁর অধিকার চিহ্নিত রেখেছে। তাঁর বিজ্ঞানচর্চা সম্পর্কে পুস্তিকা দু'টি থেকে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, বিজ্ঞানকে তিনি সর্বতোভাবে প্রয়োগ করবার জন্যেই চিন্তা ও কাজ করতেন—আর তার মূল লক্ষ্য ছিল স্বদেশের অভ্যুন্নতি ও মঙ্গলের দিকে। অর্থাৎ বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব আলোচনার চেয়ে ব্যবহারিক বিজ্ঞানের প্রতি তাঁর সমধিক আগ্রহ ছিল।

বিভিন্ন রঙ তিনি প্রস্তুত করতে পারতেন এবং বাড়ীতে তা করেও ছিলেন। নিজের তৈরি নানা রকম রঙ তিনি রবীন্দ্রনাথকেও উপহার দেন চিত্রকর্মের জন্যে। রবীন্দ্রনাথ সেই সব রঙে অনেকগুলি ছবি এঁকেছিলেন।

রাজশেখর একবার সস্ত্রীক শান্তিনিকেতনে বেড়াতে গেলে তাঁদের তার মধ্যে থেকে দু'খানি ছবি প্রত্যুপহার দিয়েছিলেন

কবি। রাজশেখরের স্বহস্তে প্রস্তুত রঙে আঁকা রবীন্দ্রনাথের হাতের ছবি দু'টি তাঁর বকুলবাগানের বাড়ীতে রক্ষিত আছে তাঁদের পারস্পরিক শ্রদ্ধা-প্রীতির স্মৃতি-স্বরূপ। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় যে, রবীন্দ্রনাথের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধার সীমা ছিল না। এত শ্রদ্ধা তিনি আর কোন ব্যক্তিকে করতেন কিনা সন্দেহ।

বিজ্ঞানী রাজশেখরের কিছু কিছু পরিচয়, বিজ্ঞানের ব্যবহারিক প্রয়োগের উল্লেখ সাহিত্যিক রাজশেখরের সৃষ্টির মধ্যেও পাওয়া যায়। তাঁর রচিত নানা গল্পের মধ্যেও—বিজ্ঞানের প্রবন্ধ বা পুস্তিকা ছাড়া—সেই সব নিদর্শন আছে। হাসি তামাসাচ্ছলে বর্ণনা করা হলেও রসায়ন ও পদার্থ বিদ্যায় পারদর্শী ভিন্ন তেমন উক্তি করা অসম্ভব। তার কয়েকটি উদাহরণ এখানে দেওয়া হল :

'বিরিঞ্চিবাবা'র প্রফেসর ননীর সেই অপূর্ব বিবৃতি : "প্রোটিন সিন্থেসিস হচ্ছে। ঘাস হাইড্রোলাইজ হয়ে কার্বোহাইড্রেট হবে। তাতে দুটো অ্যামিনো গ্রুপ জুড়ে দিলেই বস্।"

কিংবা "কি রকম ধোঁয়া? যদি লাল ধোঁয়া চাও তবে নাইট্রিক অ্যাসিড এণ্ড তামা, যদি বেগনী চাও তবে আয়োডিন ভেপার, যদি সবুজ চাও···" ইত্যাদি কোন অবৈজ্ঞানিকের দ্বারা লেখা সম্ভব হ'ত না। তাঁর কয়েকটি গল্পে এমনি বিজ্ঞানের প্রয়োগ নিয়ে সরস প্রসঙ্গ আছে, অধিক উদ্ধৃতি বাহুল্য। 'গগন চটি' গল্পে তাঁর আকাশ ও নক্ষত্র বিদ্যার যে পরিচয় পাওয়া যায় তা স্বল্প নয়।

এমনিভাবে দেখা যায় যে, বিজ্ঞানীরূপেও তাঁর অভিজ্ঞতা

নানামুখী। বিজ্ঞানের বেশ কয়েকটি বিভাগে তাঁর অন্তরঙ্গ জ্ঞান ছিল, শুধু পদার্থ ও রসায়ন বিদ্যায় নয়।

আর একদিক থেকেও বলা যায় যে, তাঁর বিজ্ঞানী মনের প্রভাব সমগ্রভাবে তাঁর সৃষ্ট মৌলিক সাহিত্যের ওপরেও পড়েছিল। তাঁর নিরাবেগ, নিরুচ্ছ্বাস matter of fact বর্ণনা, ভাবালুতা-বর্জিত রচনা, অযৌক্তিক সমস্ত কিছুর প্রতি মারাত্মক ব্যঙ্গবিদ্রূপ—এ সমস্তই তাঁর বৈজ্ঞানিক সত্তার স্বকীয় প্রকাশ। রস-সাহিত্যকার রাজশেখরের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী বিদ্যমান আছেন বিজ্ঞানী রাজশেখর। কি কর্মজীবনে, কি সাংস্কৃতিক জীবনে তাঁর এই দুই সত্তা যেন অবিচ্ছেদ্য।

রাজশেখরের আইনজ্ঞ পরিচয়টিও উল্লেখ্য। এ প্রসঙ্গে তাঁর পারিবারিক জীবনও সংশ্লিষ্ট। প্রেসিডেন্সী কলেজে বি. এ. পাঠের সময় রাজশেখরের বিবাহ হয়েছিল। কলেজ ষ্ট্রীটের সাহিত্য-হাটে শ্যামাচরণ দে রাস্তাটি যাঁর নামাঙ্কিত সেই শ্যামাচরণের পৌত্রী রাজশেখরের পত্নী। শ্যামাচরণের পুত্র এ্যাডভোকেট যোগেশচন্দ্রের জামাতা হন রাজশেখর। শ্বশুরের আগ্রহেই তিনি আইন পড়ে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। তারপর যোগেশচন্দ্র উদ্‌যোগ করে জামাতাকে নিজের সঙ্গে হাইকোর্টে নিয়ে যান আইন ব্যবসা আরম্ভ করবার জন্যে।

কিন্তু দু'একদিন মাত্র হাইকোর্টে বেরিয়েই রাজশেখর আইনপেশার প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়েছিলেন। এ বিষয়ে কেউ তাঁকে সম্মত করাতে পারেননি। হাইকোর্টে উকিল হয়ে যাতায়াত এড়াবার জন্যে চাপকানটি দর্জি দিয়ে কাটিয়ে মেয়ের ফ্রক তৈরী করে ফেলেন।

কিন্তু শুধু ল' কলেজে পাঠের ফলে মেধাবী রাজশেখর

আইন-শাস্ত্র অধিগত করেছিলেন অভিজ্ঞ আইনজ্ঞের মতন। হাইকোর্টে দু'একদিন মাত্র যে ছিলেন, তখন একটি মামলার যে মুসাবিদা করেন, তা কোন ধুরন্ধর আইনবেত্তার প্রশংসাধন্য হয়েছিল।

হাইকোর্টে আইন ব্যবসায় এড়ালেন বটে। কিন্তু কয়েক বছর পরেই তাঁর আইনজ্ঞতার সাধন করতে হ'ল সেখানেই। তবে ব্যক্তিগত উপার্জন বা পেশার জন্যে নয়। তাঁর রস-সাহিত্যিক জীবনের উদ্‌বোধনে যে মোকদ্দমার উল্লেখ করা হয়েছে, সেই উপলক্ষ্যে তিনি পুনরায় হাইকোর্টে এলেন।

বেঙ্গল কেমিক্যালের সঙ্গে আসল বাটপাড়িয়ার মামলায় তাঁকে তখন অনেক দিন হাইকোর্টে উপস্থিত থাকতে হয়। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, সেই মোকদ্দমায় বেঙ্গল কেমিক্যালের পক্ষে দণ্ডায়মান হন স্যর নৃপেন্দ্রনাথ সরকার। সেসময় নৃপেন্দ্রনাথকে এই মামলা পরিচালনায় রাজশেখর আইনজ্ঞরূপে অক্লান্ত সাহায্য করেছিলেন। প্রভূত পরিশ্রমে তিনি দিনের পর দিন নথিপত্র ঘেঁটে সহায়তা করেন case তৈরি করতে।

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র এবং তাঁর নিজেরও সাধ ও সাধনার প্রতিষ্ঠান বেঙ্গল কেমিক্যাল। তা একজন অসাধু অবাঙ্গালীর আত্মসাৎ করবার চেষ্টায় রাজশেখর যে মর্মাহত হয়েছিলেন সেজন্যে প্রতিষ্ঠানটিকে আইনের সাহায্যে বিপন্মুক্ত করতে তৎপর হন। মোকদ্দমা সাজানো থেকে আরম্ভ করে নানা খুঁটিনাটি কাজের জন্যে তিনি হাইকোর্টে যেতেন প্রত্যহ। মামলার আদ্যোপান্ত অনুসরণ করতেন। অতিশয় মানসিক শ্রমে তিনি সেসময় এমন অসুস্থ হয়েছিলেন যে দু'দিন অজ্ঞান

হয়ে পড়েন। যা হোক, সেই মামলায় জয়লাভের পশ্চাতে তাঁর আইন-জ্ঞান ও নিরলস প্রযত্ন যে অনেকখানি সহায়ক হয়েছিল, সে কথাই এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়।

বেঙ্গল কেমিক্যালের সেই জীবন-মৃত্যুর প্রশ্নের পর রাজশেখর আর কোনদিন হাইকোর্ট অভিমুখে যাননি। কিন্তু রসসাহিত্য রচনার নানা পর্বে তাঁর আইনজ্ঞানের নানারকম প্রকাশ দেখা গেছে।

রাজশেখরের মেধা ও বিবেক-বোধ তাঁকে বিস্মৃত হতে দেয়নি আইনের বিভিন্ন প্রক্রিয়া ও অপক্রিয়া।

তাঁর প্রথম সৃষ্টি 'শ্রীশ্রীসিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড' ত পুরোপুরি আইনের মারপ্যাঁচেই গড়া। লিমিটেড কোম্পানীর ব্যাপারে কোম্পানী আইন বাঁচিয়ে কিংবা আইনেরই সাহায্যে কিভাবে ধূর্ত ও দুষ্টবুদ্ধি লোক পরের ধনে পোদ্দার হয় ও শেষে তা গ্রাস করতে পারে তার পুঙ্খানুপুঙ্খ পরিচয় এই গল্পে রাজশেখর দিয়েছেন। প্রথম গল্পই তাঁর আইনজ্ঞতার এক দ্রষ্টব্য দলিল। আর্টিক্‌ল্‌স্ অব্ মেমোরাণ্ডাম রচনা থেকে আরম্ভ করে Company's Act-এ তাঁর রীতিমত দখল এই গল্পের ছত্রে ছত্রে পরিস্ফুট রয়েছে। বলতে গেলে আইনের চোরাবালির ওপরেই গড়ে উঠেছে এ অপূর্ব রসসৃষ্টির কাহিনীটি। সেজন্যে 'শ্রীশ্রীসিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড' সম্পর্কে কোন কোন পাঠক বলেছিলেন—তখন রাজশেখরের নাম সাধারণ্যে প্রকাশ হয়ে পড়েনি—এটি নিশ্চয় কোন উকিলের লেখা।

এই গল্পের সাহিত্যকর্ম সম্পর্কে আরো একটি কথা মনে হয়। তাঁর সমস্ত রস-রচনার মধ্যে বোধ হয় এই

প্রথমটিতেই তাঁর নাটকীয় বা নির্বিকার মন অনুপস্থিত। অর্থাৎ লেখকের মন বিষয়-বস্তুতে বিজড়িত। এর হাস্যধারার অন্তরাল থেকে একটি ক্রন্দনের নির্ঝরিণীর সুর বেজে ওঠে। সে কান্না, আইনের সাহায্যে প্রবঞ্চিত তিনকড়িরই শুধু নয়। তা যেন আইনজ্ঞ হয়েও বিবেকবিদ্ধ স্বজাতিপ্রেমী রাজশেখরের মর্ম-ক্রন্দন।

আইনের অন্তঃস্থল পর্যন্ত তাঁর জানা ছিল বলেই তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, আইনের রন্ধ্রপথ দিয়ে কেমন সুকৌশলে শয়তান তার প্রাপ্য শাস্তি এড়িয়ে যায়।

আইনের হাড়হদ্দ জানা থাকায় তার লীলা-খেলা তাঁর কাছে ছিল জলবৎ সরল। তাই আইনের দৃষ্টি ও আইনের ব্যবহারিক প্রয়োগ নিয়ে তাঁর কখনো সরস, কখনো শ্লেষাত্মক, কখনো ইঙ্গিতপূর্ণ নানা প্রকার মন্তব্য ও উক্তি তাঁর অনেক গল্পের মধ্যে দেখা যায়। কখনো প্রকট, কখনো প্রচ্ছন্ন ভাবে।

এ প্রসঙ্গে 'শ্রীশ্রীসিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড'-এর কথা আগে বলা হয়েছে। তাঁর 'ভূষণ পাল' ও 'গুপী সাহেব' এই গল্প দু'টি অনেকাংশে মামলা, আদালত, থানা, পুলিশ, জেল ইত্যাদির ভিত্তিতেই রচিত। তাঁর প্রথম গল্পের মতন এ দু'টিতেও আইনজ্ঞ লেখকের পরিচয় প্রায় সর্বত্র প্রকাশমান।

'আনন্দীবাই' গল্পটি হিন্দু বিবাহ আইন সংক্রান্ত। (আমাদের ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে এ আইন মুসলমানের প্রতি প্রযুক্ত হতে পারে না!) বিবাহবিলাসী নায়কের তা ভঙ্গ করার দায় থেকে আধুনিক যুগোচিত পদ্ধতি অনুসারে অব্যাহতি লাভের কৌতুককর কাহিনী।

'মাৎস্যন্যায়' গল্পে রাজশেখর লক্ষণীয়ভাবে বলেছেন, "তাঁর কৃপা না হলে ইলেকসনে জয়লাভ হয় না, উঁচুদরের দুষ্কর্ম নির্বিঘ্নে করা যায় না, আইনের জাল কেটে বেরিয়ে আসা যায় না।"

আইনের নানা সূত্রের টীকা সমেত উল্লেখও আছে তাঁর নানা গল্পে। যথা—

"কিন্তু এই সব আধিদৈবিক ব্যাপার বোধ হয় অরিজিনাল সাইডের জুরিসডিকসনে পড়ে না। আইনে বলে—caveat emptor, অর্থাৎ ক্রেতা সাবধান। সম্পত্তি কেনবার সময় যাচাই করনি কেন? যা হোক একবার expert opinion নেব।" (শ্রীশ্রীসিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড)।

"গবরমিণ্ট কান পকড়কে আদায় করবে। আইন এইসি হ্যায়।" (ঐ গল্প)

"তার পরেই পালাল বাপের বাড়ি। তিনশ চব্বিশ ধারায় ফেলতুম, কিন্তু কেলেঙ্কারির ভয়ে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা আর ছাড়লুম না।" (ভূশণ্ডীর মাঠে)

"এতে কেস প্রেজুডিস্‌ড্ হবে না?" এই আইনের পরিভাষাটি এবং জেরা-দড় উকিলের প্রতি কটাক্ষসূচক "আমি সাক্ষী বিহ্বলকারী ধমক দিয়া বলিলাম"...উক্তিটি আছে তাঁর 'কচি সংসদ' গল্পে।

বাংলায় লাইনো টাইপ প্রচলনের প্রসঙ্গে বাংলা অক্ষরের সংস্কারে রাজশেখরের কিছু দানের কথা যথাস্থানে উল্লেখ করা হয়েছে। বাংলা ভাষার সংগঠনেও তাঁর মহৎ ও বৃহৎ অবদানের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়ার যোগ্য।

তাঁর তুল্য রসসাহিত্যস্রষ্টা যে শব্দতত্ত্ব ও ভাষাতত্ত্বে এমন

সুপণ্ডিত হবেন, এও এক আশ্চর্য ঘটনা। সৃজনশীল সাহিত্য রচনায় যাঁরা প্রতিভার পরিচয় দেন, অভিধান প্রণয়ন কিংবা শব্দের অনুশীলনে আগ্রহ ও নৈপুণ্য সাধারণত তাঁদের মধ্যে দেখা যায় না। কিন্তু মনীষী রাজশেখর এই নিয়মের বরেণ্য ব্যতিক্রম। তাঁর রসসাহিত্য রচনা এবং বাংলা ভাষা বিষয়ে গবেষণা সমান্তরালে চলেছিল। তার ফলে বাংলা শব্দের সংগঠনে তিনি যে অবদান রেখে গেছেন তা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়।

আধুনিক কালের বৈজ্ঞানিক ও রাষ্ট্রীয় পরিবেশে, নানা প্রয়োজনে বাংলা ভাষার নতুন নতুন ক্ষেত্রে প্রয়োগের দরকার হয়। নতুন যুগের এই চাহিদা মেটাবার জন্যে প্রয়োজন দেখা দেয় নতুন শব্দ গঠন ও পুরনো শব্দের নতুন করে সংগঠনের। এই জাতীয় দায়িত্ব অতিশয় দক্ষতার সঙ্গে পালন করেছিলেন রাজশেখর।

বাংলা ভাষার শব্দ সংগঠনে এবং নতুন শব্দের চয়নে ও প্রচলনে তিনি ভাষাজননী সংস্কৃতের ভাণ্ডারের ওপর প্রধানত নির্ভর করেছিলেন। ফলে, আধুনিক যুগের রাষ্ট্রনীতিক, প্রশাসনিক এবং বৈজ্ঞানিক নানা বিভাগীয় কর্মের প্রয়োজনে বাংলা ভাষার প্রয়োগ ও শ্রীবৃদ্ধি ঘটতে থাকে। বিভিন্ন বিষয়ের বাংলা পরিভাষা রচনায় রাজশেখরের দান সর্বাধিক।

এ বিষয়ে তাঁর প্রতিভার সদ্ব্যবহারের জন্যে তাঁকে পরিভাষা সমিতির সভাপতি মনোনীত করেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

রাজশেখরের নেতৃত্বে এই পরিভাষা সমিতির পণ্ডিতমণ্ডলী পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, ভূগোল, জ্যোতিষ, জীববিদ্যা, উদ্ভিদবিদ্যা,

প্রাণীবিদ্যা, ভূবিদ্যা, শারীরবৃত্ত, স্বাস্থ্যবিদ্যা, অর্থবিদ্যা, মনোবিদ্যা, সরকারী কার্য, জ্যামিতি, ত্রিকোণমিতি, বীজগণিত ইত্যাদি বিষয়ে যে পারিভাষিক বাংলা শব্দাবলী গঠন করেন, তা বাংলা ভাষাকে প্রভূত পরিমাণে সমৃদ্ধ ও আধুনিক যুগোপযোগী করে।

বাংলা ভাষার অনুশীলনে রাজশেখর সংকলিত 'চলন্তিকা' অভিধান বহুমূল্য আকর বিশেষ। বাংলা ভাষার চর্চা যাঁরা যথোচিতভাবে করবেন, যে সাহিত্যিক, সাংবাদিক ও সাহিত্যকর্মীরা সঠিক বানান লিখতে এবং সঠিক অর্থে শব্দ ব্যবহার করতে চাইবেন এ গ্রন্থ তাঁদের পক্ষে অপরিহার্য।

'চলন্তিকা' কেবল শুদ্ধ সুশৃঙ্খলভাবে গ্রথিত অর্থযুক্ত শব্দসম্ভার নয়। ব্যাকরণ ও ভাষাচর্চার অতি প্রয়োজনীয় নানা বিষয়ের সার সংগ্রহে সমৃদ্ধ। যথা,—বানানের নিয়ম পর্যায়ে সংস্কৃত বা তদ্‌সম শব্দ, তদ্‌ভব দেশজ ও বিদেশী শব্দ; নানা সংস্কৃত শব্দের বানান, ণত্ব ও ষত্ব বিধি, সন্ধি প্রকরণ; বিস্তারিত ক্রিয়ারূপ; শব্দবিভক্তি ও কারক; সর্বনাম; অশুদ্ধ ব্যাকরণদুষ্ট শব্দের তালিকা ও শব্দের অপপ্রয়োগের কয়েকটি নিদর্শন, ইত্যাদি। তা ছাড়া বিভিন্ন শাস্ত্র ও সরকারী কার্যে ব্যবহারযোগ্য পারিভাষিক শব্দাবলীর মূল্যবান সংযোজনও এই অভিধানে প্রাপ্তব্য। 'চলন্তিকা'র জন্যে তাই রাজশেখরকে রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ অনেকেই আন্তরিক অভিনন্দন জানিয়েছিলেন।

এত বড় প্রতিভাধর ব্যক্তি যিনি, এমন বিভিন্নমুখী ছিল তাঁর প্রতিভার প্রকাশ, ব্যক্তিগতভাবেও তাঁর সদ্‌গুণের যেন অন্ত ছিল না। বলতে গেলে, তাঁর চরিত্র আদ্যন্ত উৎকর্ষের

উপাদানেই গঠিত। কোন রকম অপকর্ষের খাদ তার মধ্যে মিশ্রিত হতে পারেনি।

রবীন্দ্রনাথ যে তাঁর রচনা সম্পর্কে প্রফুল্লচন্দ্রকে লিখে-ছিলেন, "আমি রস যাচাইয়ের নিকষে আঁচড় দিয়ে দেখলেম, আপনার বেঙ্গল কেমিক্যালের এই মানুষটি একেবারেই কেমিক্যাল গোল্ড নন, ইনি খাঁটি খনিজ সোনা"—একথা রাজশেখরের ব্যক্তিসত্তা সম্পর্কেও প্রযোজ্য।

এমন একজন আদর্শচরিত্র মানুষ—চরিত্র শব্দটি এখানে ব্যাপক অর্থে প্রযুক্ত—যে এদেশে জন্মেছিলেন এ এক বিস্ময়ের বস্তু। যে আদর্শ গুণাবলী তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য তার বেশির ভাগই আমাদের জাতীয় জীবনে লোপ পেয়েছে। অন্তত একটি মানুষের জীবনে তাদের সন্নিবেশ এখন নিতান্তই দুর্লভ।

নিয়মনিষ্ঠ, নিরলস, অহমিকাশূন্য এবং আত্মপ্রচারবিমুখ। পরনিন্দা, মিথ্যাভাষণ এবং মিথ্যাচরণ বর্জিত। শান্ত, গম্ভীর, স্বল্পবাক অথচ সুরসিক। দুঃখ-সুখে অবিচল এবং স্থিতপ্রজ্ঞ। মিতাচারী, মিতব্যয়ী অথচ বদান্য। স্পষ্টবাদী, জনপ্রিয়তার আকর্ষণে অন্যায়ের সমর্থনে পরাঙ্মুখ। গভীর সহানুভূতিশীল, স্নেহপ্রবণ এবং সংবেদনশীল অন্তর। অনাড়ম্বর অথচ অতিশয় সুশৃঙ্খল জীবনযাত্রার ধারা। মনে-প্রাণে স্বদেশপ্রেমী, স্বদেশকল্যাণব্রত অথচ জাতীর সঙ্কীর্ণতাবিহীন গ্রহণশীল মন। মুক্ত-হৃদয়, মহাপ্রাণ এবং সংসারের সমস্ত ক্ষুদ্রতার ঊর্ধ্বে ভাস্বর চরিত্র। এত বিশেষণ ব্যক্তি-রাজশেখরের সঙ্গে যুক্ত করা যায় সার্থকভাবে।

চরিত্রের এই সব সদ্‌গুণ অনেকাংশে তাঁর পিতা চন্দ্র-

শেখরের (জন্ম : ১৮৩৩ খ্রী:) উত্তরাধিকার। রাজশেখরের মতন তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শশিশেখর এবং দুই কনিষ্ঠ কৃষ্ণশেখর ও ডঃ গিরীন্দ্রশেখরও অল্পবিস্তর এই গুণাবলী লাভ করে পিতার ধরনের খাঁটি মানুষ হয়েছিলেন।

চন্দ্রশেখর বসু কর্মজীবনে কৃতী হন আপন নিষ্ঠা ও যোগ্যতার বলে। তাঁর ন্যায়পরায়ণ মন ও চারিত্রিক দৃঢ়তা প্রথম জীবনে থেকেই প্রকাশ পায়। যশোর জেলায় যখন তিনি ডাক বিভাগের একজন সাধারণ কর্মচারী, তখনই সেখানকার নীলকর সাহেবদের অত্যাচারে ক্ষুব্ধ হয়ে সে সম্পর্কে প্রতিবেদন পাঠান কলকাতায়। কলকাতার ইণ্ডিগো কমিশনের তদন্ত-কার্য চন্দ্রশেখরের সেই বিবৃতির ওপর অনেকখানি নির্ভর করেছিল। তাঁর প্রদত্ত বিবরণ এমন ন্যায় ও সত্যের ভিত্তিতে রচিত।

কর্মদক্ষতা এবং সততার জন্যে চন্দ্রশেখর স্যর স্টুয়ার্ট হগ (যাঁর নামে কলকাতার মিউনিসিপাল মার্কেটের নামকরণ) সাহেবের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। হগ সাহেবই তাঁকে প্রথম দ্বারবঙ্গের স্টেট কোর্ট অব্ ওয়ার্ডসের একটি কর্মে নিযুক্ত করে দেন। নিজের যোগ্যতায় ক্রমে উন্নতি লাভ করে চন্দ্রশেখর হয়েছিলেন দ্বারবঙ্গ রাজ্যের জেনারেল ম্যানেজার বা দেওয়ান।

কিন্তু কর্মজীবনে সাফল্যই তাঁর একমাত্র পরিচয় নয়। কর্মের অবসরে তিনি জ্ঞানচর্চায় আত্মনিয়োগ করতেন এবং তাঁর প্রিয় বিষয় ছিল দর্শন ও সাহিত্য।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের বিখ্যাত সাংস্কৃতিক সংস্থা তত্ত্ববোধিনী সভার সঙ্গে চন্দ্রশেখরের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের কথা জানা যায়।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকারও একজন নিয়মিত লেখক ছিলেন চন্দ্রশেখর। বিদ্বান গ্রন্থকার রূপেও তাঁর পরিচিতি ছিল। তাঁর রচিত বেদান্ত প্রবেশ, সৃষ্টি, বেদান্ত দর্শন, অধিকারতত্ত্ব, প্রলয়তত্ত্ব প্রভৃতি পুস্তক পাণ্ডিত্যের জন্যে উল্লেখ্য।

চন্দ্রশেখরের পৈত্রিক নিবাস (নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগরের নিকটবর্তী) বীরনগর বা উলা। গ্রামখানি একদা বর্ধিষ্ণু এবং রস-রসিকতার জন্যে বিখ্যাত ছিল। তাঁর প্রপিতামহ রাম-সন্তোষ বসু পলাশী যুদ্ধের ৫০ বছর আগে উলার মুস্তোফী বংশে বিবাহ করবার পর থেকে বসুরা উলাবাসী হয়েছিলেন।

রাজশেখরের জন্ম হয় বর্ধমান জেলার শক্তিগড়ের কাছে বামুনপাড়া গ্রামের মাতুলালয়ে। তাঁর জন্মদিন ১৮৮০ সালের ১৬ই মার্চ। রাজশেখরের শৈশব ও বাল্যকাল পিতার সঙ্গে বাংলার বাইরে বিহারে অতিবাহিত হয়েছিল। প্রথম বিদ্যা-চর্চা আরম্ভ হয় মুঙ্গের জেলার খড়্গপুরে বাসের সময়। পরে ৮ থেকে ১৫ বছর বয়স পর্যন্ত দ্বারবঙ্গ রাজ স্কুলে পড়ে এণ্ট্রান্স পাশ করেন।

তার মধ্যে, কিশোর রাজশেখরের অসাধারণ মেধার পরিচয় পাওয়া যায় ১২ বছর বয়সেই। সে সময় সমগ্র দ্বারবঙ্গ ডিভিশনের ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় প্রথম স্থান তিনি অধিকার করেন। সেজন্যে দ্বারবঙ্গের মহারাজা তাঁকে উপহার দেন একটি মুরেঠা।

বাল্যকাল থেকেই পিতার সান্নিধ্যে নিয়মনিষ্ঠা, শোভন রুচির আচার-ব্যবহার, জ্ঞানচর্চার প্রতি শ্রদ্ধা, চারিত্রিক গুণের সমাদর থেকে আরম্ভ করে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, এমন কি সুন্দর ছাঁদের হস্তলিপির পাঠ পর্যন্ত লাভ করেন। তার ফলে

রাজশেখরের চরিত্র গঠন হয়ে যায় বরাবরের জন্যে।

এণ্ট্রান্স পাশ করবার পর দ্বারবঙ্গ থেকে পাটনায় এসে সেখানকার কলেজে ১৮৯৫ থেকে ১৮৯৭ খ্রীঃ পর্যন্ত পড়ে তিনি ফার্স্ট আর্টস উত্তীর্ণ হন। তারপর কলকাতায় এসে ১৮৯৭-৯৯ পর্যন্ত বিজ্ঞানে বি, এ, পাঠ।

এই সময়েই শ্যামাচরণ দের পৌত্রী শ্রীমতী মৃণালিনীর সঙ্গে রাজশেখরের বিবাহ হয়। বিজ্ঞানে এম, এ পাশ করা এবং আইন পড়ে শ্বশুরের আগ্রহে হাইকোর্টে যোগদান এবং তা পরিত্যাগ ইত্যাদি আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। তাঁর কর্মজীবনের আরম্ভ ও সমাপ্তি বেঙ্গল কেমিক্যালে। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত ডিরেক্টররূপে বেঙ্গল কেমিক্যালের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন রাজশেখর।

অর্ধশতাব্দেরও অধিককাল, প্রায় ৫৭ বছর একাদিক্রমে এই প্রতিষ্ঠানের উন্নতির চেষ্টার সঙ্গে যেভাবে তিনি নিজেকে সংযুক্ত রাখেন, তাও এক দৃষ্টান্তস্থল। তারপর ৪২ বছর বয়সে যে সাহিত্য-জীবন আরম্ভ হয়ে বাঙ্গলা সাহিত্যকে বহু বিভাগে সমৃদ্ধ করেন, তাও তাঁর আদর্শনিষ্ঠ জীবনের এক পরম প্রকাশ এবং সাহিত্যিকদের পক্ষে প্রেরণা স্বরূপ।

সাহিত্য সাধনা তাঁর জীবন সাধনার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী হয়েছিল সেই পরিণত বয়সে। প্রতিদিন ভোর চারটের সময় শয্যা-ত্যাগ ও চা পান ইত্যাদির শেষে লিখতে বসতেন তিনি, বকুল বাগানের বাড়ীর নীচের ঘরে।

সকাল ৯টা পর্যন্ত লেখার কাজ করে ওপরে যেতেন। বেলা এগারটার মধ্যে স্নানহার। দুপুরে কিছু বিশ্রাম ও কিছু পড়াশোনা।

বিকালে সন্ধ্যায় বন্ধু যতীন্দ্রকুমার সেন, মাঝে মাঝে অধ্যাপক চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য প্রভৃতির সঙ্গে বসে বসে গল্পসল্প, সাহিত্য-শিল্প ও নানা প্রসঙ্গে আলাপ-আলোচনা। পার্শী-বাগানের বাড়ীতে যেমন উৎকেন্দ্র সমিতি ছিল, তেমন বড় আসর না হলেও একটি ঘনিষ্ঠ চক্রের সাহিত্য-আসর বকুল বাগানের বাড়ীতেও তাঁর উত্তর-জীবনে বসত। মাসে একদিন অন্তরঙ্গ কয়েকজনের সামনে তিনি এই আসরে নতুন রচনা ইত্যাদি পাঠ করতেন জীবনের প্রায় শেষ পর্যন্ত।

লেখা প্রথমে লিখতেন পেনসিলে। যাতে সংশোধন পরিবর্তন ইত্যাদি রবার দিয়ে পরিষ্কার ভাবে করা যায়। কাটাকুটির অপরিচ্ছন্নতা আদৌ পছন্দ করতেন না তিনি।

কালিতে লিখতেন অতিশয় পরিচ্ছন্ন ও সুবিন্যস্তভাবে। লেখায় কোন কাটা বা অদল-বদল করতে হলে সেই মাপের কাগজ আটা দিয়ে সেখানে চাপা দিতেন। যেন কোনরকম কাটাকুটি চোখে না পড়ে।

পাণ্ডুলিপি আদ্যন্ত সুন্দর হস্তাক্ষরের সুশৃঙ্খল শব্দমালায় সজ্জিত থাকত। তাঁর অমলিন অন্তরের প্রতিচ্ছবি যেন। সরলরেখার প্রতি পৃষ্ঠায় পঙক্তি-শ্রেণী নির্দিষ্ট হিসাবে লেখা।

সমগ্র রচনায় কত শব্দ আছে, ছাপার অক্ষরে কত পৃষ্ঠা হতে পারে, সমস্ত হিসাবই তাতে পাওয়া যায়। কোন বইয়ের পাণ্ডুলিপি যখন প্রকাশককে দিতেন, সমস্ত হিসাব নিজে ক'রে দিতেন—কত শব্দ আছে, কত পৃষ্ঠা আনুমানিক হবে ছাপায়। তাঁর হিসাব নির্ভুলই দেখা যেত ছাপাবার পর।

জীবনের প্রতিটি কাজের মতন সাহিত্য-কর্মও তাঁর এমনি নানা নিয়ম-শৃঙ্খলার চিহ্নিত থাকত। তাঁর বহিরঙ্গ জীবনের সেই

সুশৃঙ্খল দৈনন্দিন ধারা কোন কারণে বিঘ্নিত হ'ত না। দুঃখ-সুখে কখনও আত্মহারা হ'তে দেখা যায়নি তাঁকে। অসীম সহনশীলতা ও স্থৈর্য ছিল তাঁর চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। প্রথম জীবনে পরিপূর্ণ সুখের সংসারেও তাঁর মনে কোনদিন চাপল্য জাগেনি। মধ্যবয়সে নিদারুণ শোকও তেমনি অসাধারণ মানসিক বলে নীরবে সহ্য করেছিলেন। তাঁর একমাত্র সন্তান আদরের কন্যা অকস্মাৎ পরলোকগতা হন, স্বামীর মৃত্যুর মাত্র কয়েকঘণ্টা আগে। রাজশেখরের জামাতা বহুদিন থেকে দুরারোগ্য রোগে কষ্ট পাচ্ছিলেন, কিন্তু তাঁর কন্যা সম্পূর্ণ সুস্থ থেকে স্বামীর সেবাশুশ্রূষা করতেন। অবশেষে স্বামীর মৃত্যু যখন অবধারিত জানা গেল, সে মৃত্যুর কয়েকঘণ্টা মাত্র পূর্বে রাজশেখর-কন্যার শেষ নিঃশ্বাস পড়ে এবং স্বামী-স্ত্রীর শেষকৃত্য সম্পন্ন হয় একই চিতাশয্যায়। ঘটনাটি সেদিন প্রায় অলৌকিক বলে প্রচারিত হয়ে যায়। রবীন্দ্রনাথ সংবাদ পেয়ে তাঁকে সহানুভূতি জানাতে আসেন তাঁর তখনকার আবাসস্থল সুকিয়া স্ট্রীটের বাড়ীতে।

সেই মহাশোকের সময়েও বাইরে থেকে অবিচলিত দেখা যায় রাজশেখরকে। কিন্তু তখন থেকেই তিনি এতদিনের সখ ও আনন্দের বস্তু ছবি আঁকা একেবারে বন্ধ করে দিলেন। দুঃখভোগের ওই একটিমাত্র বহিঃপ্রকাশ দেখা গেল তাঁর। আর কন্যার মৃত্যুতে একটি কবিতা রচনা করলেন 'সতী' নামে, যা তাঁর কোন পুস্তকে প্রকাশিত না হওয়ায় এখানে উদ্ধৃত ক'রে দেওয়া হ'ল :

নিশিশেষে কৃতান্ত কহিল দ্বার ঠেলি'—
'ছাড় পথ হে কল্যাণী, আনিয়াছি রথ,

জীর্ণ দেহ হতে আজি পতিরে তোমার
মুক্তি দিব। ধৈর্য ধর শান্ত কর মন।'
কৌতুকে কহিল সতী—'দেখি দেখি রথ।'
সসম্ভ্রমে বলে যম—'দেখ দেখ দেবী,
রথশয্যা মাতৃ-অঙ্ক সম সুকোমল
ব্যথাহীন শান্তিময় বিশ্রাম-নিলয়,
কোন চিন্তা করিও না হে মমতাময়ী।'
চকিতে উঠিয়া রথে বসে সীমান্তিনী
বিদ্যুৎ-প্রতিমা সম। শিরে হানি' কর
বলে যম—'কি করিলে, কি করিলে দেবী
নামো নামো, এ রথ তোমার তরে নয়।'
দৃপ্ত স্বরে বলে সতী—'চালাও সারথী,
বিলম্ব না সহে মোর, বেলা বহে যায়।'
উল্কাসম চলে রথ জ্যোতির্ময় পথে,
স্তব্ধ বসুন্ধরা দেখে কোটি চক্ষু মেলি।
প্রবেশি অমর লোকে জিজ্ঞাসে শমন—
'হে সাবিত্রীসমা, বল আর কি করিব ?'
কহে সতী—'ফিরে যাও আলয়ে আমার,
যার তরে গিয়াছিলে আনো শীঘ্র তারে।'
কৃতান্ত কহিল—'অয়ি মৃত্যু বিজয়িনী
নিমেষে যাইব আর আসিব ফিরিয়া।'

জামাতা অমরনাথ পালিতের ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান (সাবান প্রস্তুত করবার কারখানা) ও বাসস্থল ছিল বালীগঞ্জে, নাটোর পার্কের পাশে। তারই কাছে রাজশেখর নিজে নকসা প্রস্তুত করে একটি বাড়ী করেছিলেন।

সেখানে কন্যার কাছাকাছি বাস করবার ইচ্ছা ছিল, বেঙ্গল কেমিক্যাল থেকে অবসর গ্রহণ করবার পর। কিন্তু কন্যা জামাতার আকস্মিক মৃত্যুতে সেখানে বাসের পরিকল্পনা ত্যাগ করেন। শুধু তাই নয়। পরে যখন ডঃ গিরীন্দ্রশেখর বসু মানসিক রোগ চিকিৎসার জন্যে একটি সেবাসদন প্রতিষ্ঠায় উদযোগী হলেন, তখন রাজশেখর সেই বাড়ীটি দান করলেন এই সৎ কর্মের প্রচেষ্টায়। বাড়ী প্রথমে একতল ছিল। ক্রমে বর্ধিত হয়। রাজশেখরের সেই বাড়ীকে ভিত্তি করেই পরবর্তীকালের বিখ্যাত লুম্বিনী পার্কের মানসিক চিকিৎসালয়টি গড়ে ওঠে। লুম্বিনী পার্ক নামটিও রাজশেখর রেখেছিলেন তাঁর এই গৃহনির্মাণের পর।

তা ছাড়াও, রাজশেখরের আরো অনেক দান ছিল—সবই গোপন। দানের কথা তিনি কখনও প্রকাশ করতেন না এবং গ্রহীতাদেরও তা গুপ্ত রাখবার নির্দেশ দিতেন। তাঁর আন্তরিক ইচ্ছা ছিল যে, তাঁর দানের কথা যেন প্রকাশিত বা প্রচারিত না হয়।

কিন্তু তাঁর জীবনচরিত আলোচনায় তা অনুল্লিখিত থাকা অনুচিত। রাজশেখরের স্বর্গত আত্মা যেন তাঁর নির্দেশ অমান্যের জন্যে লেখককে ক্ষমা করেন। এমন মহৎ দৃষ্টান্তের পরিচয় দেশবাসীর অজ্ঞাত থেকে যাওয়া অবিধেয়। সুতরাং তাঁর কয়েকটি দানের কথা ব্যক্ত করা হ'ল এখানে।

বিশ্বভারতী প্রকাশিত তাঁর বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ গ্রন্থমালার দু'টি পুস্তিকার ('ভারতের খনিজ' ও 'কুটিরশিল্প') গ্রন্থসত্ব তিনি রবীন্দ্রনাথ স্থাপিত সেই বিদ্বৎ প্রতিষ্ঠানকেই দান করে দেন। বিশ্বভারতীর ল্যাবরেটরির সাহায্যকল্পে দান করেন

১০০০ (এক হাজার) টাকা। তাঁর সাহিত্যকর্মের জন্যে এ্যাকাডেমি পুরস্কারপ্রাপ্ত ৫০০০ (পাঁচ হাজার) টাকাও তিনি দান করেছিলেন।

এসব ছাড়াও আরও অনেক গোপন দান তাঁর ছিল নানা সময়ে নানা ব্যক্তিকে, যা কোন তৃতীয় ব্যক্তির পক্ষে জানা সম্ভব নয়।

এমন আত্মগোপনকারী মানুষ ছিলেন তিনি। জ্ঞানচর্চায় নিবেদিত তাঁর জীবন বাইরে থেকে অন্তর্মুখী মনে হলেও অন্তর তাঁর মানবিকতায় পরিপূর্ণ ছিল।

তাঁর যে মানসিক স্থৈর্যের কথা আগে উল্লেখ করা হয়েছে, তা অব্যাহত ছিল জীবনের শেষ পর্যন্ত। মধ্যজীবনে কন্যার মৃত্যুতে তিনি মহাশোক পেয়েছিলেন। আরও পরিণত বয়সে যে শোক পেলেন, তাও কি মর্মন্তুদ।

পত্নীরূপে আদর্শ ছিলেন তাঁর গৃহলক্ষ্মী। সুখে-দুঃখে সেবায়-যত্নে একান্ত পতিপরায়ণা। লেখিকা অনুরূপা দেবী —যিনি রাজশেখরের সহধর্মিণীকে অনেক বছর যাবৎ বান্ধবী-রূপে জানতেন—তাঁর সম্বন্ধে বলেছিলেন যে, তিনি পরশু-রামের "হাস্য সরসতার উৎস"।

রাজশেখরের সেই প্রায় অর্ধশতাব্দের জীবনসঙ্গিনী অকস্মাৎ যেন ইচ্ছামৃত্যু বরণ করেন।

ভবানীপুরে ৭২, বকুলবাগান স্ট্রীটের নিজস্ব বাড়ীতে তখন তাঁদের বাস। তার দোতলার বারান্দায় কন্যা জামাতার মর্মর মূর্তি। রাজশেখরের শয়ন কক্ষের সংলগ্ন তাঁর পত্নীর ঘর। সেখান থেকেও বারান্দায় যাওয়া যায়। রাজশেখর সেদিন অভ্যাস মতন শয্যাত্যাগ করেছেন শেষ রাত্রে। নীচের ঘরে

এসে খানিকক্ষণ লিখেছেন। তারপর এসেছেন স্ত্রীর ঘরে। সেখানে তাঁকে না পেয়ে বারান্দায় এসে দেখেন—তিনি সেই মূর্তির নীচে শায়িতা।

প্রথমেই দেখে বোঝবার মতন নয়। তার এখানে সকালে শয়ন করা ত অস্বাভাবিক। রাজশেখর আশ্চর্য হয়ে ডাকলেন, 'মেজ বৌ। মেজ বৌ।'

নিজে দ্বিতীয় পুত্র বলে স্ত্রীকে সেকালের পারিবারিক রীতিতে ওইভাবে সম্বোধন করতেন। (রবীন্দ্রনাথের পত্নী-সম্ভাষণ যেমন 'ছোট বৌ।')

কিন্তু কয়েকবার ডেকেও কোন সাড়া পেলেন না। তখন বাহু স্পর্শ করে ডাকতে গিয়েই অনুভব করলেন—শীতল অঙ্গ!

ডাক্তার এসে পরীক্ষা করে বললেন— রাত্রে মৃত্যু হয়েছে!

কিন্তু তার পূর্ব রাত্রি পর্যন্ত মৃণালিনী সম্পূর্ণ সুস্থ ছিলেন। বাড়ীতে তাঁর ভগিনী, ভগ্নীপতি এসেছিলেন গত দিন। সকলের সঙ্গে কথাবার্তায়, স্বাভাবিক কাজকর্মে দিনান্ত হয়েছে। তারপর গভীর রাত্রে তিনি কখন্ উঠে এসেছিলেন প্রাণপুত্তলি কন্যার মূর্তির কাছে, কখন্ তাঁর আকস্মিক জীবনান্ত ঘটেছে,—একথা কেউ জানতে পারেননি। রাজশেখরও না। এত অগোচরে এতদিনের ঘনিষ্ঠ সঙ্গিনী চলে গেলেন চিরকালের জন্যে।

রাজশেখরের মতন প্রেমময় স্বামী যে শূন্যতা অনুভব করলেন তা অনুমান করা কঠিন নয়। কিন্তু নিজেকে সংবৃত করে নিতেও তাঁর বেশি বিলম্ব হয়নি। যথা-শৃঙ্খলা তাঁর

কর্তব্যপূর্ণ জীবনযাত্রার ধারা, তাঁর জ্ঞানচর্চা এবং সাহিত্য-সাধনা ইত্যাদি চলেছিল মাসের পর মাস। বছরের পর বছর। আমৃত্যু। তাঁর 'রামায়ণ' 'মহাভারত' 'শ্রীমদভাগবত' অনুবাদ এই পর্বের সাহিত্যকৃতি।

জীবনের শেষ প্রান্তে পৌঁছেও সাহিত্য রচনা থেকে কখনও বিরত হননি। বহুমুখী মানস সত্ত্বেও রাজশেখর ছিলেন প্রধানত সাহিত্য-সেবক। সাহিত্যিক জীবনই তাঁর শ্রেষ্ঠ পরিচয়। তাই জীবনের প্রায় শেষ দিন পর্যন্ত তিনি লিখে গেছেন। প্রতি বছর কয়েকটি পত্রিকার শারদীয় সংখ্যার জন্যে গল্প লেখা ছিল তাঁর নির্দিষ্ট কাজ। শেষ লেখা অসম্পূর্ণ থেকেছে মৃত্যুরই জন্যে।

আর সে কি আদর্শ মৃত্যু! কোন রোগযন্ত্রণা নয়, বৈকল্য নয়, বিকৃতি নয়। কাউকে কোন কষ্ট দেওয়াও নয়। দিন যাপনের কর্মহীন অবসরে সকলের দৃষ্টি এড়িয়ে সে আরেক আশ্চর্য পরলোকযাত্রা।

বয়স তখন তাঁর ৮১ বছর চলেছে।

সেদিনও যথারীতি উঠেছেন ব্রাহ্ম মুহূর্তে। ধীর স্থির চিত্তে একে একে করণীয় কাজ প্রায় দুপুর পর্যন্ত করেছেন। আহারের পর দোতলা থেকে নীচে এসেছেন বেরুবার সাজে।

বসবার ঘরে আরাম কেদারায় খানিক বিশ্রাম করে নিচ্ছেন। একটু পরেই বেরুবার কথা। বেঙ্গল কেমিক্যালের পরিচালক পর্ষদের সভায় যাবেন। বাড়ীর সামনে গাড়ি এনে চালকও অপেক্ষা করছে তাঁর জন্যে।

তিনি ঘুমিয়েছেন মনে করে কেউ ডাকেনি। খানিকক্ষণ পরে ড্রাইভার এল ডাকতে। এবার যাবেন কি ?

কে সাড়া দেবেন? প্রশান্ত মুখ। চির-বিশ্রামে নিমগ্ন। কখন্ নিঃশব্দে প্রয়াণ করেছেন অন্য কোন যানে! কোন অজানা লোকে!

রাজশেখর রচিত গ্রন্থাবলী:

(১) গড্ডলিকা (গল্প)। (২) কজ্জলী (গল্প)। (৩) হনুমানের স্বপ্ন (গল্প)। (৪) গল্প কল্প (গল্প)। (৫) আনন্দীবাই ইত্যাদি গল্প। (৬) কুটির শিল্প (প্রবন্ধ)। (৭) ভারতের খনিজ। (৮) বাল্মীকি রামায়ণ (সারানুবাদ)। (১০) মেঘদূত (অনুবাদ)। (১১) চলন্তিকা (অভিধান)। (১২) চমৎকুমারী ইত্যাদি গল্প। (১৩) ধুস্তুরী মায়া ইত্যাদি গল্প। (১৪) কৃষ্ণকলি ইত্যাদি গল্প। (১৫) নীল-তারা ইত্যাদি গল্প। (১৬) লঘুগুরু (প্রবন্ধ)। (১৭) বিচিন্তা (প্রবন্ধ)। (১৮) চলচ্চিন্তা (প্রবন্ধ)। (১৯) হিতোপদেশের গল্প (অনুবাদ)। (২০) শ্রীমদ্‌ভাগবদ্ গীতা (অনুবাদ)। (২১) পরশুরামের কবিতা।

বিপ্লবী থেকে সাহিত্যিক

১৯০৮ সালের বাংলা।

বঙ্গ ভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের তরঙ্গে দেশ তখন উত্তাল। নব-জাগ্রত জাতীয়তাবোধের প্লাবন এসেছে। পরাধীনতার মর্মদাহে উদ্‌বুদ্ধ হয়েছে জাতি।

গুপ্ত সমিতির প্রেরণায় কলকাতার এক তরুণ বিদেশ যাত্রা করলেন।

পুলিশকে অপ্রস্তুত রাখতে মিথ্যা রটনা করা হল—ধনগোপাল জাপান যাচ্ছেন যন্ত্র-শিক্ষার উদ্দেশ্যে।

বিদেশী শাসকের কুঠারে বাংলা দ্বিখণ্ডিত। তার বিরুদ্ধে স্বদেশী ভাবাবেগে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে বাঙ্গালীর চিত্ত। বাংলার মাটি বাংলার জল বাংলার বায়ু বাংলার ফল—পুণ্য হোক। বাঙ্গালীর প্রাণ বাঙ্গালীর মন বাঙ্গালীর ঘরে যত ভাই বোন—এক হোক, হে ভগবান : কবির প্রবুদ্ধ আহ্বানে বাংলার নরনারী সাড়া দিয়েছে।

আরেক দিকে, স্বাধীনতা লাভের সশস্ত্র পন্থা আকৃষ্ট করেছে দুঃসাহসী তরুণদের। বৃটিশ প্রভুত্বের উচ্ছেদ করতে নানা গুপ্ত সমিতির পত্তন হয়েছে। সে বিপ্লবী তৎপরতা শুধু স্বদেশেই সীমাবদ্ধ নয়। ভারতের বাইরেও দৃষ্টি পড়েছে বিপ্লবীদের। বিদেশে সমিতির কেন্দ্র স্থাপন ও স্বদেশে অস্ত্রাদি আমদানী তাঁদের লক্ষ্য ও কর্মসূচী। ইউরোপ,

আমেরিকা এবং এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলেও সে উদ্দেশ্যে আগে থেকেই তাঁরা যাত্রা আরম্ভ করেছেন।

শৃঙ্খল মোচনের সেই স্বপ্ন নিয়ে জাপানে পাড়ি দিলেন ধনগোপাল মুখোপাধ্যায়। বয়স তখন তাঁর ১৮ বছরও হয়নি।

কিছুদিন আগেই বর্মায় গেছেন তাঁর ভ্রাতা ক্ষীরোদ-গোপাল। তাঁদের জ্যেষ্ঠ যাদুগোপাল তখন বাহ্যত মেডিক্যাল কলেজের ছাত্র। কিন্তু গুপ্তভাবে একই দলীয়।

সেই গুপ্ত সমিতিরই একজন হিসেবে ধনগোপাল জাপানে পৌঁছলেন। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই দেখলেন, স্বপ্ন চরিতার্থ করা এদেশে অসম্ভব। তাঁদের কোন সংগঠন এখানে নেই কিংবা কারুর সঙ্গে যোগাযোগ। দেশহিতৈষণার কাজ কিছু করলেন। সেই সঙ্গে বিদ্যাশিক্ষাও হল কিছুদিন।

কয়েক মাস পরে ধনগোপাল জাপান ত্যাগ করলেন। চলে গেলেন আমেরিকা।

কিন্তু সেদেশেও কিছু সুবিধা করতে পারলেন না। বরং আরো বিপাকে পড়লেন ধনগোপাল। সমিতির কাজ দূরের কথা, আপনার অস্তিত্বই বিপন্ন হল। প্রাণ ধারণের সমস্যা দেখা দিলে কঠিন আকারে। মার্কিন দেশে নিঃসহায় নিঃসম্বল বাঙ্গালী তরুণ। কঠোর জীবন সংগ্রাম আরম্ভ করলেন।

দিন অতিবাহিত হতে লাগল অভূতপূর্ব অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে। কিন্তু শুধু বাঁচার জন্যেই প্রচেষ্টা নয়। সেই অবস্থাতেও বিদ্যাশিক্ষার লক্ষ্য ধনগোপালের ছিল। তাই জীবিকা অর্জন করতেন নানা কষ্টকর কায়িক শ্রমেও। কখনো হোটেলে, কখনো গৃহস্থ পরিবারে, কখনো বাগানে

পরিচারকের কাজ। শস্যক্ষেত্রে কৃষকের কর্মও সেই দুর্দিনে তাঁকে করতে হয়। কয়েক বছর পার হয়ে যায় এমনিভাবে।

সেই অবস্থার মধ্যেই তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি অর্জন করলেন। বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন ক্যালিফোর্নিয়ার স্ট্যান্‌ফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। তাঁর বিষয় ছিল—তুলনাত্মক সাহিত্য।

পরীক্ষার আগে তিনি নৈরাজ্যবাদীদের সংস্রবেও এসেছিলেন। যাতায়াত করতে থাকেন তাঁদের দলে। সেই নিয়ে যাদুগোপালের সঙ্গে তাঁর তীব্র বাদানুবাদ চলে পত্র মারফৎ। একমাত্র তাঁর সঙ্গেই ধনগোপালের যোগাযোগ ছিল। যাদুগোপালের যুক্তিতে তিনি ফিরে আসেন নৈরাজ্যবাদীদের প্রভাব থেকে, জাতীয়তার পথে।

প্রতিভা অতি প্রতিকূল পরিবেশেও আত্মপ্রকাশ করে। বিচিত্র তার গতি প্রকৃতি। তাই, বিদেশের সেই ছাত্রজীবনে দেখা দেয় ধনগোপালের অভিনব স্বরূপ। তাঁর কবি সাহিত্যিক সত্তা।

যাদুগোপাল সেকথা জেনে একটি নির্দেশ পাঠালেন, যা অমূল্য হয় তাঁর জীবনেঃ ধনগোপাল যেন আমেরিকাবাসীদের মন ভারতের দিকে আকর্ষণ করেন, রচনার মাধ্যমে।

ধনগোপালের অন্তর প্রেরণাও সেই লক্ষ্যপথে ছিল। তাঁর সাহিত্যের বিষয়-বস্তু হল—স্বদেশের মহান সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য।

মার্কিন মহাদেশে তাঁর লেখকজীবন আরম্ভ হল। খ্যাতিলাভ করতে লাগলেন কবি সাহিত্যিকরূপে। ক্রমে

আমেরিকার স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে পড়লেন। জীবনের গতি পরিবর্তিত হল অভাবিতভাবে। বিপ্লবী থেকে সাহিত্যিক।

ধনগোপালের বিস্ময়কর সাহিত্য-প্রতিভার স্ফূরণ এবং বিকাশ হতে লাগল। বিদেশে এবং বিদেশী ভাষার মাধ্যমে। সৃজনশীল প্রতিভার তাও এক বিচিত্র লীলা। স্বদেশে যিনি মাতৃভাষাতেও রচনা করেননি, ইংরেজীতে তাঁর লেখক-জীবন প্রকাশ পেল মার্কিন দেশে।

অবশ্য তা তাঁর বহিরঙ্গ পরিচয়। বাহ্যরূপ। তাঁর সৃষ্ট সাহিত্য হল ভাবে, বিষয়ে, অনুভবে, অন্তস্বর্রূপে স্বদেশাত্মার বাণী বিগ্রহ।

হয়ত তারই অনুষঙ্গে তাঁর প্রতিভা আরেকভাবে রূপায়িত হতে লাগল। তিনি বিখ্যাত হয়ে উঠলেন বক্তৃতা শক্তিতেও।

এই দুই গুণই ধনগোপালের দেশব্রত চিত্তের দুটি বাহন। পাশ্চাত্ত্য জগতে তাঁর অসাধারণ প্রতিষ্ঠা ও প্রসিদ্ধির দুই কারণ।

আমেরিকা থেকে ইউরোপেও তিনি খ্যাতনামা হলেন শক্তিধর লেখক ও বাগ্মী বলে। দেশপ্রেমিক ভারত সন্তান-রূপেই তাঁকে পাশ্চাত্যের শিক্ষিত সমাজ চিনলেন। যাঁর জীবনের ব্রত—অমরাত্মা ভারতের পরিচয় দান। রচনার প্রসাদগুণে স্বীকৃত হল তার সাহিত্যমূল্য। ভারতবর্ষের রূপ তিনি উদ্দীপিত প্রাণে পাশ্চাত্য জগতে চিত্রিত করতে লাগলেন।

ভারতের দর্শন ও ধর্ম, সভ্যতা ও সংস্কৃতি, শিক্ষা-দীক্ষা ও চিন্তাধারা, ভারতের গিরি নদী নগর তীর্থ অরণ্যানীর কথা তিনি উপস্থাপিত করলেন প্রতীচ্যবাসীদের কাছে। স্বদেশের

গৌরবময় সংস্কৃতিকে বিদেশীদের নিকটে শুধু পরিচিত নয়, মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত করাই তাঁর লক্ষ্য।

ধনগোপাল সম্পর্কে একটি যথার্থ উক্তি করেছিলেন—বিবেকানন্দের প্রতি ভক্তিমতী—মিস ম্যাকলাউড: 'After Vivekananda, Dhan has successfully interpreted India in America. His words are very popular.'

কুখ্যাতা মিস্ ক্যাথারিণ মেয়ো 'Mother India' পুস্তক লিখে পাশ্চাত্য জগতে ভারতের কুৎসা প্রচার করেছিলেন। ধনগোপাল আমেরিকাতেই তার সমুচিত জবাব দিলেন স্বরচিত 'A son of Mother India answers' গ্রন্থ প্রকাশ করে।

মিস মেয়োর বই সম্পর্কে গান্ধীজীর তীব্র মন্তব্য শোনা যায়: 'ড্রেন ইনস্‌পেক্টরের রিপোর্ট'। লালা লাজপৎ রায়ের 'Unhappy India', কে. এল. গম্বার 'Uncle Sam' ইত্যাদি পুস্তকও প্রচারিত হয় বটে। কিন্তু ধনগোপালের গ্রন্থটি বিপুল আলোড়ন সৃষ্টি করে পাশ্চাত্য জগতে। আমেরিকায় মাত্র আড়াই মাসে তার ১৭টি মুদ্রণ হয়েছিল!

ধনগোপালের 'Face of silence' পুস্তকখানি শ্রীরামকৃষ্ণের মাহাত্ম্য প্রচার করে প্রতীচ্যে। মনস্বী রমাঁ রলাঁ এ গ্রন্থ পাঠ করে মুগ্ধ হয়েছিলেন। এমনও কথিত আছে, শ্রীরামকৃষ্ণ সম্পর্কে তাঁর রচনার প্রেরণা পান পুস্তকটি অধ্যয়নের ফলে।

'Face of silence' পড়ে রলাঁ ধনগোপালকে পত্র

লিখেছিলেন, 'Mr. Mukherjee, what can I do to make you immortal in Europe ?'

ধনগোপাল উত্তর দেন, 'Nothing for me. Please make Ramakrishna and Vivekananda well known in Europe.'

ধনগোপালের 'Visit India with me' গ্রন্থখানি পাঠ করে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছিলেন মনীষী আর্ল ব্রিউস্টার ও তাঁর পত্নী। এই পুস্তক ভারতবর্ষের নানা তীর্থ ও নগরীর ভ্রমণ কাহিনী মাত্র নয়। ভারত-আত্মারও সন্ধানী। 'Visit India with me'-র তিন মাসের মধ্যেই চারটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়।

ধনগোপালের সাহিত্যকৃতি সম্পর্কে এই সব তথ্যই শেষ কথা বা সাহিত্যিক রূপে তাঁর যথার্থ পরিচয়ও নয়। তিনি ছিলেন সত্যকার সৃজনশীল লেখক। কবি এবং নাট্যকারও। সাহিত্যের প্রতিভা তাঁর বহুমুখী। তিনি কবিতা ও নাটক রচয়িতা, প্রাবন্ধিক ও জীবনীকার, ভ্রমণ কাহিনী লেখক এবং পুরাণ ব্যাখ্যাতা। তা ভিন্ন, তাঁর এক মহৎ পরিচয় শিশু-সাহিত্য স্রষ্টা রূপে।

শিশুসাহিত্য রচয়িতা ধনগোপাল আমেরিকায় অতিশয় যশস্বী হয়েছিলেন। তাঁর 'Gay Neck' পুস্তকটি ১৯২৭ সালের শ্রেষ্ঠ রচনা-স্বরূপ লাভ করে জন নিউবেরি পুরস্কার। এটি একটি পায়রার কাহিনী।

তাঁর শিশুসাহিত্য রচনার বিষয়বস্তুও ভারতীয়। তাঁর রচনা থেকে বিদেশী কিশোরপাঠকরা ভারতের জীবজন্তু, শিকারী, অরণ্যের মানুষ ও শিশুর অজ্ঞাতপূর্ব জগতের সন্ধান

পায়। প্রতীচ্যের বৃহত্তর পাঠক সমাজেরও অভিনন্দন লাভ করেছিল তাঁর রচিত শিশুসাহিত্য। যেমন (Gay Neck ভিন্ন)—

'Kari, the Elephant,' 'Jungle Beasts and Men,' 'Ghond, the Hunter,' 'Hari, the Jungle Lad.' 'The Chief of the Herd' ইত্যাদি।

ধনগোপাল একাধিক নাটকও রচনা করেছিলেন। তার অন্যতম 'Judgment of Indra.' Gollanx প্রকাশিত ৫০টি শ্রেষ্ঠ নাটকের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত আছে এটি।

গিরিশচন্দ্রের 'বিল্বমঙ্গল' নাটকের ইংরেজী অনুবাদ ধনগোপাল করেন 'Chintamani' নামে।

তাঁর একাধিক গ্রন্থ আত্মজীবন ও পরিবার সংক্রান্ত। যেমন 'My Brother's Face' পুস্তকে ভ্রাতা যাদুগোপালের বিপ্লবী জীবনের কিছু পরিচয় দিয়েছেন। সেই সঙ্গে নিজের বাল্যজীবন ও পারিবারিক প্রসঙ্গও।

ধনগোপালের বিদেশে আত্মপ্রতিষ্ঠার কঠোর সংগ্রামের আভাস পাওয়া যায় তাঁর 'Caste and Outcaste' থেকে। এই গ্রন্থ কিংবা অন্য কোন রচনায় তিনি গুপ্ত সমিতির সঙ্গে নিজের সংস্পর্শের কথা প্রকাশ করেননি। পরে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধারায় জীবনযাপনের জন্যে উহ্য থেকে যায় সেই সংক্ষিপ্ত প্রসঙ্গটি, প্রথম জীবনে যা ছিল প্রধান। পরবর্তীকালে তা গৌণ হয়ে অন্তরালে অদৃশ্য থাকে।

কিন্তু তিনি কিশোর বয়সেই সশস্ত্র পন্থায় উদ্‌বুদ্ধ হয়েছিলেন। আর সে বিপ্লবী ভাবের দীক্ষা পান আপন গৃহেই।

ভ্রাতাদের প্রভাবে। অগ্রজ মাখনগোপাল তাঁদের

নেতা। তাঁর অকাল-মৃত্যু ঘটে। কিন্তু ক্ষীরোদগোপাল, যাদুগোপাল (পরবর্তীকালে যুগান্তর দলের এক শীর্ষস্থানীয় নেতা) ও ধনগোপাল যুক্ত হন অনুশীলন সমিতিতে। তাঁরা তিন ভ্রাতাই সক্রিয় হয়ে ওঠেন। তাঁদের ধারণা হয়, ইংরেজদের বিতাড়িত করতে বিদেশী সাহায্য প্রয়োজন। সেই উদ্দেশ্যেই বিদেশে গুপ্ত সমিতি গঠনের কল্পনা। তারই কর্মসূচী অনুসারে ক্ষীরোদগোপাল যান বর্মায় এবং ধনগোপাল জাপান হয়ে আমেরিকায়। মেডিক্যাল কলেজের ছাত্র যাদুগোপাল গৃহেই থাকেন। তাঁর পরিকল্পনা ছিল, ডাক্তার হয়ে সেনাবাহিনীতে বিপ্লবী ভাবধারা প্রচার। সে প্রসঙ্গ পরে বর্ণনীয়।

ধনগোপালের উত্তর জীবনের কথা বলবার আগে তাঁর পারিবারিক পরিচয় উল্লেখ করা দরকার।

ধনগোপালের উর্ধ্বতন ষষ্ঠ পুরুষ থেকে তাঁরা কলকাতা নিবাসী, তার পূর্ববর্তী তাঁদের বাসস্থান ছিল বাঁকুড়ার মীর্জাপুরে। পূর্বপুরুষ রামহরি মুখোপাধ্যায় ছিলেন তৎকালীন বিষ্ণুপুর রাজার দেওয়ান। এ বংশ কামদেব পণ্ডিতের সন্তান এবং খড়দহ মেল।

ধনগোপালের পিতামহ রামবল্লভের চার পুত্র। কিশোরীলাল, পিয়ারীলাল, নৃত্যলাল এবং গৌরহরি। তাঁদের মধ্যে একাধিক কারণে বেশি খ্যাতিমান হন জ্যেষ্ঠ কিশোরীলাল ও কনিষ্ঠ গৌরহরি। কিশোরীলাল ধনগোপালের পিতা।

কলকাতার আহিরীটোলায় ৭, দাঁর গলিতে তাঁদের আদি বাড়ি। পরে কাছাকাছি ৬২, বেনেটোলা ষ্ট্রীটে আরেকটি

গৃহনির্মাণ করা হয়। বৃহৎ পরিবারের বাস হতে থাকে দুটি বাড়ীতে। দ্বিতীয় ঠিকানায় থাকতেন শুধু বিবাহিতেরা।

সেই একান্নবর্তী সংসারের কর্তারা উচ্চ আদর্শবাদী। স্বজাতি-প্রীতি এবং স্বদেশিকতার পরিমণ্ডল তাঁরা গৃহে সৃষ্টি করেছিলেন। বিশেষ কিশোরীলাল ও গৌরহরি।

অভিভাবকরা বৃত্তিতে প্রায় সকলেই আইনজীবী। কিন্তু তা বাহ্য। আপন আপন আদর্শের প্রেরণাতেই তাঁরা চলতে অভ্যস্ত ছিলেন। সাধারণ সংসারের সব ক্ষুদ্রতার ঊর্ধ্বে তাঁদের বিচরণ।

কিশোরীলাল ১১।১২ বছর মেদিনীপুরের তমলুকে থাকেন ওকালতী সূত্রে। তাঁর প্রকৃত জীবন সঙ্গীতসাধক-রূপে। সেজন্যে নানাস্থানের আসরে তিনি যোগ দিতে যেতেন। তখনকার বাংলার এক সুকণ্ঠ, গুণী ধ্রুপদী ছিলেন কিশোরীলাল। ভারত-বিখ্যাত ওস্তাদ মুরাদ আলী খাঁর বিশিষ্ট শিষ্য। মূরাদ আলী খাঁর গান ও অন্যান্য বর্ণনা ধনগোপাল My Brother's Face পুস্তকে করেছেন, প্রসঙ্গত বলা যায়। মূরাদ আলীর সূত্রে ময়ূরভঞ্জ রাজ-দরবারের বিখ্যাত ধ্রুপদ গায়ক (ও বীণ্‌কার) যদুনাথ রায় ছিলেন কিশোরীলালের গুরু-ভ্রাতা। ভাগলপুরের স্বনাম প্রসিদ্ধ গায়ক সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার (কর্মজীবনে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। সাহিত্যিকও) কিশোরীলালের কাছে কিছু কিছু সঙ্গীত শিক্ষা করেছিলেন। সঙ্গীতচর্চা ভিন্ন কিশোরীলালের একটি প্রিয় বিষয় ছিল, দেশ বিদেশের ইতিহাস পাঠ। বিশেষ স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রসঙ্গ। স্বভাবে তিনি ছিলেন উদার ও মহৎ হৃদয়ের মানুষ।

তাঁর তৃতীয় অনুজ নৃত্যলাল আলিপুর আদালতের কৃতী উকিল। তিনি অকৃতদার। উপার্জিত অর্থের একাংশ ব্যয় করতেন যৌথ পরিবারে। একাংশ দান করতেন রামকৃষ্ণ মিশনে। আরেক অংশ দুঃস্থদের সাহায্যে। নৃত্যলাল ক্যাশ বাক্সের চাবি রেখে দিতেন ভ্রাতুষ্পুত্র যাদুগোপালের কাছে। প্রয়োজন হলে চেয়ে নিতেন। যাদুগোপাল সে ক্যাশ বাক্সের সদ্ব্যবহার মাঝে মাঝে করতেন গুপ্ত সমিতির কাজে।

কনিষ্ঠ গৌরহরি পেশায় এ্যাটর্নি এবং একটি নেশায় সঙ্গীতজ্ঞ। বীণা সুরবাহার ও বেহালা বাদক। একবার তাঁর বেহালা বাদন শুনে এক সাহেব মুগ্ধ হন এবং তাঁকে উপহার দেন দু'টি ব্যাঘ্র শাবক। সে দুটিকে তিনি অনেকদিন বাড়িতেই পালন করেছিলেন। কিন্তু এ্যাটর্নী, যন্ত্র-বাদক গৌরহরির ছিল আরেকটি স্মরণীয় পরিচয়। দেশপ্রেমে উদ্‌বুদ্ধ ব্যায়ামাচার্য তিনি। জিম্‌ন্যাস্টিক ব্যায়ামের প্রচলন কলকাতা ও কাছাকছি অঞ্চলে তিনি অনেকদিন যাবৎ করেছিলেন। তরুণ বয়সে নিজে এই ব্যায়ামচর্চায় ব্রতী হন এক মিশরী জিমন্যাস্ট্ দলের দৃষ্টান্তে। তারপর দুর্বৃত্ত গোরা সৈন্যরা তাঁকে বাস্তব প্রেরণা দেয়। সেকালে মাতাল উচ্ছৃঙ্খল 'টমি'দের অত্যাচার ত্রাসের সঞ্চার করত বাঙ্গালী গৃহস্থ মহলে। এসপ্ল্যানেডকে কেন্দ্র করে দক্ষিণ ও উত্তর কলকাতা পর্যন্ত 'টমি'দের অবাধ দুরাচারের ক্ষেত্র ছিল। তাঁর প্রতিরোধে গোরাদের উত্তম মধ্যম শিক্ষা দেবার শুভ সঙ্কল্প নেন গৌরহরি। একটির পর একটি ব্যায়ামাগার স্থাপন করে বাঙ্গালী তরুণদের স্বাস্থ্য ও নৈতিক বলে

বলীয়ান করা লক্ষ্য ছিল তাঁর। গৌরহরির কার্যধারা প্রসারিত হয় কলকাতা ও সহরতলীর স্থানে স্থানে। এমন কি, হাওড়া ও হুগলী জেলায় পর্যন্ত তাঁর উদ্‌যোগে আখড়ার পত্তন হতে থাকে। তিনি স্বয়ং সে সব ব্যায়ামচর্চার কেন্দ্র পরিদর্শন করতে যেতেন মাঝে মাঝে। তরুণ মল্লদের উৎসাহ দিতেন। সে কালটি হল 'হিন্দু মেলা'র যুগ। অর্থাৎ বাংলার নবজাগ্রত জাতীয়তাবোধের কাল।

গৌরহরির কলকাতার এক শিষ্য হলেন মতিলাল বসু। Bose's Circus প্রবর্তন করে এ বিষয়ে যিনি একজন পথিকৃৎ হয়েছিলেন। সেই সার্কাসও তত্ত্বাবধান করতেন গৌরহরি।

এই পারিবারিক পরিবেশে বড় হন ধনগোপালরা। অথাৎ কিশোরীলালের পাঁচ পুত্র—ননীগোপাল (অল্পায়ু), মাখনগোপাল, ক্ষীরোদগোপাল, যাদুগোপাল, ধনগোপাল। তাঁরা বেশির ভাগ কলকাতাতেই থাকতেন। তাঁদের ছাত্র-জীবনও এখানে।

মাঝে মাঝে তাঁরা তমলুকে যেতেন পিতামাতার কাছে। সেখানে শিল্পী-প্রাণ, বিদ্যা ও সত্যে অনুরাগী পিতাকে দেখতেন। তিনি সন্তানদের সামনে এই আদর্শ তুলে ধরতেন, তারা যেন দেশহিতৈষী ও সুশীল হয়। বলতেন, 'শুধু টাকা রোজগার করে ধনী হও, এ আমি তোমাদের কাছে আশা করি না।'

তাঁদের জননীর চরিত্রও ছিল মহীয়সী। তীব্র তাঁর ন্যায় অন্যায়বোধ এবং উৎপীড়িত, দুর্গতিদের প্রতি গভীর সহানুভূতি। স্বাধীনতা-যুদ্ধের নানা কাহিনীতে আগ্রহ।

মাতার স্বভাবের এইসব বৈশিষ্ট্য ছিল। পুত্রদের সঙ্গে কথাবার্তায় এসব ভাব সঞ্চারিত হত তাঁদের চিত্তে।

তমলুকে পিতামাতা এবং কলকাতায় কাকাদের এমনি প্রভাব বালকদের চরিত্র সামগ্রিকভাবে গঠন করে দেয়।

আর, বিশ শতকের প্রারম্ভ থেকে সশস্ত্রপন্থার কথা ভেসে বেড়াত দেশের বাতাসে। তাই এই সচ্ছল সুখী পরিবারেও ঝড়ের সঙ্কেতধ্বনি এসে গেল। আদরের (তা তাঁদের নামকরণেই সুপ্রকাশ) সন্তানদের প্রাণে জাগল তার দুর্দমনীয় আহ্বান। মাখনগোপালই হলেন কনিষ্ঠদের প্রথম দীক্ষাগুরু। ভাইদের সঙ্গে তাঁর আলোচনা চলত—১৮৫৭-র মহাবিদ্রোহ ব্যর্থ হয়ে যায় জনসাধারণের সংযোগের অভাবে। এবার আর সে ভুল করা হবে না।

মাখনগোপালের ভাষাচর্চা বিষয়েও প্রতিভা ছিল। ফরাসী জর্মান ল্যাটিন ও সংস্কৃত তিনি আয়ত্ত করেছিলেন নিজের চেষ্টায়। তাঁর দুঃসাহসিক ভাবধারা ও বৈপ্লবিক আদর্শ কনিষ্ঠদের মনে গভীরভাবে অঙ্কিত করে দেন। ক্ষীরোদ, যাদু ও ধনগোপাল দীক্ষা নেন অগ্নি-মন্ত্রে।

১৯০৮ সালের ফেব্রুয়ারিতে মাখনগোপালের মৃত্যু হল, বসন্ত রোগে। কিন্তু ভ্রাতাদের দুর্জয় ধ্যান ধারণা বর্জিত হল না। তাদের মধ্যে যাদুগোপালের সঙ্গে অনুশীলন সমিতির সংযোগ হয়েছিল বেশি। বিশ্বস্ত কর্মী রূপে তিনি বাঘা যতীন্দ্রের সংস্পর্শেও এসেছিলেন। তবে তা ধনগোপালের বিদেশ যাত্রার পরে।

মাখনগোপালের মৃত্যুর কয়েক মাসের মধ্যেই তাঁদের নির্দিষ্ট কর্মসূচী অনুযায়ী কাজ হল। ক্ষীরোদগোপাল

গেলেন বর্মায়। ধনগোপাল জাপানে। দলের আরেকজন ভোলানাথ চট্টোপাধ্যায় শ্যামে। যাদুগোপাল বিদেশে যাননি, ডাক্তার হিসেবে ভারতীয় সৈন্যদলে বিপ্লববাদ প্রচার ও বৈপ্লবিক সংগঠন করবেন বলে।

শ্যামদেশ থেকে ভোলানাথ সাঙ্কেতিক চিঠি যাদু-গোপালকে পাঠাতেন, বর্মায় ক্ষীরোদগোপালের মধ্যস্থতায়।

ক্ষীরোদগোপাল প্রথমে রেঙ্গুনে ও পরে মিচিনায় অবস্থান করতেন। কিছু বর্মীকে তিনি ভারতীয় বিপ্লবীদের প্রতি সহানুভূতি-সম্পন্ন করেছিলেন ১৯১৫ সালের শেষ দিকে। পরে বাংলার যে বৈপ্লবিক কর্মীরা বর্মায় যান, ক্ষীরোদগোপাল তাঁদের জন্যে ক্ষেত্র খানিকটা প্রস্তুত করে রেখেছিলেন, বলা যায়।

শেষে পাঠান সর্দার মাসিদি খাঁর সাহায্যে অস্ত্র সংগ্রহের চেষ্টা করেন ক্ষীরোদগোপাল। তখনই তিনি গ্রেপ্তার ও অন্তরীণ হন।

তাঁর বর্মা-জীবনের একটি সংবাদ আছে যা রীতিমত উল্লেখনীয়। তখনকার বর্মা প্রবাসী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে রেঙ্গুনে তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়েছিল। বাংলার তৎকালীন প্রবাসী ও অন্যান্য বিপ্লবীদের নানা বিবরণ শরৎচন্দ্র পান ক্ষীরোদগোপালের নিকটে। এশিয়ার বিভিন্ন দেশ জুড়ে যে অসমসাহসী বাঙ্গালী তরুণের দল গুপ্তসমিতি গঠন করছেন, এসব চমকপ্রদ খবরও শরৎচন্দ্র তাঁর কাছে জানতে পারেন। পরে সেই উপাদান তিনি ব্যবহার করেন 'পথের দাবী' রচনায়। ক্ষীরোদগোপাল যুগপৎ দুহাতে দুই রিভল্‌ভার চালাতে পারতেন। শরৎচন্দ্রের 'সব্যসাচী'রও দেখা যায় এই

নৈপুণ্য। 'সব্যসাচী' যে ক্ষীরোদগোপালের আদর্শে গঠিত, তা অবশ্যই নয়। শরৎচন্দ্রের সম্পর্কিত মাতুল, বিপ্লবী বিপিন বিহারী গঙ্গোপাধ্যায়েরও একসঙ্গে দুহাতে পিস্তল চালনার কথা জানা থাকতে পারে তাঁর। শোনা যায়, মানবেন্দ্রনাথ রায়ের প্রথম জীবনের কিছু প্রতিফলনও আছে 'সব্যসাচী' চরিত্রে। অবশ্যই শরৎচন্দ্রের বিচিত্র কল্পনা-শক্তি ও প্রতিভা-দীপ্ত কথাশিল্পই তাঁর সাহিত্য-সৃষ্টির মূল। তবে 'পথের দাবী'র উপকরণ সংগ্রহে কথাশিল্পী যে বর্মা প্রবাসী বিপ্লবী ক্ষীরোদগোপালের কাছে ঋণী, একথায় ব্যত্যয় নেই। আর বর্মা শ্যাম ইত্যাদি গুপ্তকেন্দ্রের অন্যতম নেতৃস্থানীয় এবং সেকালের আদর্শ-চরিত্র, উৎসর্গীকৃত-প্রাণ বিপ্লবীর দৃষ্টান্ত স্বরূপ ক্ষীরোদগোপালও কিছু ছাপ রাখতে পারেন 'সব্যসাচী' গঠনে।

বর্মায় অন্তরীণ-জীবন সমাপ্তির পর ক্ষীরোদগোপাল কলকাতায় ফিরে এসেছিলেন। পুনরায় স্বগৃহে নজর-বন্দী হন ১৯১৯ সালে। কিন্তু সেই অবস্থায় যে সন্ন্যাসী হয়ে নিরুদ্দেশ হয়েছিলেন, আর তাঁর সন্ধান পাওয়া যায়নি। যাদুগোপাল গৃহে আসেন ১৯২১ সালে, ছ বছর আত্ম-গোপনের পর। তিনিও ক্ষীরোদগোপালের নানাভাবে অন্বেষণ করেছিলেন। কিন্তু কোন উদ্দেশ মেলেনি ক্ষীরোদ-গোপালের।

ধনগোপালের পারিবারিক প্রসঙ্গ এই পর্যন্ত। এখন তাঁর জীবন-কথা। ১৮৯০ সালের জুলাই মাসে তাঁর জন্ম। পিতার কর্মস্থান তমলুক তাঁর জন্মস্থান। প্রথম শিক্ষাও সেখানকার বাংলা বিদ্যালয়ে। তারপর কলকাতায় নিমতলা

স্ট্রীটের ডাফ কলেজিয়েট স্কুলে পড়ে সেখান থেকেই প্রবেশিকা পরীক্ষা দেন (১৯০৮)।

ডাফ স্কুলের সময়েই ক্ষীরোদগোপাল ও যাদুগোপালের সঙ্গী হয়ে ধনগোপালেরও সংযোগ ঘটে বিপ্লবী দলে। যাদুগোপাল স্বল্পভাষী ও চাপা স্বভাবের ছিলেন। সেজন্যে তাঁর মতিগতি গুরুজনেরা কিছুই জানতে পারেননি, একেবারে বাড়ি তল্লাসীর আগে পর্যন্ত। কিন্তু ধনগোপালের প্রকৃতি ছিল ভাবপ্রবণ, আবেগপূর্ণ। তিনি একেকদিন পকেটে ভরে পিস্তল আনতেন। বাড়িতে দেখিয়ে জানিয়ে দিতেন, ভালভাবেই চলেছে ইংরেজ বিতাড়নের আয়োজন।......

বঙ্গ ভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে বাংলাদেশে তখন অপূর্ব উন্মাদনা সৃষ্টি হয়েছে। সেই ভাবধারায় ধনগোপালও অনু-প্রাণিত। গুপ্ত সমিতির সশস্ত্র উপায়ের সঙ্গে স্বদেশ মন্ত্রেও উদ্দীপিত। স্কুল জীবনেই তাঁর সে উৎসাহ প্রকাশ পায় নানাভাবে।

স্বদেশী দ্রব্য প্রচারের জন্যে তিনি তৎপর হয়ে ওঠেন। বিপিনচন্দ্র পাল প্রমুখ নেতাদের সভায় উপস্থিত থাকতেন তিনি। বক্তৃতা শেষ হলেই ধনগোপাল সকলকে স্বদেশজাত সব কিছু কেনবার জন্যে আবেদন জানাতেন। শ্রোতাদের উদ্দেশে তিনিও প্রায় বক্তৃতা দিতেন প্রাণের আবেগে, 'স্বদেশী জিনিষ কিনে দেশমাতার বুকে বল দিন। নেতাদের মুখ রক্ষা করুন। আপনারা যে আর গোলাম থাকতে চান না তার পরিচয় দিন।'

শুধু বক্তৃতা নয়। পাশেই রেখে দিতেন দেশী গেঞ্জী

মোজা ইত্যাদি সামগ্রী। সেসব বিনা লাভে বিক্রয় করতেন, কেবল স্বদেশী প্রচারের জন্যে।

সেসময় (১৯০৭) ইংরেজ সরকার 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনি নিষিদ্ধ করে দেয়। ডাফ কলেজিয়েট স্কুলে তখন প্রতি ঘণ্টায় ছুটি থাকত পাঁচ মিনিট। ছাত্ররা সেই পাঁচ মিনিট সমবেত কণ্ঠে 'বন্দে মাতরম্' উচ্চারণ করত। ধনগোপাল সে অনুষ্ঠানের এক উদ্‌যোগ কর্তা।

তখন সভাস্থলে 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনি করলে পুলিশের নির্যাতন ভোগ করতে হত। একদিন বীডন গার্ডেনের (রবীন্দ্র কানন) একটি সভা এই কারণে লাঠি চালনা করে ভেঙ্গে দেয় পুলিশ। উপস্থিত ব্যক্তিদের টাকা, ঘড়ি ইত্যাদি গুণ্ডাদের সাহায্যে লুঠ করায়। পরের দিন থেকে ইংরেজ সার্জেন্টরা আতঙ্ক সৃষ্টি করে চিৎপুরের ওই অঞ্চলে। 'বন্দে মাতরম্' শুনলেই বেদম প্রহার করতে থাকে। ধনগোপাল একদিন এই মন্ত্র ধ্বনি করেন রাস্তায় দাঁড়িয়ে। তৎক্ষণাৎ সার্জেন্টরা তাঁকে লাঠির ঘায়ে ভূপাতিত করে। তারই প্রতি-ক্রিয়ায় জেদ চাপে তাঁর ভ্রাতা ও বন্ধুদের মনে। বেনেটোলা স্ট্রীট ও চিৎপুর রোডের মোড়ে তাঁরা 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনি করতে থাকেন। সার্জেন্টরাও আক্রমণ করতে ঢুকে পড়ে বেনেটোলা স্ট্রীটের মধ্যে। ছেলেদের সঙ্গে তাদের প্রকাশ্য সংঘর্ষ বেঁধে যায়। তার একটি ফল—ওয়াল্টার নামে সার্জেন্টের ডান হাতের পাঞ্জা কাটা পড়ে একেবারে। সে-দিনটা ছিল ৪, অক্টোবর, ১৯০৭। পরের দিন ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের 'সন্ধ্যা' পত্রিকায় সংবাদটি দেখা যায় 'ফিরিঙ্গির থাবা সাবাড়' শিরোনামে। ইংরেজ সার্জেন্টের এইভাবে হাত

কাটার মামলা হাইকোর্টে সেসন পর্যন্ত যায়। সেখানে সক্রিয় কর্মীরা মুক্তি পান আর সাজা হয় এক নিরীহ নিষ্কর্মার।

এমনিভাবে ধনগোপালের স্কুল জীবন অতিবাহিত হতে থাকে। প্রবেশিকা পরীক্ষা দেন ১৯০৮ সালে। আর তার ফল বেরুবার আগেই ৬২, বেনেটোলার বাড়ি থেকে জাপান যাত্রা করেন।

জাপানে কিছুদিন দেশহিতৈষণার কাজ আর সেই সঙ্গে বিদ্যাশিক্ষাও কিছু করেছিলেন বটে। কিন্তু সুবিধা না হওয়ায় আমেরিকায় চলে যান। সেখানে তাঁর প্রথম অবস্থা ও প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয়েছে আগেই। ১৯১২/১৩ সাল থেকে মার্কিন দেশে লেখক ও বাগ্মীরূপে তাঁর খ্যাতি অর্জনের সূচনা। ধনগোপালের সাহিত্য-রচনা ও বক্তৃতা দুয়েরই ধ্রুব তারা হয়ে থাকে—বাংলা দেশ, ভারতবর্ষ, স্বদেশ।

ধনগোপালের প্রথম প্রকাশিত বই--কবিতা। নাম 'Rajani'. তার Foreward-এও তিনি আপন মানস লোকের আভাস কবির ভাষাতেই দেন: 'In writing these poems, the spirit and music of my own language, Bengali, have overlapped the English metre. No desire for experiment has created them. They came···into the shadow light garment of the dying day...in the image of my own beloved Bengal.'

তাঁর দ্বিতীয় পুস্তক—নাটক 'Layla Majnu.'—একই বছরে (১৯১৬) প্রকাশ পায়।

তারপর থেকে প্রবন্ধ, ভ্রমণ কাহিনী, আত্মজীবনী, শিশু

সাহিত্য ইত্যাদিতে বহু-বিচিত্র তাঁর সাহিত্য-কর্ম রূপায়িত হতে থাকে দীর্ঘ ২০ বছর যাবৎ।

ধনগোপাল মার্কিন দেশের স্থায়ী বাসিন্দা হন। বিবাহ করেন এথেল রে ডুগান নামে আমেরিকান চিত্রশিল্পী মহিলাকে। তাঁদের একমাত্র পুত্রের নামও ধন মুখার্জী।

ধনগোপাল পরে দু'বার স্বদেশে এসেছিলেন। ১৯২২ ও ১৯৩০ সালে। দুবারই অবস্থান করেন বেলুড় মঠে। তবে কলকাতার পারিবারিক গৃহে যাতায়াত করতেন।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্যে শান্তিনিকেতনেও গিয়েছিলেন ধনগোপাল।

১৯২২ সালে ধনগোপাল বাংলার অনেক সাহিত্যিকের সঙ্গে আলাপ পরিচয় করেন 'ভারতী' পত্রিকার কার্যালয়ে, সুকিয়াস স্ট্রীটে। তাঁর বন্ধু, সাহিত্যিক সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁকে সেই সাহিত্য গোষ্ঠীতে নিয়ে আসেন। সুরেশচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর প্রথম পরিচয় হয় জাপানে। ধনগোপালের কয়েকটি বই সুরেশচন্দ্র বাংলায় অনুবাদ করেন। Gay Neck থেকে 'চিত্রগ্রীব'। The Chief of the Herd থেকে 'যূথপতি'। Caste and Outcaste থেকে আংশিকভাবে 'ঘরের ছেলে বাহিরে'।

১৯২২ সালের ধনগোপালের একটি লিপি-চিত্র রেখে গেছেন হেমেন্দ্রকুমার রায়, 'ভারতী' গোষ্ঠীর বিশিষ্ট লেখক। 'যাঁদের দেখেছি' গ্রন্থে (২২৩-২৪) পৃষ্ঠা তিনি বর্ণনা করেছেন,—'একদিন সবাই মিলে 'ভারতী' কার্য্যালয়ের ত্রিতলের বৈঠকে বসে গুলতান করছি, এমন সময়ে সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় একটি যুবককে নিয়ে ঘরের ভিতর প্রবেশ করলেন এবং এই

বলে আগন্তুকের পরিচয় দিলেনঃ নাম ধনগোপাল মুখোপাধ্যায়। নিবাস আমেরিকায়। পেশায় লেখক। বারো বৎসর পরে (১৪ বছর—বর্তমান লেখক) আবার নিজের দেশকে দেখতে এসেছেন।

অবাক হয়ে ধনগোপালের দিকে তাকিয়ে রইলুম। এই কি যুগব্যাপী সাহেবীয়ানার শরীরী দৃষ্টান্ত ? নগ্নগায়ে জড়ানো একখানা উড়ানি, পরনে মোটা কাপড়, পাদুকাবিহীন পদ-যুগল—অশৌচের বেশ।

আমাদের মুখ দেখে মনের ভাব বুঝে ধনগোপাল মৃদু হেসে বল্‌লেন, 'নিজের দেশে ময়ূরপুচ্ছের ভার আর সইল না। হ্যাট-কোট-বুট ছেড়ে বড় আরাম পাচ্ছি।'

রংটি ময়লা। মুখশ্রী মাঝামাঝি। চোখে বুদ্ধি ও চিন্তাশীলতার ছাপ। চেহারা না দোহারা, না একহারা।

শুনলুম এখানে এসে তিনি উঠেছেন বেলুড় মঠে। সেখান থেকে প্রায়ই আসতেন আমাদের বৈঠকে এবং দুদিনেই হয়ে উঠ্‌লেন নিজের লোকের মত। অতি সদালাপী। মুখরও নন, গম্ভীরও নন। কথা বলেন মৃদুস্বরে। হাব-ভাব ভাষণে পরিচয় পাওয়া যায় বিশেষ একটি সংস্কৃতির।

কেবল আমেরিকায় নয়, ইংলণ্ডেও গিয়ে বহুস্থানে বক্তৃতা দিয়ে তিনি যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছিলেন। তাঁর মুখে আমরা পাশ্চাত্ত্য সাহিত্য ও সাহিত্যিকদের কথা জানবার জন্যে যতটা আগ্রহ প্রকাশ করতুম, তিনিও ঠিক ততটাই আগ্রহ দেখাতেন আধুনিক বাংলা সাহিত্যের কথা শোনবার জন্যে।

তাঁর সঙ্গে একদিন কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট দিয়ে যাচ্ছি, হঠাৎ একখানা বাড়ির দেওয়ালে বাংলা রঙ্গালয়ের বিজ্ঞাপন দেখে বললেন, 'সেই ছেলেবেলায় কবে বাংলা থিয়েটার দেখেছিলুম, জানিনা এখানকার্ থিয়েটারের অবস্থা এখন কি রকম।'

আমি বললুম, 'একদিন থিয়েটার দেখতে চান তো আপনাকে নিয়ে যেতে পারি।'

তিনি রাজি হলেন।

তাঁকে নিয়ে গেলুম মিনার্ভা থিয়েটারে। কি নাটকের অভিনয় হচ্ছিল মনে নেই, তবে কুশীলবদের মধ্যে ছিলেন রাধিকানন্দ মুখোপাধ্যায় ও নরেশচন্দ্র মিত্র। তাঁদের অভিনয় দেখে খুব খুশি হয়ে ধনগোপাল বললেন, 'দেখছি বাংলা থিয়েটারে বেশ ভালো অভিনয়ই হয়।'

ভেবেছিলুম তাঁকে একদিন শ্রীশিশিরকুমার ভাদুড়ির অভিনয় দেখাতে নিয়ে যাব, তিনি তখন ম্যাডানদের রঙ্গমঞ্চে আলমগীর ভূমিকায় অভিনয় করতেন। কিন্তু সে সুযোগ আর হয়ে ওঠেনি—কারণ তারপরেই ধনগোপাল কলকাতা থেকে চলে যান।'…

সেসময় ধনগোপাল নিজেদের বাড়িতেও যেতেন আত্মীয় স্বজনদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্যে। অগ্রজ যাদুগোপালের সঙ্গেও তখন দীর্ঘকাল পরে তাঁর দেখা হয়।

আর যাঁদের সঙ্গে ধনগোপাল আলাপ পরিচয় করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে পণ্ডিত-প্রবর অর্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়ের নাম উল্লেখনীয়। ধনগোপাল অর্ধেন্দ্রকুমারের সঙ্গে এই সাক্ষাতের প্রসঙ্গ তাঁর My Brother's Face গ্রন্থে বিবৃত করেছেন। গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ও ধনগোপাল

সম্পর্কে সেদিনের স্মৃতিকথা বলেছেন আত্মজীবনী 'ভারতের শিল্প ও আমার কথা' পুস্তকে-অর্ধেন্দ্রকুমারের সেই স্মৃতিচারণে আছে—'ধনগোপাল ছিলেন অদ্ভুত ধরনের উচ্চ মনীষার মানুষ। ইংরেজী ভাষায় তাঁর পাণ্ডিত্য ছিল বিস্ময়কর। আমেরিকার বিভিন্ন স্টেটে অবনীন্দ্র-রীতির চিত্র প্রদর্শনী প্রেরণের ব্যাপারে তিনি আমাকে প্রচুর পরামর্শ ও সাহায্য দিয়েছিলেন চিঠির মাধ্যমে। তিনি ছিলেন একজন অনন্য সাধারণ প্রকৃতির সাংস্কৃতিবান পুরুষ। সুদূর বিদেশে বসেও স্বদেশের শিল্প সাহিত্য সম্বন্ধে যথেষ্ট খোঁজ খবর রাখতেন, পড়াশুনা করতেন। শিল্পে অনুরাগ বশতই তিনি আমার রূপম পত্রিকার হয়েছিলেন একজন গুণমুগ্ধ ও সহৃদয় পাঠক। তা জেনেছিলাম তাঁরই চিঠিতে। তারপরে তিনি ভারত-ভ্রমণে এলেন। ···শেষ বারে এসে তিনি আমার বড়বাজারের বাড়িতে এলেন আমার সঙ্গে দেখা করতে। ···ধনগোপালের সঙ্গে প্রায় সারা সকালটা কাটিয়েছিলাম নানা আলোচনা করে, বিশেষ করে কলাশিল্প সম্বন্ধে। ······দেশ-বিদেশের চারুকলা সম্বন্ধে তাঁর আগ্রহ ও জ্ঞান ছিল সুগভীর। অদ্ভুত ছিল তাঁর ধীশক্তি ও আলোচনার ভঙ্গী। ···তারপরে দু-তিন বছর কেটে গেল। ১৯২৫ সালে ধনগোপাল মুখার্জীর··· 'My Brother's Face' বইখানি আমার হাতে এসে গেল। পাতার পর পাতা পড়ে যাচ্ছি। ইংরাজী ভাষায় উঁচুদরের বিন্যাস দেখে মুগ্ধ হয়ে গেলাম। ···২৩২ পৃষ্ঠায় পৌঁছুতেই দেখতে পেলাম আমার সঙ্গে তাঁর কলকাতায় সাক্ষাৎকারের ঘটনাটি লিপিবদ্ধ করেছেন তিনি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে। ··· বিস্মিত হয়েছিলাম এই দেখে যে, একটি দিনে তিনি সামান্য

দু'এক ঘণ্টার মধ্যে আমার বাড়ির পরিবেশ, আমাকে এবং আমার সমস্ত আদর্শ ও চিন্তাধারাকে এমন ভাবে খুঁটিয়ে দেখেছিলেন ও উপলব্ধি করেছিলেন, যা দু তিন বছর পরেও হুবহু বর্ণনা করতে তিনি এতটুকু আড়ষ্টতার পরিচয় দেননি। ··যেন আমার জীবনের কয়েকখানি ঝরাপাতাই গ্রথিত হয়েছে তাঁর সেই বইখানির মধ্যে।'

আমেরিকায় প্রত্যাগত হবার পরের পর্যায়েও ধনগোপালের জীবন বিপুল সার্থকতায় মণ্ডিত হয়েছিল। আপন বিশিষ্ট ধারায় সৃজনশীল লেখক, মনস্বী ও বাগ্মীরূপে প্রতীচ্য জগতে অতি গৌরবের আসন লাভ করেছিলেন তিনি।

কিন্তু তাঁর স্বদেশের দুর্ভাগ্য যে পূর্ণ পরিণতির পূর্বেই এই সুসন্তানের জীবন কালগ্রাসে পড়ে। বিধির বিধানে টেনে দেওয়া অপূর্ণতার ছেদ। আরো পরিতাপের বিষয়, তাঁর মৃত্যু ঘটে যেমন আকস্মিক তেমনি শোচনীয়ভাবে।

স্নায়বিক বিকলতায় অসুস্থ দেহে ধনগোপাল আত্মহত্যা করেন।

তাঁর মৃত্যুসংবাদ এইভাবে আমেরিকার সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়:

"New York, July 15, 1936

Mr. Dhan Gopal Mukherji, lecturer, writer and author of the book entitled "A son of Mother India Answers", which replies to Miss Katherine Mayo's "Mother India", found hanged in his Manhattan apartment by his American wife.

Mr. Mukherji, aged 45, had a nervous breakdown some weeks ago, said to be due to over work. Reuter"

মৃত্যুর মাস দেড়েক পূর্বে প্রিয় অগ্রজ যাদুগোপালকে এই শেষ পত্র ধনগোপাল লিখেছিলেন—

D. G. Mukherjee May 25
325 East 72nd Street
New york
Dr. J. G. Mukherjee,
Dear old man,

Your composition is excellent, it is the best, for it is sincerity made articulate. এরকম সন্দর্ভ বড় শক্ত। বক্তা লোকের রচনার বাহিরে।

About money matters I have written you enough. So shan't waste your time now by repeating what I wrote in the past. You surely have been just and generous to me at the expense of your own interest. I thank you.

গঙ্গাধর (১) মহারাজের শরীরে এখন শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রী মা, স্বামীজী (২) মহারাজ এবং মহাপুরুষ (৩) আছেন। ধরা

১। স্বামী অখণ্ডানন্দ—শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যতম শিষ্য এবং বেলুড় মঠ ও মিশনের সভাপতি।
২। স্বামী বিবেকানন্দ।
৩। মহাপুরুষ মহারাজ বা স্বামী শিবানন্দ—শ্রীরামকৃষ্ণের শিষ্য। বেলুড় মঠ ও মিশনের তৃতীয় সভাপতি।

সকলকে দেননা। তুমি দেখনা একবার। কাকেও এসব ব্যাপার বোলো না। "Those who have ears to hear shall hear." And those who have eyes to see shall see. You need not take my word. Go & examine with your sharpest judgment. Then tell me who Akhandananda is!

সেজদাদাকে (৪) দেখা সহজ নয়। সে সাধুলোক, ধরা দেবে কেন। দেখলে হয়ত সাংসারিক সংস্কার ভয় দেখাবে। কাজেই মঠে ফঠে কোথাও তাঁর নাম করে দিন যাপন করছে। খুব চালাক লোক। এখানে সব কুশল। ইতি

দাস

ধনগোপাল

তার পর, মৃত্যুর মাত্র দু'দিন পূর্বে স্বামী অখণ্ডানন্দকে নীচের চিঠিখানি ধনগোপাল লেখেন। এই চিঠিটি অভি-নিবেশের সঙ্গে পড়বার মতন। এখানে তাঁর প্রথম জীবনের আধ্যাত্মভাবের স্ফুরণ ও পরিণতি এবং অন্তিম জীবনের মানসিক দ্বন্দ্বের পরিচয় পাওয়া যায়। এখানিই তাঁর শেষ পত্র এবং সম্ভবত শেষ রচনাও।—

'প্রভু,

আপনার চরণে কোটি কোটি সাষ্টাঙ্গ প্রণাম। আপনার (June 17) ৩রা আষাঢ়ের পত্র পেলাম। আপনার দান গেরুয়া পেয়েছি। কেন যে ধন্যবাদাত্মক পত্রটা, যা লিখে-ছিলাম, আপনি পাননি বুঝলাম না। ঐ গেরুয়া সম্বন্ধে খুব

৪। ক্ষীরোদগোপাল মুখোপাধ্যায়, ধনগোপালের তৃতীয়

লিখেছিলাম, বিশ্বাস—ডাকে পড়েছিল, তবু চিঠি হারালো। অন্যকে দোষ না দিয়ে নিজেকে দোষ দেওয়া ভাল। গেরুয়া পেয়ে যে আমি আপ্যায়িত তা আপনি জ্ঞাত। বাবাও কৃপা করে এক গেরুয়া দিয়ে গেছেন। তাঁর শ্রীপদাঙ্ক ও গেরুয়া আমার সম্বল। এখন আপনার গেরুয়া জুটিল। একটা পদাঙ্ক যদি কৃপা করে পাঠান। আপনার পত্রগুলি কি ঈশ্বরীয় ভাব উদ্দীপক। যা-মন বসে ধ্যানে সে ঐ পত্র ছুঁয়ে। আপনার কৃপা। এখন আজ ৩রা আষাঢ়ের (June 17) পত্র চর্চা করি। আপনি লিখেছেন, "তুমি বাবার মত হতে চাও, না তাঁর উপযুক্ত ছেলের মত হতে চাও ?"

ভেবে উত্তর দেব কি ? ঐ পত্র আপনার হাত থেকে ছাড়ার পর এক ভাবনা এসে গেছে। "বাবার মত সাধু হব" এইটা ভাবি। এখন বুঝছি যে আপনি ভাবান। আমার সাধ্য কি ঐ idea মনে আনি। আপনি এনেছেন।

মন মাসখানেক ঐ চর্চা কচ্ছিল। "এত সাধু দেখলাম।" কিন্তু বাবার মত কেউ নাই। বাবা—শ্রীশ্রীঠাকুরকে resembles the most· তিনি কামিনী কি পুরুষ চেনা দায়। দুই ভাব পূর্ণ প্রকাশ কচ্ছেন। "বাবার মত সাধু হতে হবে।" এ চিন্তা আর থামে না। এখন বুঝলাম কোথা হতে ঐ সুর উঠে আমায় ভাসাইয়া প্রভুর উদ্দেশ্যে পাঠাইল। কি উত্তম স্রোত, কি আনন্দময় উদ্দেশ্য। আপনার কৃপা আমায় আপ্লুত করে রেখেছে। কৃপা করুন।

আমি প্রস্তুত। এখন বাবার মত হতেই হবে। ঐ কৃপা করে' আমার জন্ম সার্থক করুন। কৃপা করুন। বাবার বিষয় এত বলবার আছে। আমি যখন এ দেশে labourer,

1910, হয়ে আসি, ও খাটি, বড় কষ্ট পেয়েছিলাম। কষ্টের দু' এক ফোঁটা জল চোখ থেকে ভগবানের জন্যে পড়েনি। কিন্তু self-pity বড্ড বেড়েছিল। At last I prayed to God for relief. ১৯১৩ জুলাই মাস শেষ হতে (Thibant's translation of Sankara Vasya Vedanta Sutra পড়া পর্য্যন্ত ১৯১৩ November or thereabout) রাস্তা খুল্‌লো। Labourer এর কাজ শেষ করে মসীজীবী হলাম। তারপর বুড়ী Tantine এলো when I got my B. A. 1914. বুড়ী বল্লে যে স্বামীজী ও শ্রীশ্রী শঙ্কর এক। আমি বললাম, "সত্য বোধ হয়।" My uplift began when I had read Vedanta Sutra here and there. বুড়ী নিয়ে গেল বাবার কাছে ১৯২২, যখন আপনি দেখেছিলেন। বাবার নাম শিবানন্দ, শঙ্কর শিব, বন্দে বোধোময়ং নিত্যং গুরুম শঙ্কর-রূপীনম।

তারপর আর এক কথা সব তীর্থের থেকে, মনে পড়ে—তারকেশ্বর। খুব ছেলেবেলায় বার বছর বয়সে সেথায় গিছলাম। এখনো মন সেথা যায়। সেটা বাবার জায়গা। তিনি শিব। আমি জানি না কে শঙ্কর। কিন্তু জানি বাবা শিব। মঙ্গল ও আনন্দ বর্ধন করবার জন্যে দেহ ধারণ করেছিলেন। শিবং কেবলং ভাষকং ভাষকানাং।

আমি তাঁর মত হব। আমি তাঁর উপযুক্ত সন্তান হব। ঐ দুটি আপনি কৃপা করে পূর্ণ করে' দিন। কৃপা করুন।

কোথায় শ্রীশ্রীতারকেশ্বর যেখানে মানসচক্ষু এখনো দেখছে কত লোকে হত্যা দিয়ে শুয়ে আছে—আর

কোথায় New York sweating in the hottest July 11th on record—আর কোথায় সারগাছি যেখানে, আর কি লিখব? It is midnight; 12th July 1936. I feel reborn with the new born day.

এখন বলুন আপনি কে? ভাবরাজ্যের সম্রাট ছদ্মবেশে বসে আছেন সারগাছিতে। আমি যদি আসি ওখানে, চোখে ঐ শ্রীঅঙ্গে তাঁকে দেখবো। এবং বাবাকেও দেখবো। আপনার পত্রে বলেছেন ভেবে চিঠি দিতে। দেখি, আমি তৈরী। ভেবে ঠিক করে বসে আছি। ঠিক করে রেখেছেন, আমি আছি। কে করেছেন সে আপনি জ্ঞাত। আমি যন্ত্র মাত্র।

উত্তর আপনি যা দেওয়ালেন, তাই দিলাম। আমার সাধ্য কি অমন পত্রের উত্তর দিই। কৃপা করুন। আমায় কৃপা করুন। প্রভু কৃপা করুন। আমি প্রস্তুত। আমি শরণাগত, প্রভু, শরণাগত, প্রভু, শরণাগত। আপনার শ্রীচরণে কোটি কোটি সাষ্টাঙ্গ প্রণাম।

ইতি

দাস

(স্বাঃ) ধনগোপাল

পুনশ্চঃ আমি বিশ ডলার দক্ষিণা এই পত্রে দিলাম।'

ধনগোপালের রচিত গ্রন্থাবলীর (সম্ভবত অসম্পূর্ণ) তালিকা :—

(1) Rajani—Songs of the night. (Introduction by D. S. Jordan). San Francisco, 1916. (2) Layla Majnu—musical play in

three acts (Introduction by A. W. Hope) San Francisco, 1916. (3) Caste and Outcast. London, 1923. (4) Jungle Beasts and Men. Illustrated. New York, 1924. (5) My Brother's Face, London, 1925. (6) Gay Neck—the story of a pigeon Illustrated. New York 1927. (7) A Son of Mother India Answers. New York, 1928. (8) Visit India with Me (with maps and illustrations). New York, 1929. (9) Devotional Passages from the Hindu Bible. New York, 1929. (10) The Face of Silence. New York. (11) Ghond, the Hunter. Illustrated. London, 1930. (12) Disillusioned India. New York, 1930. (13) Rama, the Hero of India. Valmiki's Ramayana done into a short English version for boys & girls. Illustrated. London, 1931. (14) The Chief of the Herd. Illustrated. London. (15) Bhagavadgita—the song of God, translation of Bhagavadgita. (16) Kari, the Elephant. Illustrated. (17) Hari, the Jungle Lad. Illustrated. (18) Judgment of Indra. (19) Chintamani.

গল্পদাদা

'হ্যালো চিল্‌ড্রেন, গুড ইভনিং! গল্পদাদা স্পীকিং। গল্পদাদা কথা বল্‌ছে। শুনতে পাচ্ছ? পালিও না, পালিও না, পালিও না...'

এক স্নিগ্ধ সানন্দ কণ্ঠস্বর ভেসে উঠত বেতারযন্ত্রে। আজ থেকে প্রায় চার যুগ আগে। কলকাতা বেতার কেন্দ্রের আদি পর্বে। সেকালের ক্ষুদে শ্রোতাদের কাছে সে বিভাগটির নাম গল্পদাদুর আসর।

প্রতি মঙ্গল আর শনিবার বিকেল পাঁচটা বাজে। বাংলার বেতার শ্রোতা ছেলেমেয়েরা উৎকর্ণ হয়ে থাকে রেডিও সেটের সামনে। কারুর বা দু'কানে আঁটা হেড ফোন্।

আশ্চর্য যন্ত্রের মধ্যে শোনে অলক্ষ্য গল্পদাদা তাদেরই জন্যে আসর আরম্ভ করলেন।...

আসরের প্রথমেই তিনি শোনাতেন গল্প। আর গল্প বলবার তাঁর এক চিত্তাকর্ষক নিজস্ব ধরন ছিল। সহজ সুন্দর করে, অথচ কৌতূহল জাগিয়ে বলে যেতেন আদ্যোপান্ত। সে এক চমৎকার গল্প শোনার আনন্দ। তাঁর অসংখ্য অদৃশ্য ছোট ছোট শ্রোতাদের মহা উপভোগের ব্যাপার।

কত রকমের আর কত মজার গল্পই যে তিনি দিনের পর দিন শোনাতেন। পুরাণের গল্প। ইতিহাসের গল্প। রূপকথা।

রাজা বিক্রমাদিত্য আর বেতালের গল্প। হাসির গল্প। অনর্গল বলে যেতেন মন থেকে। কোন লেখা কিংবা বই পড়ে নয়। টেবিলে বসানো মাইক্রোফোনের দিকে চেয়ে সমস্তই মুখে মুখে বলা গল্প। তাও অনির্দিষ্ট সময়ের জন্যে। যেদিন হাতে যেমন সময় থাকে সেই হিসেবে গল্প শোনান। কোনদিন একটা, কোনদিন বা দুটো। কখনো কয়েকদিন ধরে চলে ধারাবাহিক বৃহৎ গল্প।

একেকদিন গল্পদাদা বাইরেকার কোন বক্তাকে আনেন। সাহিত্যিক বা পণ্ডিত কিংবা চিকিৎসক বা হাস্য-রসিককে। তাঁরা শোনান নানা রকমের জানবার কথা। ছেলেমেয়েদের মনের মতন করে, সহজ সরল ভাষায়।

আসরের প্রথম দিকে এইসব শোনানো হয়। তারপর ছোটদের নিজেদের অনুষ্ঠান। গান বাজনা আবৃত্তি ইত্যাদি। আসরের যে ভাইবোনেরা আসে, তাদের। 'আসরের ভাই বোন' কথাটিরও চলন গল্পদাদা করেছিলেন। একটি প্রীতি স্নিগ্ধ একাত্মতার ভাবে মণ্ডিত হয়েছিল আসরের ছেলেমেয়েরা।

আসরের এ অংশটিও তাদের কাছে কম উপাদেয় নয়। বিশেষ যারা গাইতে বাজাতে বা আবৃত্তি করতে হাজির হত। কারণ ক্ষুদে শিল্পীদের জন্যে নেই কোন 'অডিশন' বা পরীক্ষা বা নিয়মের বেড়াজাল। বেতারের সে যুগে নানা বিভাগের মতন গল্পদাদার আসরেও থাকত এক অন্তরঙ্গ সহজ ভাব। গল্পদাদুর আনন্দের হাটে ছোটদের অবারিত দ্বার।

'গান গাইবে? বাজাবে? আবৃত্তি করবে? কজন এসেছ?'

কাউকে যেন মুখ-ভার করে ফিরতে না হয়। এমনভাবে

হিসেব করে গল্পদাদা জানিয়ে দিতেন তাদের সময়। দোতলার সিঁড়ির পাশের ঘরে তারা অপেক্ষা করত। তারপর তাদের ডাক আসত তিনতলার স্টুডিওতে। মাইক্রোফোনের সামনে আসরের ভাই-বোনদের শোনাবার জন্যে।

এক নম্বর গার্স্টিন প্লেসের সেই পুরনো তেতলা বাড়ির রেডিও অফিস। রাস্তার মোটরের হর্ন আর ট্রাম চলার শব্দও মাঝে মাঝে তার প্রোগ্রামের মধ্যে দিব্যি শোনা যেত। তখনকার গল্পদাদার আসর। ৪০।৪৫ বছর আগেকার কথা।

তৌর্যত্রিকের চর্চা ছেলেমেয়েদের মধ্যে তখন কতটুকুই বা ছিল! তাই সমাগত ক্ষুদে গাইয়ে বাজিয়ে আবৃত্তিকারদের সময় সঙ্কুলান করতে অসুবিধা হত না গল্পদাদার। সকলেরই 'প্রোগ্রাম-করা' হাসি-মুখ তিনি দেখতেন।

আসরে অনুষ্ঠান ছাড়াও তিনি প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করতেন মাঝে মাঝে। সঙ্গীতের কিংবা আবৃত্তির প্রতিযোগিতা। তাও হত মাইক্রোফোনের সামনে, আসরের কার্যসূচীর মধ্যেই। সেসব দিনে ছোটরা কিছু বেশি সংখ্যায় দেখা দিত।

কোন প্রতিযোগিতায় নির্দিষ্ট করা থাকত গানটি। ওই মঙ্গল বা শুক্রবারে আসরের মধ্যেই সে গান শেখাবারও ব্যবস্থা হত। তারপর গানখানি ছেলেমেয়েরা গাইত প্রতিযোগিতার দিন। যেমন একবার ছিল একটি কীর্তনাঙ্গের গান—'শুন সুন্দর শ্যাম ব্রজবিহারী, হৃদি মন্দিরে রাখি তোমারে হেরি।' হাসির গানের বিখ্যাত গায়ক নলিনীকান্ত সরকার সেটি কয়েকদিন ধরে আসরে শিখিয়েছিলেন।...

প্রতিদিনের আসরের যে কথা হচ্ছিল আগে। প্রথমে

গল্পদাদার গল্প। কিংবা কোন বক্তার ভাষণ। তারপর ছোটদের গান বাজনা আবৃত্তি। শেষে ভাইবোনদের লেখা চিঠির ঝাঁপি নিয়ে গল্পদাদা বসতেন। যারা লিখেছে তাদের নাম জানিয়ে দিয়ে একে একে পড়তেন সেসব চিঠি। এ সময়টির জন্যেও সবাই উন্মুখ হয়ে থাকত। কখন্ শোনা যাবে নিজের নামটি।

চিঠিতে তারা নানা বিষয় জানতে চাইত। গল্পদাদা তার উত্তর দিতেন যতদূর সম্ভব সরস করে। চিঠিপত্রের উত্তর শোনাও তাদের কাছে কম আকর্ষক ছিল না।

আরেকটি কৌতূহল-উদ্দীপক ব্যাপার ছিল, আসরের ধাঁধা। অনেক সময় লাগত বলে বিশেষ করে মঙ্গলবার ধাঁধার জন্যে নির্দিষ্ট থাকত। ছড়ার আকারে ধাঁধা বা হেঁয়ালি তৈরি করে গল্পদাদাকে পাঠাত ভাইবোনেরা। যারা পাঠিয়েছে তাদের নাম জানিয়ে আসরে সেসব হেঁয়ালি পড়ে দেওয়া হত, সকলে লিখে নেবার জন্যে। উত্তর তখন জানানো হত না। তা জানা যেত পরের সপ্তায়। যাদের উত্তর সঠিক হয়েছে, তাদের নাম ঘোষণা করা হত। প্রতি সপ্তায় চারটি পাঁচটি ধাঁধা পাঠাত আসরের সভ্য সভ্যারা। কখনো তাদের তৈরি শব্দ ছকের ধাঁধা 'বেতার জগৎ' পত্রিকাতেও প্রকাশ পেত।

আসরে হেঁয়ালি তৈরি করে পাঠানো আর উত্তর দেওয়া। তাতে যেমন আনন্দ, তেমনি বুদ্ধির চর্চার সঙ্গে ছড়া রচনারও চর্চা। আসরের অন্য অনুষ্ঠানের মতন এটিও গল্পদাদার উদ্ভাবনী শক্তির পরিচায়ক। আর ভাইবোনদেরও অতি প্রিয়। কখন্ কার নাম গল্পদাদা বলবেন সেজন্যে উদ্গ্রীব

হয়ে থাকত সবাই। কার কত বেশি উত্তর সঠিক হয়, কে কত বেশি ধাঁধা পাঠাতে পারে, এও এক ধরনের মজার ব্যাপার।

এমনিভাবে সেযুগের বেতারে ছোটদের আসর চলত। ছোটরা যাকে বলত—গল্পদাদুর আসর। এমনি করে মঙ্গল আর শুক্রবার এক ঘণ্টা করে তিনি তাদের মাতিয়ে রাখতেন। ক্ষুদে শ্রোতার দল খেলা ফেলে এসে বসে বসে শুনত।

গল্পদাদার কণ্ঠে যেন যাদু ছিল। আর ছোটদের খুসি করবার, মাতিয়ে তোলবার এক অদ্ভুত ক্ষমতা।

নিজের চেহারার বর্ণনায় তিনি মাঝে মাঝে বলতেন— 'আমার তেরো হাত দাড়ি।' কথাটা শুনে সকলের অর্থাৎ যারা তাঁকে দেখেনি, ধারণা হয়ে যায় যে তিনি প্রকাণ্ড দাড়ি-ওয়ালা এক বুড়ো মানুষ।

আসরের একটি মেয়ে তাঁর একটি ছবিও এঁকে পাঠিয়েছিল---সে ছবি ছাপাও হয়েছিল বেতার জগতে—এক বৃদ্ধ (গল্পদাদা) চেয়ারে বসে যেন গল্প বলছেন। লম্বা দাড়ি তাঁর সর্বাঙ্গ ছাপিয়ে নেমে এসে পা বেয়ে মেঝেয় লুটিয়ে পড়েছে। আর সেই দাড়ির উৎপত্তিস্থান থেকে শেষ পর্যন্ত ১, ২, ৩ ইত্যাদি করে ১৩ হাত লেখা।

গল্পদাদা বেশ মজা করে বলতেন যে, তেরো হাত লম্বা দাড়ি নিয়ে তিনি বড় মুস্কিলেই পড়েছেন। চলাফেরা করে বেড়াতে অসুবিধা হয় এই দাড়ির বোঝা বয়ে। তাই কোন কাজ করতে পারেন না, শুধু গল্প বলেন বসে বসে।

কিন্তু আসরের যে ভাইবোনেরা স্টুডিওতে তাঁর কাছে সশরীরে হাজির হ'ত তাঁকে দেখতে, কিংবা গান গাইতে বা

আবৃত্তি করতে—তারা জানত, তেরো হাত তো দূরের কথা, তেরো ইঞ্চি দাড়িও নেই। দাড়ির কোন বালাই গল্পদাদার নেই, পরিষ্কার কামানো মুখ।

তবে হ্যাঁ, একজোড়া গোঁফ আছে বটে। দেখবার মতন। দাড়ির অভাব বোধ হয় গোঁফজোড়া দিয়ে অনেকখানি মিটিয়েছেন। এমন সুপরিপুষ্ট গুম্ফ সচরাচর চোখে পড়ে না।

হঠাৎ দেখলে মনে হয়, মুখের দু'দিকে ধরা রয়েছে দু'টি প্রকাণ্ড বর্মা চুরুট। তাঁর ঈষৎ কৃশ, দীর্ঘ অবয়ব ও একহারা মুখের সঙ্গে সেই গোঁফজোড়া যেন খানিক বেমানান। দুরস্ত প্যাণ্ট কোট ওয়েস্টকোট আর নেকটাইয়ের ওপরও ঠিক মানানসই নয়। অথচ সপ্রতিভ মুখে কেমন যেন মানিয়ে গেছে, তাঁর মুখে বলা পুরাণের গল্পের মতনই।...

ছোটদের মনোহরণকারী এক বিচিত্র ব্যক্তিত্ব ছিল গল্প-দাদার। বাংলাভাষী ছেলেমেয়েদের সেই আনন্দময় আসরের মধ্যে দিয়ে একতাসূত্রে গ্রথিত করা। তাদের বৃহত্তর মানস বিকাশের এক অপূর্ব পরিকল্পনা তিনি করেছিলেন।

আদর্শবাদী হয়েও স্বপ্নবিলাসী ছিলেন না তিনি। তাই সে আদর্শকে—যে আদর্শের ক্ষেত্রে কোন পূর্বসূরীকে তিনি পাননি—সার্থক করবার জন্যে অভিনব সংগঠনও করেছিলেন।

বেতারকেন্দ্রের ছোটদের আসরকে ভিত্তি করে তিনি গড়ে ছিলেন একটি ব্যাপক সংস্থা। ছেলেমেয়েদের নিজস্ব প্রতিষ্ঠান —রেডিও সার্কল অফ বেঙ্গল (Radio Circle of Bengal) যার উদ্দেশ্য ছিল, স্কুল-নির্দিষ্ট শিক্ষার বাইরে এক মনোরম সানন্দ পরিবেশে ছোটদের সুপ্ত সুকুমার বৃত্তির বিকাশ সাধন।

দেশের ভবিষ্যৎরূপে তাদের মনুষ্যত্বের দীক্ষা দিয়ে চরিত্র গঠন। চিত্তের সকল সম্ভাবনার পথ উন্মুক্ত করে চৈতন্য জাগরিত ও আত্মশক্তিতে উদ্বুদ্ধ করা।

বাংলা দেশে তথা ভারতবর্ষে সেই প্রথম কিশোর জাগরণের পথ প্রদর্শন গল্পদাদা এইভাবে করলেন। রেডিও সার্কলের উদ্‌বোধন তিনি করেন এক উন্মুক্ত উৎসবের আকারে।

ছোটদের জন্যে এবং ছোটদের নিয়ে এদেশে সেই সম্ভবত প্রথম সঙ্গীত ইত্যাদি সহযোগে আনন্দ সম্মেলন। ১৯৩০ সালে সেই পথিকৃৎ অনুষ্ঠান সাড়ম্বরে সুসম্পন্ন হ'ল।

তখনকার বেতারকেন্দ্রের কার্যস্থল ১, গার্স্টিন প্লেসে। বেতার ভবনের পাশে যে উন্মুক্ত স্থান ছিল সেখানে প্রকাণ্ড সামিয়ানার নীচে বাংলার ছেলেমেয়েদের সেই প্রথম সম্মেলন। এদেশে এক নতুন দৃষ্টান্ত।

রেডিও সার্কলের নিজস্ব, সুন্দর প্রতীক-চিহ্ন (badge) বুকে নিয়ে ছেলেমেয়েদের দল তাদের প্রথম নিজস্ব প্রতিষ্ঠানে মিলিত হ'ল। এমন সাধারণের জন্য আহূত বিরাট অধিবেশনে এই প্রথম তারা অংশগ্রহণ করলে সঙ্গীতে, আবৃত্তিতে। সুকুমার কলায় কিশোর প্রতিভার অঙ্কুর প্রস্ফুটিত হবার এই প্রথম সুযোগ পেলে গল্পদাদার উদ্‌যোগে ও প্রেরণায়। ছোটদের সঙ্গে তাদের পিতামাতা ও জ্যেষ্ঠরাও আমন্ত্রিত হয়েছিলেন। যোগ দিয়েছিলেন সেদিনের অভিনব আনন্দানুষ্ঠানে।

সেখানে গল্পদাদা তাঁর মনোজ্ঞ ভাষণে আলাপে আপ্যায়নে এবং রঞ্জিনী ব্যক্তিত্বে সকলকে মাতিয়ে রাখেন, পরিতৃপ্ত করেন। তা উপস্থিত সবাইকার এক মধুর অভিজ্ঞতা হয়ে আছে।

সে সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেছিলেন ঝামাপুকুরের হিরণ্য-কুমার মিত্র। রাজা দিগম্বর মিত্রের এক বংশধর। হিরণ্য-কুমারের সেখানে যোগাযোগের কারণ, তাঁর একমাত্র পুত্র প্রফুল্লকুমার ছোটদের আসরের এক প্রতিভাবান সদস্য ছিল। সাহিত্য চিত্রশিল্পাদি রচনায় প্রকাশ পেয়েছিল তার প্রতিভার কোরক। কিন্তু তা অঙ্কুরেই ঝরে যায় অকাল মৃত্যুতে।

গল্পদাদা হিরণ্যকুমারকে তাই বাংলার ছেলেমেয়েদের বৃহত্তর আনন্দযজ্ঞে উপস্থিত করেন। তাঁর শোকের ভার লাঘব করতে চান প্রফুল্লের এত ভাইবোনদের মুখ চেয়ে।

কিশোর প্রফুল্লের সাহিত্য ও চিত্র রচনার নিদর্শন সমেত তার স্মৃতিকথার একটি পুস্তিকাও গল্পদাদা প্রকাশ করে-ছিলেন। সচিত্র বইখানির নাম 'বাংলার নচিকেতা'। রেডিও সার্কলের সেই অধিবেশনে হিরণ্যকুমার মিত্র গল্পদাদাকে শ্রদ্ধা জানিয়ে বক্তৃতা দিয়েছিলেন। বাংলার এত ছেলেমেয়েদের আনন্দময় সূত্রে যুক্ত করার জন্যে তাঁকে অভিনন্দিত করেন প্রফুল্লের পিতা।

তারপর গল্পদাদাকে মাল্য দিতে গেলে তিনি সভায় এক অপূর্ব রহস্য সৃষ্টি করলেন। সে মালা নিজের গলায় না দিয়ে এগিয়ে এলেন শ্রোতৃমণ্ডলীর মধ্যে।

সভার অনেকের দৃষ্টি আগে এদিকে আকৃষ্ট হয়নি। কিন্তু এখন গল্পদাদাকে অনুসরণ করতে গিয়ে সকলে দেখলেন, প্যাণ্ডেলের একটি বস্ত্রাচ্ছাদিত খুঁটিতে এক বৃদ্ধের মাটির তৈরী আবক্ষ মূর্তি টাঙ্গানো রয়েছে। তার তের হাত দীর্ঘ শ্মশ্রু লুটিয়ে রয়েছে নীচের মাটিতে খানিকদূর পর্যন্ত।

গল্পদাদা তাঁর মালাখানি এনে সেই নকল গল্পদাদার মূর্তির গলায় পরিয়ে দিলেন। তখন সে কি হাসির হিল্লোল জেগেছিল বিরাট সভা-মণ্ডপ মুখরিত করে।

সেই উদ্‌বোধনী অধিবেশনের সময় থেকে রেডিও সার্কল ছেলেমেয়েদের একটি প্রতিষ্ঠানে রূপ নেয়। কিন্তু তা স্থায়ী হতে পারেনি দু'টি কারণে।

প্রথমত, তার ভিত্তিস্বরূপ ছিল ছোটদের বেতার-আসর এবং সেই বেতারকেন্দ্রের জীবনে এক চরম সঙ্কটকাল এসেছিল। কলকাতা বেতারের অস্তিত্বই বিপন্ন হয়ে পড়েছিল রেডিও সার্কলের সেই অনুষ্ঠানের পরে।

দ্বিতীয়ত, গল্পদাত্রর দীর্ঘদিন রোগভোগান্তে অকাল মৃত্যু। নচেৎ, তিনি জীবিত থাকলে রেডিও সার্কেলের জীবনে নিশ্চয় স্থায়িত্ব আনতেন। বাংলার ছেলেমেয়েদের সাংস্কৃতিক জীবনে রচিত হ'ত একটি ঐতিহাসিক অধ্যায়।

ছোটদের মানস উন্মেষে ও বিচিত্র আনন্দলোকের সন্ধান দিতে আরো একটি বিষয়ে পথ-প্রদর্শক ছিলেন গল্পদাদা। তা হ'ল, বাংলার ছেলেমেয়েদের সঙ্গে বিদেশের ছেলেমেয়েদের লেখনী-বন্ধু (pen friend) পাতিয়ে দেওয়া।

সুদূর দেশের ছেলেমেয়েদের মধ্যে পত্র-বন্ধুত্ব স্থাপন করে তাদের মনের একটা জানলা তিনি খুলে দিয়েছিলেন, বলা যায়। সে যুগে এদেশের সঙ্গে ইংলণ্ডের ছোটদের চিঠিতে আলাপ পরিচয় আর বন্ধুত্বের ব্যবস্থা এক অভিনব ব্যাপার ছিল, সন্দেহ নেই।

লণ্ডনের বেতার-কেন্দ্রেও একটি ছোটদের আসর ছিল। সেখানকার কর্তৃপক্ষের সহযোগিতায় গল্পদাদা এই লেখনীবন্ধু

পাতাবার কাজ আরম্ভ করেছিলেন।

বাংলার ও ইংলণ্ডের যে সব ছেলেমেয়েরা পত্র-যোগে বিদেশে বন্ধুত্ব পাতাতে চায় তাদের নাম-ধাম-বয়স বেতার কেন্দ্রের ছোটদের আসর থেকে নেওয়া হয়। সেখানকার ছেলেদের সঙ্গে এখানকার ছেলেদের ও এ দেশের মেয়েদের সঙ্গে ওদেশের মেয়েদের সমবয়স দেখে নাম ঠিকানা পাঠানো হয় পরস্পরকে।

বাংলার ছেলেমেয়েরা গল্পদাদার আসর থেকে তাদেরই সমবয়সী ইংলণ্ডের ছেলে বা মেয়ের নাম-ঠিকানা পেয়ে তাদের চিঠি লেখে। বেতার-কেন্দ্রের মধ্যস্থতাতেই প্রথম চিঠি লেখার পত্তন হয়। তারপর উত্তর আসে সেখান থেকে।

পরে স্বাধীনভাবে পত্রালাপ চলতে থাকে বাঙ্গালী ও ইংরেজ ছেলেদের মধ্যে, ইংরেজ ও বাঙ্গালী মেয়েদের মধ্যে। চিঠিতে পরস্পরের দেশের কথা, বাড়ীর কথা, নিজেদের কথা, স্কুল, লেখাপড়া, খেলাধূলা আর ছবি'র কথা, হবি'র কথা লেখালেখি হয়।

সুদূর বিলাত চলে আসে ঘরের কাছে। একটা অচেনা বিদেশকে ছেলেমেয়েরা ঘরোয়াভাবে জানতে পারে। নিজের দেশকে বিদেশীর কাছে চিনিয়ে দেয়।

এ এক চমৎকার চিত্তরঞ্জক খেলা। যাকে কখনো দেখেনি, যার কথা আগে জানেনি, সেই সম্পূর্ণ ভিন্‌দেশী, ভিন্ন পরিবেশের সমবয়সীর সঙ্গে শুধু চিঠিতে জানাজানি। ঘরে বসে এ এক মজার দেশভ্রমণ। গল্পদাদার কিশোর কল্যাণে আর এক স্মরণীয় দান।

বাংলা দেশের ছেলেমেয়েদের এমনি নানা অভিনব

পদ্ধতিতে শিক্ষা-দীক্ষা সংস্কৃতি-চর্চা ও আনন্দভোগের সার্থক পরিকল্পনা গল্পদাদা করেছিলেন। কিন্তু তা কোন আকস্মিক ঘটনা নয়। তার পটভূমিতে ছিল তাঁর গভীর স্নেহপ্রবণ, দেশহিতৈষী এবং চিন্তাশীল চিত্ত।

ছোটদের মঙ্গল কামনা তাঁর অন্তর ও ভাবনায় যে কতখানি স্থান অধিকার করেছিল, তার পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর রচিত 'গল্পদাদার কথা' বইটিতে। বেতারের আসরে তিনি দিনের পর দিন যত পুরাণের, ইতিহাসের, দেশবিদেশের কিংবা হাসির গল্প বলতেন তার কিছু নিয়ে বইখানি প্রকাশিত হয়।

এই বইয়ের ভূমিকায় তিনি যে সব কথা লেখেন তার মধ্যেই পাওয়া যায় তাঁর মনের পরিচয়। যেমন,—'আকাশে কান পেতে তোমরা আমার গল্প শুনে আসছ। আমিও একটা চৌকো বাক্সের দিকে চেয়ে সারা বাংলার ছেলে-মেয়েদের কচি কচি মুখগুলি ভাবতে ভাবতে কত না গল্প বলেছি। তোমরা বল, আমার গল্প শুনতে তোমরা বড় ভালবাস। আমিও তোমাদের গল্প বলতে বড় ভালবাসি। তোমরা আমাকে দেখতে পাও না, আমিও তোমাদের দেখতে পাই না। না দেখে ভালবাসা কেমন মজা। জীবনে কখনও দেখা হবে কি না সন্দেহ। নাই হ'ক গে।'···

বইখানির 'গল্পদাদার নিবেদন' তাঁর ধ্যান-ধারণাকে এই ভাবে প্রকাশ করেছে: 'আমাদের দেশের ছেলেমেয়েদের খাওয়া-পরার ভার পিতামাতার উপর; লেখাপড়ার ভার গুরুমহাশয়দের উপর; আর আমোদ-প্রমোদ, আনন্দের ভার —ভগবান জানেন, কার উপর। লেখাপড়ার অবকাশে,

যখন শিশুর মন তার গণ্ডী পেরিয়ে বাইরে যেতে চায়—আনন্দের তুলাল তারা—যখন মহানন্দে মাততে চায়, বুকের ভিতর আনন্দের উৎসগুলো যখন ফুটে উঠে তাদের চতুর্দিকে একটি আনন্দের রাজ্য স্থাপন করতে চায়—তখন রুক্ষবাণী, বা শুষ্ক বেত হ'ল আমাদের দেশের পিতামাতার জবাব!

আর, অন্য দেশে? হোক না বাবা খুড়ো লাটসাহেব—আস্তিন গুটিয়ে, ঢিলে পেনটুলান বা পাজামা পরে, শুধু পায়ে, ছেলেদের নার্সারি বা খেলাঘরে ঢুকে পড়েন। বাপ, খুড়ো, দাদা—এক একজন প্রধান কর্মকর্তা হয়ে, শিশুদের কাঁধে পিঠে নিয়ে, দৌড়ঝাঁপ কত না খেলা খেলেন। তখন তাঁরা শিশুদের সঙ্গে শিশু হয়ে, তাদের স্বপ্নরাজ্যের ভিতর ঢুকে, ছোট ছোট কোদাল খন্তা নিয়ে মাটি খুঁড়ে treasure seeker সাজেন; নয় ত চোর চোর খেলেন। এক পয়সার পিস্তল নিয়ে, ডাকাতের হাত থেকে ছেলেদের খেলাঘরের তুর্গ রাজবাটি, কোষাগার বাঁচান। ···এই বিমল আনন্দের ঢেউ শুধু খেলাঘরে আবদ্ধ থাকে না। তাদের সংসারও প্লাবিত করে। আবার পড়ার কিংবা খাবার ঘণ্টার সময়, ঘড়ির কাঁটার সঙ্গে ঠিক হাজির—ফিটফাট, একটু ত্রুটি অমার্জনীয়! কেল্লার গোরাদের চেয়েও কঠিন নিয়মে ছেলেদের জীবন বাঁধা। তাতেই তারা মানুষের মত মানুষ হয় এবং পরে নিজের নাম ও দেশের নাম জয়জয়কার করে!

আমাদের ছেলেরা—"এই তুই পড়ছিস না", "এই চীৎকার করছিস", "গালে তুই চড়", ইত্যাদি তাড়নায় লেখা-পড়ার অবকাশটা অতিবাহিত করে। পিতামাতার দৃষ্টির বাহিরে তারা খেলা করে। সব সময় তাদের প্রাণে ভয়—

হাজার নির্দোষ খেলা হলেও যদি বাবা মা বকেন। আমরা ছেলেদের সঙ্গে মিশতে অরাজি। তাদের ভেঙ্গে দিতে চাই, গড়ে দিতে চাই না। ছেলেমেয়েদের সঙ্গে মিশে তাদের আনন্দের ভাগ নেওয়া আমরা ছেলেমানুষী ভাবি। আমরা দেখিনা—কে তারা? দেখলেও বুঝতে পারি না। চোখ রাঙ্গান অবধি দৌড় আমাদের। তার ফলে যদি কেউ সৎ সঙ্গী পেলে ত ভাল। আর যদি সৎ সঙ্গী না পেলে ত বাপ-মায়ের চোখের জলের বন্দোবস্ত হ'ল।

আমার মনে হয়, কোন ছেলেমেয়ে খারাপ নয়, দুষ্ট নয়। শুধু সঙ্গীর অভাবে কি ক'রে অবকাশটা কাটাবে, তার মালমসলার অভাবে, ভাল-মন্দ হয়। বাঙ্গলা দেশের বাপ-মা'র লজ্জা ভাঙ্গার সময় এসেছে। ছেলেমেয়েদের সঙ্গে ছেলেমেয়ে সেজে তাদের খেলাঘরে ঢুকে পড়তে হবে। আমাদের দেশের শিশুরাজ্যের একটি মহান ভবিষ্যতের দ্বার উন্মুক্ত ক'রে দিতে হবে। তাই শুধু বাংলা দেশের ছেলেমেয়েদের ডাকছি না, তাদের অভিভাবকদেরও ডাকছি—

"আসুন, ছেলেদের সঙ্গে মিশতে শিখুন—ছেলেদের চিনতে চেষ্টা করুন। শুধু পেটের খোরাক নয়, মনের খোরাকও দিন।

কাপড় বুনতে গিয়ে কুড় হারিয়ে ফেললে, যেমন কাপড় বোনা হয় না, তেমনি ছেলেমেয়েদের মনের ভাব যদি বুঝতে না পারি, না চেষ্টা করি কিংবা আধাআধি বুঝি, তা হ'লে আবার তাদের ঠিক বুঝা যায় না, আর না বুঝলে তাদের মানুষ করা শক্ত হয়ে পড়ে। সেই জন্য আমি এখানে ছেলেমেয়েদের মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধে দু' একটি কথা বলছি।..."

দেশের ছেলেমেয়েদের এমন মনপ্রাণ দিয়ে যিনি ভালবাসতেন, তাদের মনুষ্যত্ব বিকাশের জন্যে এমন আন্তরিক দরদের সঙ্গে চিন্তা করেছিলেন দেশের ভবিষ্যৎ মঙ্গলের কথা বিবেচনা করে; বেতারকেন্দ্রে এবং সমগ্র দেশে ছোটদের জন্যে প্রথম প্রতিষ্ঠান সংগঠিত করে এক অচিন্ত্যপূর্ব বিচিত্র আনন্দযজ্ঞে তাদের আহ্বান জানিয়ে এনেছিলেন, ছোটদের সেই বন্ধু, শিক্ষক, বক্তা, সাহিত্যিক, হোতা—কে সেই বিচিত্র প্রতিভাধর গুণী, গল্পদাদু? যিনি নতুন পথের পথিক হয়ে একটি অনাবিষ্কৃত দিগন্তে অরুণোদয়ের সন্ধান দিয়েছিলেন?

সেদিনের সেই ছোটদের আসরের যারা বড় হয়েছে, তাদের কেউ কোনদিন হারানো কৈশোরের স্মৃতির আলোয় গল্পদাদার কথা মনে করতে পারে। কিন্তু সাধারণভাবে বাংলা দেশে তাঁর নাম এক রকম বিস্মৃত বলা যায়। এখনকার বেতারের বুধবার ও রবিবার বিকালে কিশোর-কিশোরীদের আসরটির নাম অবশ্য রাখা হয়েছে 'গল্পদাদুর আসর'। ১৯৪১ থেকে, গল্পদাদুর মৃত্যুর ৮ বছর পরে এই নামকরণ হয়েছিল। কিন্তু একালের কোন ছেলেমেয়েই হয়ত জানে না কি মহান ঐতিহ্য বহন করছে গল্পদাদু নামটি। কিংবা কি স্মরণীয় কীর্তি বিজড়িত আছে ওই মৌলিক নামটির সঙ্গে!

গল্পদাদা ছদ্মনামের অন্তরালে যে মানুষটি ছিলেন, তাঁর প্রকৃত পরিচয় এখানে দেওয়া হল: তিনি হলেন যোগেশচন্দ্র বসু, পেশায় আইনজীবী, হাইকোর্টের এ্যাডভোকেট। আর তাঁর নেশার বিবরণ এ পর্যন্ত অনেকখানি দেওয়া হয়েছে।

১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে ২৪ পরগণার দক্ষিণ

বারাসতে তাঁর জন্ম। সেখানকার এক বর্ধিষ্ণু বসু পরিবারের সন্তান তিনি।

তাঁর প্রথম জীবন সম্পর্কে উল্লেখ্য তথ্য আছে। উনিশ শতকের বাংলা তথা ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মনীষী রাজনারায়ণ বসুর ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে তিনি এসেছিলেন। আর রাজনারায়ণের কাছে যে শিক্ষা ও প্রেরণা পান তার ফলে তাঁর মনে মুদ্রিত হয়ে যায় জাতীয়তার আদর্শ।

সেই ভাবের সম্যক বিকাশ সাধন হয় স্বদেশী আন্দোলনের যুগে। ১৯০৫ সাল ও তার অব্যবহিত পরে। যোগেশচন্দ্র সেই স্বদেশী আন্দোলনের একটি সুফল। তাঁর পরিণত বয়সের কিশোর সংগঠন ইত্যাদি আদর্শবাদী কার্যকলাপের মূল সেই প্রথম যৌবনকালের দেশাত্মবোধ ও জাতীয়তার চেতনায় নিহিত।

তাঁর ছাত্রজীবন প্রধানত কলকাতায় অতিবাহিত হয়। সিটি কলেজিয়েট স্কুলে ও সিটি কলেজে। সেখান থেকে বি, এ, পাঠ শেষ করবার পর তিনি আইনের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

বরাবরই মেধাবী ছিলেন তিনি। কিন্তু অধ্যয়নের অতিরিক্ত নানা বিষয়ে তাঁর অনুরাগ ও নৈপুণ্য প্রকাশ পায়। সেজন্যে একান্তভাবে পাঠ্যপুস্তকে নিবিষ্ট হতে পারেননি কখনো।

কলেজের ছাত্র-জীবনে ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটের আণ্ডার সেক্রেটারিরূপে যোগেশচন্দ্র একজন উৎসাহী কর্মী ছিলেন। একবার আন্তঃকলেজ প্রবন্ধ প্রতিযোগিতায় সর্বোৎকৃষ্ট হয়েছিল তাঁর রচিত প্রবন্ধ। সেজন্যে তৎকালীন বাংলার

গভর্নর এডওয়ার্ড বেকার তাঁকে পুরস্কার দেন নিজের নামাঙ্কিত ছবি ও একটি despatch box.

নানাদিকে তরুণ যোগেশচন্দ্রের কার্যকলাপ দেখা যায়। স্বদেশী আন্দোলনের ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সে অন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন ঘনিষ্ঠভাবে। জাতীয় কংগ্রেসের কোন কোন নেতার সঙ্গেও সুপরিচিত ছিলেন।

১৯০৫ সালের কলকাতায় কংগ্রেস অধিবেশনের সভাপতি দাদাভাই নৌরজীর সঙ্গেও যোগাযোগ ঘটে তাঁর। ফলে, সে বছরের কংগ্রেস অধিবেশনের সময় দাদাভাই নৌরজীর একান্ত সচিবের কাজ করেছিলেন।

স্বদেশী আন্দোলনের প্রেরণা থেকে যোগেশচন্দ্র তাঁর মানস ও কর্মজীবন গঠিত করবার পথনির্দেশ পান। স্বদেশ-সেবার আদর্শ অধিকার করে তাঁর সত্তা। তিনি পরম নিষ্ঠায় দেশসেবার ব্রত গ্রহণ করেন সেকালের নবযুগের প্রাণস্পন্দন অন্তরে নিয়ে। তাঁর তরুণ জীবনে স্বদেশের সেবার কাজে উৎসাহের সীমা ছিল না। খদ্দর প্রচারের জন্যে সেই কাপড়ের বোঝা কাঁধে নিয়ে ঘুরেছেন বিক্রয় করবার কাজে।

স্বদেশী ভাবাদর্শের অনুপ্রেরণা তাঁর মধ্যে ক্রমে বৃহত্তর কাজে রূপ নেয়। তার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী রূপে আরম্ভ হয় তাঁর কর্মজীবন।

তাঁর প্রথম প্রচেষ্টারূপে দেখা যায় এক ব্যাপক পরিকল্পনা অনুসারে কৃষিশালা পত্তন। জাতীয় কৃষির আদর্শে ব্রতী হয়ে তিনি ৮১ বিঘা জমি সংগ্রহ করে কয়েকজন ভদ্রযুবককে সহকর্মী নিয়ে কৃষিকর্মে আত্মনিয়োগ করলেন। এ কাজে তাঁর আন্তরিকতা যতখানি ছিল, সে অনুপাতে অভিজ্ঞতা ছিল

না। সে জন্যে বুদ্ধি-বিবেচনা ও পরিশ্রম সত্ত্বেও বাস্তবে তা সফল হ'ল না শেষ পর্যন্ত, যদিও তার অস্তিত্ব ছিল প্রায় সাত বছর।

কৃষিশালার শেষ পর্যায়ে তিনি আর এক নতুন কর্ম-যজ্ঞ আরম্ভ করলেন। বেলেঘাটা অঞ্চলে তাঁর উদ্‌যোগে স্থাপিত হ'ল একটি কারখানা—Bengal Paste-Board and Paper Mills। বাঙ্গালীর অর্থে, বাঙ্গালীর শ্রমে এবং বাঙ্গালীর পরিচালনায় মহোৎসাহে এই শিল্প প্রতিষ্ঠানের কাজ আরম্ভ হল।

কারখানাটির অস্তিত্ব ছিল তিন বছর। উৎপাদনের দিক থেকে ব্যর্থ না হলেও, ব্যবসায়ের হিসাবে সার্থক হতে পারল না সংস্থাটি। যোগেশচন্দ্র যে মহান আশা নিয়ে বহু বাঙ্গালী সন্তানের অন্ন সংস্থানের উপায় হবে ভেবেছিলেন, এখানে তা হ'ল না।

কাগজ তৈরি এ কারখানায় হয়নি বটে, তবে ব্লটিং পেপার ও পেস্ট্ বোর্ড উৎপন্ন হয় ভালই। কারখানাটির জীবিতকালে ভবানীপুরে যে বিরাট কংগ্রেস প্রদর্শনী হয়েছিল সেখানে একটি স্টল নিয়ে যোগেশচন্দ্র এখানে প্রস্তুত ব্লটিং পেপার ও পেস্ট বোর্ড প্রদর্শন করেছিলেন। তা দেশের গণ্যমান্য অনেকের প্রশংসাও পেয়েছিল। স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায় একটি পদক উপহার দিয়ে সংবর্ধিত করেছিলেন যোগেশচন্দ্রকে।

তাঁর এই দ্বিতীয় কর্ম-প্রচেষ্টাও সফল না হওয়ায়, অগত্যা আইনজীবীর বৃত্তি আরম্ভ করেন। ওকালতি করতে থাকেন হাইকোর্টে। কিন্তু জানা যায় যে অর্থনীতিক ক্ষেত্রে দেশাত্ম-

বোধক ও গঠনাত্মক কর্মের আদর্শ তিনি তার পরেও ত্যাগ করতে পারেননি। তাই, হাইকোর্টের কর্মজীবনের মধ্যেও তাঁকে দেখা যায় হিন্দু মিউচুয়াল লাইফ এ্যাস্যুরেন্সের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও অবৈতনিক সম্পাদকরূপে।

বেতার-কেন্দ্রে যোগদানের আগে যোগেশচন্দ্রের জীবন ও কর্মধারার এই হ'ল সংক্ষিপ্ত পরিচয়। তাঁর গঠনমূলক মন, আদর্শ ও কার্যক্রমের পটভূমিকা।

পূর্ববৃত্তান্তের এই রূপরেখা থেকে বোঝা যায় যে, বেতারে ছোটদের আসরের প্রবর্তন ও রেডিও সার্কল স্থাপন করে তিনি বাংলার ছেলেমেয়েদের জন্যে যে নতুন আনন্দলোকের সন্ধান দেন—তা কোন আকস্মিক ঘটনা নয়। তাঁর যৌবন-কালের আদর্শবাদের পরিণতি স্বরূপ এই অভিনব কিশোর আন্দোলনের সূত্রপাত।

কলকাতা বেতারকেন্দ্রে যোগেশচন্দ্র যখন প্রথম যোগদান করেন, তখন তাঁর বয়স ৪৩ বছর। এদেশে বেতারের তা আদিযুগ। সেজন্যে এখানকার বেতার স্টেশনের প্রথম অবস্থার কথা সংক্ষেপে উল্লেখ করা দরকার। তাহ'লে গল্প-দাদার সময়ে কলকাতা বেতারের পরিবেশ এবং সেখানে তাঁর কার্যকলাপ সম্পর্কে ধারণা করবার সুবিধা হবে।

কলকাতায় প্রথম বেতার-যন্ত্রের একটি ছোট স্টুডিও স্থাপিত হয় টেম্পল চেম্বার্স ভবনে (হাইকোর্টের সামনে), ১৯২৫-২৬ সালে। মার্কনি কোম্পানীর কর্মকর্তা মিঃ জে. আর. স্টেপলটন ছিলেন তার অধ্যক্ষ এবং সেখানে অপেশাদার গায়ক-বাদকরা সঙ্গীতানুষ্ঠান করতেন।

সেই বেতার সংস্থা ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান ছিল না এবং তা

শোনবার জন্যে কোন লাইসেন্স দরকার হ'ত না, এটি উল্লেখযোগ্য। তখনকার বেতার কলকাতা থেকে পাঁচ মাইল সীমানার মধ্যে শোনা যেত এবং অনুষ্ঠান হ'ত শুধু সন্ধ্যার পরে। এক ঘণ্টা ভারতীয় ও এক ঘণ্টা ইউরোপীয় সঙ্গীতাদি।

কলকাতায় আধুনিক কালোপযোগী, বৃহত্তর পবিধিতে বেতার-কেন্দ্র ১৯২৭ সালের ২৬ আগস্ট স্থাপিত হয়। তার স্টুডিও ছিল ডালহাউসি স্কোয়ারের ১, গার্স্টিন প্লেসে। সে ব্যবসায়ী বেতার প্রতিষ্ঠানটির নাম, ইণ্ডিয়ান ব্রডকাস্টিং কোম্পানী।

তার একমাস আগে এই সংস্থার নামে বোম্বাইতে প্রথম ব্যবসায়ী বেতার প্রতিষ্ঠান গঠিত হয়। ইণ্ডিয়ান ব্রডকাস্টিং কোম্পানীর সত্ত্বাধিকারী ছিলেন বোম্বাইয়ের পার্শী সম্প্রদায়ের এফ্ এম, চিনয় কোম্পানীর কর্তৃপক্ষ। এই ইণ্ডিয়ান ব্রডকাস্টিং সংস্থার সর্বময় কর্মকর্তা ছিলেন এরিক ডানস্টন এবং কলকাতার প্রথম স্টেশন ডিরেক্টর—সি, এম, ওয়ালিক।

তখন কলকাতা কেন্দ্রের ভারতীয় অনুষ্ঠানের পরিচালক ছিলেন সুপরিচিত ক্ল্যারিওনেট বাদক নৃপেন্দ্রনাথ মজুমদার। সে সময় সন্ধ্যা থেকে ৩।৪ ঘণ্টা কলকাতা কেন্দ্রে বেতার অনুষ্ঠান প্রচারিত হ'ত।

১, গার্স্টিন প্লেসে বেতারকেন্দ্র স্থাপিত হবার কিছুদিনের মধ্যেই যোগেশচন্দ্র বসু সেখানে যোগ দেন নৃপেন্দ্রনাথ মজুমদারের আহ্বানে। নৃপেন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর আগে থেকেই পরিচয় ছিল। ১৯২৭ সালের শেষ দিকে বেতার প্রতিষ্ঠানে যোগদান করেন যোগেশচন্দ্র। বলা বাহুল্য, তখন সেখানে ছোটদের জন্যে কোন বিশেষ বিভাগের অস্তিত্ব ছিল না।

যোগেশচন্দ্র সেখানে প্রথম আসেন বক্তারূপে। পণ্ডিত চিন্তামণি এই ছদ্মনামে তিনি বেতারকেন্দ্র থেকে নানা বিষয়ে আলোচনা ও বক্তৃতা করতেন। তা ছাড়া, এই সময়ে অর্থাৎ ১৯২৭-এর শেষ থেকে মাঝে মাঝে তিনি ছেলেমেয়েদের জন্যে গল্প বলতেন রাত্রের কার্যক্রমে।

কিন্তু তখন তা বিচ্ছিন্ন অনুষ্ঠান এবং স্বল্পক্ষণের এক একটি ভাষণ মাত্র। ছোটদের জন্যে নির্দিষ্ট কোন বিভাগীয় আসর সে সময় ছিল না। তবে তখন থেকেই ছেলেমেয়েদের আসরের একটি ব্যাপক পরিকল্পনা তাঁর মনে উদয় হয় এবং তিনি এ বিষয়ে জানান নৃপেন্দ্রনাথকে।

মজুমদার মহাশয় স্বীকৃত হলে, ১৯২৯-এর মাঝামাঝি গল্পদাদুর আসর বাস্তব রূপ গ্রহণ করে। প্রসঙ্গত বলা যায় যে, কলকাতা বেতারের বহুমুখী গুণের আধার বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র একই সময়ে আর একটি জনপ্রিয় বিভাগ প্রতিষ্ঠা করেন 'মহিলা মজলিস' নামে।

এইভাবে যোগেশচন্দ্র বসুর প্রবর্তনা ও পরিচালনায় প্রথম 'ছোটদের আসর' বিভাগ স্থাপিত হয়। আসরের পরিচালক-রূপে তিনি যে ছদ্মনামটি গ্রহণ করেন, তা পরে অসাধারণ জনপ্রিয়তা লাভ করে বেতার-শ্রোতা ছেলেমেয়েদের মধ্যে। ক্রমে গল্পদাদার অন্তরালে যোগেশচন্দ্রের নামটি সকলের অগোচরে থেকে যায়।

ছোটদের আসর তাঁর পরিচালনায় কিভাবে অনুষ্ঠিত হ'ত, কি কি বিষয় তিনি আসরে সন্নিবিষ্ট করতেন তার পরিচয় দেওয়া হয়েছে। ছেলেমেয়েদের জন্যে পরম যত্নে ও ভালবাসায় গল্পদাদার সৃজনশীল মন তাদের মানস-বিকাশের

জন্যে যে আনন্দঘন পরিবেশ রচনা করেছিল, তার সমাদর তারা ঠিকই করে।

তাঁর সেই আসর আরম্ভ হবার বার্তা জানাবার জন্যে সেই আন্তরিকতাময় যুগে কোন ঘোষকের প্রয়োজন হয়নি।

গল্পদাদা তাঁর দরদী কণ্ঠে যখন সকৌতুক বিনয়ে বলতেন, 'গল্পদাদা কথা বলছে, পালিও না, পালিও না, পালিও না,' তখন ছেলেমেয়েরা পালানো দূরের কথা, হৈ হৈ করে সেটের সামনে হাজির হ'ত। এমন কি, একেক বাড়ীর রেডিও শুনতে চলে আসত পাড়া প্রাতিবাসীর ক্ষুদে শ্রোতার দল।

ছোটদের আসর কলকাতা বেতারকেন্দ্রের যে একটি প্রধান আকর্ষণ ছিল, সেবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

গল্পদাদার আসরের পরে বেতারে আরো কয়েকটি বিশেষ বিভাগ গঠিত হয়—যথা বিষ্ণু শর্মা (বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের ছদ্মনাম) পরিচালিত 'মহিলা মজলিস', নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়ের পরিচালনায় 'বিদ্যার্থী মণ্ডল' প্রভৃতি। এই সব বিভাগের জন্যে কলকাতা বেতারকেন্দ্রের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি ত্বরান্বিত হতে থাকে। এ প্রসঙ্গে বিশেষ করে 'ছোটদের আসর' 'মহিলা মজলিস, ও 'বেতার-নাট্রকে দল' (বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র পরিচালিত নাট্যবিভাগ। যার উদ্‌যোগে প্রতি শুক্রবার রাত্রি ৭।৩০ থেকে ১০।৩০ পর্যন্ত এক একটি নাটকের অভিনয় হ'ত) বিশেষভাবে উল্লেখনীয়।

ছোটদের আসরকে সাফল্যের পথে অগ্রসর করে দিয়ে গল্পদাদা ছেলেমেয়েদের আর একটি বৃহৎ সংগঠন রেডিও সার্কল অব্ বেঙ্গল—বেশ সমারোহের সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত করলেন।

কিন্তু রেডিও সার্কলের সেই উদ্‌বোধনী অধিবেশনের কিছুদিনের মধ্যেই ইণ্ডিয়ান ব্রডকাস্টিং সংস্থার জীবনে দেখা দেয় ঘোর সঙ্কট। ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানটি গুরুতর লোকসানের ফলে নিমজ্জমান হতে থাকে।

তখন ভারত সরকার বেতার প্রতিষ্ঠানের ভার নেন এক বছরের জন্যে, পরীক্ষা হিসাবে। আর তার নতুন নামকরণ হ'ল —ইণ্ডিয়ান স্টেট ব্রডকাস্টিং সার্ভিস।

কিন্তু এক বছরের মধ্যে বেতারের আর্থিক অবস্থা আশাপ্রদ না হওয়ায় ভারত সরকার বেতার বন্ধ করে দেওয়া সাব্যস্ত করলেন।

বেতারের সেই দুর্দিনে তার কজন আদর্শবাদী পরিচালক বিনা পারিশ্রমিকে সেবার প্রস্তাব সরকারের কাছে করেছিলেন। গল্পদাদা তাঁদের মধ্যে অন্যতম।

শেষ পর্যন্ত নৃপেন্দ্রনাথ মজুমদারের যুক্তিপূর্ণ আবেদনে এবং নানা দিক বিবেচনা করে ভারত সরকার বেতার প্রতিষ্ঠানকে স্থায়ী করবার সিদ্ধান্ত নেন। বেতার-কেন্দ্র বিপন্মুক্ত হয়ে নতুন উদ্যমে পরিচালনা করবার ব্যবস্থা হ'ল। কিন্তু সাংঘাতিক বিপদ ঘনিয়ে এল ছোটদের আসরের ওপর। দু' বছরের মধ্যেই।

গল্পদাদার হাতে-গড়া সাধের আসর যখন জমজমাট এমন সময় অকস্মাৎ তিনি কালব্যাধিতে আক্রান্ত হলেন। ক্যান্সারের কবলিত হয়ে অবসর নিলেন আসর থেকে ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে।

১৯২৭ সালের শেষ থেকে আরম্ভ করে প্রায় ছ বছর যাবৎ এই ছোটদের আসর তাঁর জীবনের অঙ্গস্বরূপ ছিল।

এর জন্যে কত চিন্তা, কত পরিশ্রম, কত পরিকল্পনা, কত পড়াশোনা করতেন তিনি। ছোটদের মুখে হাসি ফোটাবার জন্যে, তাদের মনে নব নব জ্ঞানের দীপ জ্বালাবার জন্যে কত সাধ ও সাধনা তাঁর ছিল।

যেদিন আসর থাকত না, হাইকোর্টের ফেরৎ চলে যেতেন ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীতে। ছোটদের মনের বিচিত্র খোরাক সংগ্রহের জন্যে সেখান থেকে দিনের পর দিন কত উপাদান সংগ্রহ করতেন। বিভিন্ন বিদ্যায় তাঁর জ্ঞান আহরণের সুফল লাভ করত আসরের ছেলেমেয়েরা।

এখন সেসব থেকে তারা বঞ্চিত হ'ল। গল্পদাদা অশেষ যন্ত্রণার মধ্যে যুঝতে লাগলেন রোগ ও বিরুদ্ধ ভাগ্যের সঙ্গে।

সেই সময় তাঁর একমাত্র গ্রন্থ 'গল্পদাদার কথা' প্রকাশিত হ'ল। সে বইতে ছিল তাঁর কতকগুলি প্রিয় গল্প, যা তিনি মুখে মুখে আসরে বলেছিলেন নানা সময়ে। সেই গণেশের জন্ম, পাটলিপুত্র, স-সে-মি-রা, বিক্রমাদিত্য ও অলক্ষ্মী, উৎপল-কুমারী ও চিত্র চণ্ডাল, সুন্দরবনের মঙ্গলচণ্ডী, বিনি সূতার হার, উকিলের ওপর ওকালতী, ভাগ্য বড় না পুরুষকাব বড়, হাম ভি থোড়া থোড়া আক্কিল পায়া, মামা ভাগনে, ইত্যাদি।

বই যখন ছাপা হয়ে হাতে এল, তিনি তখন মৃত্যুশয্যায়।

অন্তিমের কয়েকদিন আগে তিনি কথাপ্রসঙ্গে বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রকে যা বলেছিলেন, তাই তাঁর প্রাণের বার্তা : 'ছোটদের আসরকে বাঁচিয়ে রেখো। আর মাঝে মাঝে আমার নাম করে এদের হাসিও। তা হ'লে আমি স্বর্গে, probably নরকে গিয়েও সুখে থাকব।'

শেষ দিনগুলি নিদারুণ কষ্টের মধ্যে কাটিয়ে, ছোটদের

অনেক কল্যাণ-চিন্তার শেষে, তাদের আনন্দলোকের জন্যে বহু সাধ অপূর্ণ রেখে ইহ-জগৎ থেকে বিদায় নিলেন গল্পদাদা!···

কালের যাত্রায় বছরের পর বছর পার হয়ে গেছে তারপর। সমস্ত ভারতবর্ষের কথাও বলা চলত। কিন্তু তার প্রয়োজন নেই। বাংলার কথাই ধরা যাক।

এত বিপর্যয় এবং তরঙ্গভঙ্গের মধ্যেও দিন দিন উজ্জ্বল হয়ে উঠছে ছেলেমেয়েদের আনন্দ-যজ্ঞের শিখা। তাদের নিজস্ব সঙ্ঘ সভা সমিতি ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গীত নৃত্য অভিনয় অনুষ্ঠানে। চলচ্চিত্রের বৃহৎ প্রচেষ্টায়। তাদের জন্যে রচিত সাহিত্যের বিপুল সম্ভারে। ছোটদের শিক্ষা ও নন্দন জগতের তোরণ-দ্বার এখন উদ্‌ঘাটিত।

কিন্তু তাদের জীবনে এই নতুন জাগরণের স্বপ্ন যিনি অনেকের আগেই দেখেছিলেন, সে স্বপ্নকে সার্থক করতে এগিয়ে এসে নিজের জীবন ও সৃষ্টিকর্মকে উৎসর্গ করেছিলেন, তাঁর কথা অজ্ঞাতই রয়ে গেছে। শুধু তাঁর সেকালের আসরের কোন কোন ভাইবোনের মনের পটে হয়ত উজ্জ্বল হয়ে আঁকা আছে সেই চিত্তাকর্ষক ব্যক্তিত্ব। হয়ত তাদের কোন দুর্লভ অবসর-সন্ধ্যায় স্মৃতির আকাশে এক সুদূর জগতের বেতার ধ্বনিত হয়ে উঠে। ভেসে আসে একটি স্নিগ্ধ সানন্দ কণ্ঠস্বর—'হ্যালো চিলড্রেন গুড ইভনিং। গল্পদাদা কথা বলছে। শুনতে পাচ্ছ?...'

'কথা'-সাহিত্যের পাঁচালিকার

আবহমান কালের অখণ্ড বাংলাদেশ। তখনকার অর্থাৎ দ্বিখণ্ডিত হবার আগেকার কথা।

তার এক সুদূর পূর্ব-উত্তর অঞ্চল। সেই প্রত্যন্ত বিভাগের অভ্যন্তরে পল্লীতে পল্লীতে সহজ সরল বাঁশির সুর রণিয়ে ওঠে। ভেসে বেড়ায় নগর কোলাহলের সীমানা থেকে অনেক দূরে। নীল, অবারিত আকাশের নীচে। সবুজ প্রান্তরের তীর থেকে তার তরী-বাওয়া সুমিষ্ট ধ্বনি শোনা যায়।

বিদগ্ধ সমাজের অগোচরে, নদী-মাতৃক পূর্ববঙ্গের প্রাণের সুর বাজে আপনার ভাবে আপনি মুগ্ধ হয়ে। কেউ তার সন্ধান রাখেনি।

সেই সুরের ধারাকে সাদরে বরণ করে নিয়ে আসেন দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার। বাংলা সাহিত্যের আসরে গুণী-জনের সমক্ষে পরিচিত করে দেন।

যা ছিল বঙ্গের দুস্তর পল্লী অঞ্চলে সঙ্গোপন, তাকে আসনস্থ করেন ব্যাপক পাঠক সমাজের দরবারে। তাঁর প্রয়াসে বিগত বাংলার এক অকৃত্রিম প্রাণ-ধারা বাংলা সাহিত্যের অধ্যায়ে যুক্ত হয়।......

বঙ্গ সংস্কৃতির একটি নিজস্ব দানের দরদী কথক দক্ষিণারঞ্জন। সেই সূত্রে তাঁর স্থানও বাংলা সাহিত্যে নির্দিষ্ট হয়ে আছে। সে ক্ষেত্রে তিনি অনন্য, অ-ি

দক্ষিণারঞ্জনের মৃত্যুর পর প্রায় দু' যুগ উত্তীর্ণ। কিন্তু আজও তাঁর আসন শূন্য। ভবিষ্যতেও পূর্ণ হবার সম্ভাবনা কোথায়? বিভক্ত বাংলায় সে পরিবেশ অপ্রকট। অবিভাজ্য সংস্কৃতি বিপর্যস্ত।

দক্ষিণারঞ্জনের সাহিত্য-চর্চার মূলে যে প্রেরণা, হৃদয় ও দৃষ্টি ছিল তা অখণ্ড বাংলার সৃষ্টি। উদার, অসাম্প্রদায়িক। সে পূর্ববঙ্গও আর নেই। দক্ষিণারঞ্জনের সঙ্গেই অবসান ঘটেছে প্রাচীন বঙ্গের এক মূল্যবান সম্পদের নব সাহিত্যায়ন কর্ম।...

তাঁকে সচরাচর শিশু সাহিত্যের লেখক অভিধায় উল্লেখ করা হয়। তাঁর সমগ্র রচনাবলী কথিত হয়ে থাকে শিশু সাহিত্য বলে। এই আখ্যা অসমীচীন, অযথার্থ। কারণ শিশু বা কিশোর সাহিত্য তাঁর সাহিত্যিক জীবনের অন্যতম উপজীব্য ছিল, মূল নিয়োগ নয়। দক্ষিণারঞ্জনের 'দাদামশায়ের ঝুলি' প্রমুখ রচনাকে মনে করা হয় ছোটদের সাহিত্য। সে ধারণাও ভ্রমাত্মক। তাঁর ওই পর্যায়ের সাহিত্য-কর্ম বৃহত্তর সংস্কৃতির পরিচায়ক।

দক্ষিণারঞ্জনের সমগ্র সাহিত্য সাধনার কেন্দ্রীয় বিষয় বিগত কালের এক লুপ্ত-প্রায় 'কথা'-সাহিত্য। বাঙালীর এক সুপ্রাচীন স্থানীয় সংস্কৃতির অপসৃয়মান ঐতিহ্য। শিক্ষিত সমাজে অপরিচিত এই 'কথা'-সাহিত্যের নিদর্শন পরিবেশন করে বঙ্গ সংস্কৃতির সেবক হয়েছেন দক্ষিণারঞ্জন।

বাংলার 'কথা'-সাহিত্যের বিভিন্ন পর্যায়, আংশিক ভাবে হলেও, তিনি রচনায় পুনরুজ্জীবিত করেছেন। পরম্পরাগত সেই ধারার চারটি বিভাগ বা রূপ: গীতিকথা, রূপকথা, ব্রতকথা এবং রসকথা।

চার অংশে বিধৃত এই সাহিত্য ভাণ্ডারের বিপুল ঐশ্বর্যের দিকে দক্ষিণারঞ্জনের কবি-মন আকৃষ্ট হয়েছিল। তার নব রূপায়নের সাধনায় তিনি মগ্ন থাকেন সুদীর্ঘকাল। সেই অনাবিষ্কৃত জগতের সামগ্রিক পরিচয় দেওয়া কোন একক সাহিত্যিকের পক্ষে অসাধ্য। দক্ষিণারঞ্জনের বহু বছরের একান্ত আত্মনিয়োগ সত্ত্বেও তা সম্ভব হয়নি। কিন্তু, আংশিক ভাবে হলেও সেই সাহিত্যের নির্ভরযোগ্য নিদর্শন ও স্বাদ তিনি রক্ষা করেছেন স্বরচিত গ্রন্থাবলীতে। তিনি এ বিষয়ে পথিকৃৎ এবং সার্থক লেখক। দৃষ্টান্ত-স্থানীয় পাঁচালিকার। তাঁর বর্ণাঢ্য কাব্যময় ভাষায় তার আংশিক প্রকাশন বাংলা সাহিত্যে অমূল্য সংযোজন হয়ে আছে।

দক্ষিণারঞ্জনের সাহিত্য-জীবনের মূল উৎস সেই 'কথা'-সাহিত্যের বাহনে নিহিত।

তাঁর মুখ্য রচনাবলী তার চারটি রূপ-বিভাগেরই ধারা-রক্ষী।

তাঁর 'দাদামশায়ের ঝুলি'-তে গীতিকথার রূপ পাওয়া যায়। এটি সম্ভবত তাঁর সব চেয়ে প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। তার মালঞ্চমালা, পুষ্পমালার কাহিনী আকৃষ্ট করেছে অসংখ্য পাঠককে। একটি প্রাচীন ধারা আধুনিক কালে বহু পরিচিত হয়েছে। এই মালঞ্চমালা, পুষ্পমালার উপাখ্যানকেই অনেকে মনে করেছেন শিশু সাহিত্য।

দক্ষিণারঞ্জনের ভাষা ও প্রকাশ-শৈলীর গুণে এর কোন কোন গল্প বা গল্পাংশ কিশোরদের হয়ত মনোরঞ্জন করতে পারে। কিন্তু এই সমস্ত গীতিকথা আসলে উচ্চাঙ্গের 'কথা'-সাহিত্য, রীতিমত উপন্যাস। রোমান্সও বলা যেতে পারে।

গীতিকথার প্রাচীনতা এবং বৌদ্ধ লক্ষণাদি সম্পর্কে দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় তাঁর "বৃহৎ বঙ্গ" প্রভৃতি গ্রন্থে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। এখানে পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন।

কথাসাহিত্যের 'ব্রতকথা' বিভাগটি সম্পূর্ণভাবে মেয়েদের জন্যে। এর বিষয়বস্তুও নারীদের নিজস্ব। দক্ষিণারঞ্জন এই ব্রত কথাগুলির সঙ্কলন করেছেন তাঁর 'ঠানদিদির থলে' পুস্তকে।

বাংলার স্ত্রী-আচারের কথা বিশেষভাবে জানতে হলে এই মেয়েলী সাহিত্য অপরিহার্য। এ বিষয়ে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং ইন্দিরা দেবী চৌধুরানীও দুটি মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেছেন, প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায়।

'ঠানদিদির থলে'তে শুধু কুমারীদের করণীয় অনেক ব্রতের পরিচয় দিয়েছেন দক্ষিণারঞ্জন। তার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য —'ভাতুলি ব্রত'। এটি দক্ষিণারঞ্জনেরই প্রথম আবিষ্কার এবং ঢাকা ও ময়মনসিংহ এই দুই অঞ্চল থেকে আংশিকভাবে পেয়ে একত্র গ্রথিত করেছিলেন।

এই গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে আছে বিবাহিতা মেয়েদের ব্রত-কথার সংগ্রহ। কিন্তু সে খণ্ডের পাণ্ডুলিপি আজো অপ্রকাশিত আছে।

এই সমস্ত ব্রতকথা সংগ্রহে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে বিশেষ উৎসাহ দিতেন এবং তাঁর সস্নেহ তাড়নাতেই সেগুলি অনেকাংশে সঙ্কলন করেছিলেন দক্ষিণারঞ্জন।

ব্রতকথা সংগ্রহের কাজে আর একজনের সাহায্য, পরামর্শ এবং উপদেশের কথা শেষ বয়সেও তিনি শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ

করতেন। তিনি ছিলেন তাঁর পিসিমা। পরে তাঁর প্রসঙ্গ বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন হবে।

'কথা'-সাহিত্যের 'রূপকথা' বিভাগে আছে শিশু ও কিশোরদের উপযোগী সাহিত্য। এই বিভাগটি দক্ষিণারঞ্জন রূপায়িত করেছেন 'ঠাকুরমার ঝুলি' এবং 'চিরদিনের রূপ-কথা'য়। এই রূপকথাগুলিই যথার্থ শিশুসাহিত্য।

'কথা'-সাহিত্যের চতুর্থ বিভাগটি হল 'রসকথা'। রসকথার গল্পগুলির মধ্যে দস্তুরমত 'হিউমার' আছে এবং এগুলিকে বৈঠকী গল্পও বলা চলে। এই পর্যায়ের 'কথা' তিনি সংগৃহীত করেছেন 'দাদামশায়ের থলে' বইখানিতে।

এমনিভাবে দক্ষিণারঞ্জন 'কথা'-সাহিত্যের চারটি বিভাগের সঙ্গেই বাংলা সাহিত্যের পাঠক সাধারণকে পরিচিত করিয়েছেন। প্রধানত 'কথা'-সাহিত্যের রূপকার রূপেই বাংলা সাহিত্যে স্মরণীয় হয়ে থাকবেন তিনি।

তাঁর সাহিত্যজীবনের মূল প্রেরণা ও সাধনা যে শিশু-সাহিত্য নয়, তা তাঁর জীবনকথা থেকেও বোঝা যায়।··

তার বৃত্তান্ত সংক্ষেপে দেওয়া হল এখানে।

দক্ষিণারঞ্জনের জন্ম সন ১২৮৪, ২রা বৈশাখ (১৮৭৭ সালের এপ্রিল মাসে)। পূর্ব বাংলার ঢাকা জেলায় সাভারের কাছে উলাইল গ্রাম তাঁর জন্মস্থান।

তিনি রমদারঞ্জন মিত্র মজুমদার এবং শ্রীমতী কুসুমময়ীর একমাত্র পুত্র।

উলাইলে তাঁদের আঠারো সরিকের অংশ নিয়ে নিষ্কর, বিরাট বাড়ি ছিল। কিন্তু ধলেশ্বরী নদী তার সমস্তই গ্রাস করে অনেককাল আগে।

উলাইলের মিত্র মজুমদার বংশ অতি প্রাচীন। তিনশ বছর আগে এই বংশীয় উদয়নারায়ণের রাজা খেতাব ছিল। মহারাজা প্রতাপাদিত্যের জামাতা, চন্দ্রদ্বীপের রাজা রামচন্দ্রের দৌহিত্রবংশীয় ছিলেন উদয়নারায়ণ।

দক্ষিণারঞ্জন বলতেন, তার মাতৃকুলের সঙ্গেও প্রতাপাদিত্য বংশের সম্পর্ক ছিল।

ন' বছর বয়সে দক্ষিণারঞ্জনের মাতৃ-বিয়োগ ঘটে। ছেলে বেলায় অত্যন্ত দুরন্ত থাকায় তখনো পর্যন্ত লেখাপড়া বিশেষ আরম্ভ হয়নি তাঁর। তার ওপর জননীর মৃত্যুতে আরো বড় বাধা পড়ল।

বালক দক্ষিণারঞ্জনকে দেখাশোনা করবার জন্যে নিয়ে যাওয়া হল রমদারঞ্জনের ভগ্নী শ্রীমতী রাজলক্ষ্মী চৌধুরানীর কাছে। ময়মনসিংহের টাঙ্গাইল মহকুমার দিকপাইত গ্রামে।

সেখানে নিঃসন্তান বিধবা পিসিমার আদরযত্নে তিনি বড় হতে লাগলেন। কিন্তু লেখাপড়ার কাজ পিছিয়েই রইল।

পিসিমার স্নেহচ্ছায়ায় প্রায় পঁচিশ বছর বয়স পর্যন্ত দক্ষিণারঞ্জন সেখানে থাকেন, মাঝে মাঝে স্কুল ইত্যাদির জন্যে বিচ্ছিন্ন হওয়া ভিন্ন।

তাঁর স্নেহে দক্ষিণারঞ্জনের শুধু যে মাতৃ অভাব পূর্ণ হল তাই নয়। তাঁর পরবর্তী সাহিত্য জীবনেও তিনি সর্বপ্রকারে সাহায্য ও উৎসাহ দিয়েছিলেন দক্ষিণারঞ্জনকে। তা ছাড়া, অতি শিশুকাল থেকে মায়ের মুখে রূপকথা শুনে যে আগ্রহ ও আনন্দ জাগত তাঁর, পিসিমার কাছে তা চরিতার্থ হয়েছিল।

তিনি রূপকথা ও গীতিকথা বলতে পারতেন অতি সুন্দর

করে, যার ফলে রূপকথা ও গীতিকথার প্রতি দক্ষিণারঞ্জনের মন সবিশেষ আকৃষ্ট হয়ে পড়েছিল।

তাঁর লেখাপড়ায় নানা বাধাবিপত্তি আসে। ফলে ষোলো বছর বয়সে তিনি প্রথম স্কুলে ভর্তি হন তখনকার সপ্তম শ্রেণীতে। ঢাকার জগন্নাথ কলেজিয়েট স্কুলে।

সেখানে তিন বছর পড়বার পর ফিরে আসেন সন্তোষ গ্রামে। 'সন্তোষ জাহ্নবী হাই স্কুলে' পড়েন দু বছরের কিছু বেশী।

এখানে তিনি স্কুলের বোর্ডিং-এ ছিলেন এবং এই বোর্ডিং জীবনে একটি কৌতুককর ঘটনা ঘটে। একটি ছেলের কোন জিনিস চুরি যাওয়ায় বোর্ডিং-এর সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট তল্লাস করেন সব ছাত্রদের জিনিসপত্র। দক্ষিণারঞ্জনের বাক্স থেকে পাওয়া যায় বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস।

তখনকার কালে উপন্যাস, বিশেষ বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস, ছাত্রদের পক্ষে নিষিদ্ধ ছিল। যদিও দক্ষিণারঞ্জনের বয়স তখন ১৮।১৯, তবু তিনি এ অপরাধে অপরাধী সাব্যস্ত হলেন এবং শাস্তি পেলেন।

তাঁর নিকটে প্রাপ্ত বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থাবলী বাজেয়াপ্ত করা হ'ল। সেদিনকার শাস্তিলাভ এবং শাস্তিলাভের কারণটির কথা মনে করে তিনি অতি দুঃখে ভেবেছিলেন—যদি বড় হয়ে সাহিত্যিক হতে পারি, ছেলেদের জন্যে লিখব।

ছোটদের অসহায়ত্বই সেদিন তাঁকে মর্মপীড়া দিয়েছিল বেশি করে। বোর্ডিং কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি এড়িয়ে তিনি সঙ্গোপনে আগে থেকেই কবিতা রচনা আরম্ভ করেছিলেন।

একুশ বছর বয়সে পিতার সঙ্গে মুর্শিদাবাদ চলে আসেন

দক্ষিণারঞ্জন। এখানে পাঁচ বছর বাস করেন। মুর্শিদাবাদে আসবার পরও তাঁর স্কুল জীবন চলতে থাকে। সাহিত্য জীবনও আরম্ভ হয় সেই সঙ্গে।

প্রদীপ, সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা ইত্যাদিতে তাঁর রচনা প্রকাশিত হতে থাকে। এখানে আসবার এক বছর আগে তাঁর প্রথম যে লেখা প্রকাশিত হয়েছিল তা একটি কবিতা (প্রকৃতি)। সুতরাং দেখা যায়, তিনি কবিতা নিয়ে সাহিত্যক্ষেত্রে প্রবেশ করেছিলেন।

পিতা রমদারঞ্জন গঙ্গাবাসের জন্যে মুর্শিদাবাদে এসেছিলেন। দক্ষিণারঞ্জনকে নিয়ে বাস করতেন নবাব বাড়ির বিপরীত দিকে। রমদারঞ্জন কবিপ্রকৃতির মানুষ ছিলেন এবং নানা বিষয়ে পড়াশোনা করতে ভালবাসতেন।

তাঁর একটি ভাল লাইব্রেরি ছিল আর দক্ষিণারঞ্জনের সেখানে ছিল অবারিত দ্বার।

পিতার কবি-স্বভাব, প্রকৃতি-অনুরাগ এবং সাহিত্য-প্রীতি দক্ষিণারঞ্জন স্বাভাবিকভাবেই লাভ করেছিলেন। প্রকৃতি পরিচয়ের প্রথম পাঠও তিনি নেন পিতার কাছে।

ছেলেবেলায় উলাইলে থাকবার সময় তিনি প্রতিদিন পিতার সঙ্গে নদীতে স্নান করতে যেতেন। নদীটি ছিল বাড়ি থেকে বেশ খানিক দূরে। যাতায়াতের পথে, নদীর ধারে চারিদিকের ফুল ফল গাছপালার সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয় তখন তিনি পিতার কাছেই লাভ করেছিলেন।...

মুর্শিদাবাদে বাসের সময় ১৩০৮ সালে (১৯০১) তিনি "সুধা" নামে মাসিক-পত্র প্রকাশ আরম্ভ করেন। চার বছর বর্তমান ছিল পত্রিকাটি এবং শিক্ষিত সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ

করেছিল। 'সুধা'-র নিয়মিত লেখকবর্গের মধ্যে ছিলেন ঐতিহাসিক কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়,নিখিলনাথ রায় প্রভৃতি। দক্ষিণারঞ্জন লিখতেন কবিতা এবং নানাবিষয়ে প্রবন্ধ।

'সুধা'-য় তিনি বাংলা সাহিত্য সম্মেলনের এক পরিকল্পনাও প্রকাশ করেন। পত্রিকা মুদ্রিত করবার জন্যে তিনি প্রতি মাসে কলকাতায় আসতেন এবং ব্রাহ্ম মিশন প্রেস থেকে মুদ্রণ শেষ করে মুর্শিদাবাদ ফিরে যেতেন।

এইভাবে চার বছর চলবার পর মুর্শিদাবাদে পিতার মৃত্যু হয়। তারপর তিনি পত্রিকা প্রকাশনা বন্ধ করে চলে আসেন ময়মনসিংহে, তাঁর পিসিমার কাছে।

তাঁর প্রথম কবিতা পুস্তক "উত্থান" ইতিমধ্যে (১৯০২ খৃঃ) আত্মপ্রকাশ করেছিল। ময়মনসিংহে আসবার পরে পিসিমার জমিদারি পরিদর্শনের ভার পড়ল তাঁর ওপর।

এই কাজের জন্যে তাঁকে প্রায়ই দূর গ্রামাঞ্চলে যাতায়াত করতে হত। জলপথে ও স্থলপথে। কৈশোরের বহুকাল পরে প্রকৃতির নিবিড় সান্নিধ্যে তিনি এমনিভাবে পুনরায় ফিরে এলেন। এবার পূর্ণ বিকশিত মন নিয়ে।···

এমনিভাবে নদীপথে আসা যাওয়ার মধ্যেই দক্ষিণারঞ্জন সাহিত্যের অপূর্ব বিষয়বস্তু লাভ করলেন। নব দিগন্তের উদয় হল তাঁর সাহিত্যিক-জীবনে।

একদিন তিনি পিসিমার কাজে বজরায় চলেছেন। অপরাহ্ণের আলো তখন ছল্‌ছল্‌ করছে নদীজলে। তাঁর গন্তব্যস্থল তখনো কিছু দূরে। সন্ধ্যা হতেও দেরি আছে।

এমন সময় দেখলেন, তাঁর বজরার পাশ দিয়ে একটা পান্‌সি চলে গেল বিপরীত দিকে।

পান্‌সির মধ্যে কয়েকজন অতি মিষ্ট গ্রাম্য সুরে গান গাইছিল। সেই সুরের রেশ ভেসে এল তাঁর কানে।

বজরার ছাদ থেকে তিনি ভাল করে শুনলেন তাদের গান। নদীর বুকে, অবাধ আকাশের নীচে। সেই উন্মুক্ত আবেগের সুর তাঁর প্রাণে অপূর্ব সাড়া জাগাল। তিনি শুনে মুগ্ধ হলেন তাদের গান।

সে গানের বিষয় ছিল একটি গীতিকথা। সেই গীতিকথার আবেদনে তিনি অভিভূত হয়ে গেলেন। আর তার প্রভাব তাঁর জীবনে হল যুগান্তকারী।

সেই গীতিকথার আকর্ষণ, সেই 'কথা'-সাহিত্যের রসের আভাস সেইদিন থেকে তাঁর মনকে একমুখী করে দিলে। গীতিকথার ঘনিষ্ঠ পরিচয় লাভের জন্যে উন্মুখ হয়ে উঠলেন দক্ষিণারঞ্জন।

পান্‌সির লোকদের সম্বন্ধে খবর নিয়ে জানলেন, তারা তাঁর পিসিমার জমিদারিরই প্রজা।

একদিন তাদের ডাকিয়ে আনালেন কাছারি বাড়িতে, গান শোনাবার জন্যে। কিন্তু সে বেচারীরা সঙ্কোচে রাজী হল না। তাদের ভয়, লেখাপড়াজানা বাবু ঠাট্টা তামাশা করবেন তাদের গান শুনে।

তখন দক্ষিণারঞ্জন তাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়ে সঙ্কোচ দূর করবার চেষ্টা করলেন। তাদের সঙ্গে পান্‌সিতে ঘুরে বেড়িয়ে তাদের মন জয় করলেন তিনি।

তারা তাঁর আন্তরিকতার পরিচয় পেয়ে তাদের জানা গীতিকথার কাহিনীগুলি একটির পর একটি তাঁকে শোনাতে

লাগল। গীতিকথার বিশিষ্ট ভাষায় এবং পরিবেশে এবার তার আস্বাদ পেলেন দক্ষিণারঞ্জন।

এই ঘটনার আগে পর্যন্ত সাহিত্যে তাঁর প্রবণতা ছিল কবিতা এবং গুরুগম্ভীর প্রবন্ধ রচনার দিকে।

কিন্তু এইসব নিরক্ষর দাঁড়ী মাঝিদের মুখে গীতিকথার সহজ, কাব্যময় এবং প্রাণস্পর্শী আবেদনে তাঁর সাহিত্য-মানস এক নবরসে আপ্লুত হল।

তিনি অনুভব করলেন—বঙ্গ সংস্কৃতির এক অমূল্য সম্পদ। কিন্তু তা অনাবিষ্কৃত ও অনাদৃত অবস্থায় লোকচক্ষুর অন্তরালে রয়েছে।

দক্ষিণারঞ্জনের দৃঢ় বিশ্বাস হল, এই মুখে মুখে রক্ষিত সাহিত্য বাঙ্গালী জাতির এক বিশিষ্ট দান। সভ্য জগতের সামনে বাংলার এক গৌরবময় পরিচয় হিসেবে তুলে ধরবার যোগ্য। তাঁর মনে হল, এই ঐতিহ্যের পুনরুদ্ধার করা তাঁর জীবনের প্রধান কর্তব্য।

তারপর থেকে আরম্ভ হল তাঁর সাহিত্য-পথে নতুন যাত্রা।

দক্ষিণারঞ্জন ঢাকা ও ময়মনসিংহের অতি নিভৃত পল্লী অঞ্চলে নিরন্তর ভ্রমণ করতে লাগলেন। আর তাঁর ভাণ্ডারে সঞ্চিত হতে লাগল সেই 'কথা'-সাহিত্যের নানা নিদর্শন। তাদের অকৃত্রিম রূপ।

প্রায় বারো বছর ধরে বিভিন্ন পর্যায়ে তাঁর এই সংগ্রহ ও সঙ্কলনের কাজ চলেছিল। রীতিমত গবেষকের ধৈর্য ও নিষ্ঠার সঙ্গে তিনি এই ভাবে নিযুক্ত থাকেন দীর্ঘকাল, নিরলসভাবে।

এ শুধু গল্পগুলি শুনে তার অনুলিপি করা নয়। অনেক

সময় একই কাহিনীর ভিন্ন ভিন্ন সংস্করণ তিনি পেতেন বিভিন্ন অঞ্চল থেকে। তাদের মধ্যে নির্বাচন এবং প্রয়োজন বোধে সংস্কার করে তাঁকে লিখিতরূপে সাজাতে হত। অনেক ক্ষেত্রে গল্প সম্পূর্ণ আকারে পাওয়া যেত না। সেজন্যে তিনি অতি যত্নে সেইসব ভাষা, ছন্দ, সুর এবং আবহের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে ছিন্ন সূত্র যোজনা করতেন।

তা ছাড়া কাহিনীগুলিকে বিষয় অনুসারে ভাগ করতে হত গীতিকথা, ব্রতকথা, রূপকথা এবং রসকথা বিভাগে।

এই সমস্ত রচনা এবং পরিমার্জনার কাজ চলত তাঁর পিসিমার বাড়িতে। দোতলার একটি নিরালা ঘরে। 'কথা'-সাহিত্যের রত্নচয়নে তন্ময় হয়ে তিনি ঘণ্টার পর ঘণ্টা অতিবাহিত করতেন। কাটাতেন গভীর বিনিদ্র কত রজনী। এই নতুন সাহিত্য প্রচেষ্টায় পিসিমার উৎসাহ ও সহানুভূতি তিনি যথেষ্ট পান। সেই সঙ্গে, গীতিকথা ও ব্রতকথা সঙ্কলনে নানাভাবে সাহায্যও।

একদিন দূর পল্লীতে সংগ্রহের জন্যে তিনি ভ্রমণ করছেন।

এমন সময় শুনলেন—কাছেই থাকেন এক বৌদ্ধ সন্ন্যাসিনী। অনেক গীতিকথা তার কণ্ঠস্থ আছে।

সন্ধান নিয়ে তিনি দেখা করলেন সন্ন্যাসিনীর সঙ্গে। একটি দ্বীপের মতন স্থানে, টিলার মধ্যে গুহার ধরনের একটি ঘরে সন্ন্যাসিনীর বাস।

তখন তিনি অতি বৃদ্ধা। বয়স আশী পার হয়ে গেছে। তাঁর সঙ্গে দক্ষিণারঞ্জন পর পর কয়েকদিন সাক্ষাৎ করলেন। শুনলেন অনেক প্রাচীন গীতিকথা।

বার্ধক্যের জড়তার জন্যে তাঁর সব কথা বোঝা যেত না।

লিখে নিতে অসুবিধা হত। তখন এক অভিনব উপায় উদ্ভাবন করলেন দক্ষিণারঞ্জন।

একটা মামুলী 'ফনোগ্রাফ' তৈরী করে নিয়ে বৃদ্ধার কাছে যেতেন। তাঁর কথা রেকর্ড করে এনে বাড়িতে শুনতেন আর লিখে নিতেন। ফনোগ্রাফের সরঞ্জামের মধ্যে ছিল সেকালের সেই চোঙ্গা আর মোমে রেকর্ড করবার ব্যবস্থা।

এই সন্ন্যাসিনীর মুখেই তিনি গীতিকথার বিশিষ্ট, স্থানীয় ভাষার সন্ধান পান। মালঞ্চমালার কথাও প্রথম শোনেন এঁর কাছে। মালঞ্চমালার কাহিনী এঁর কাছে অবশ্য সম্পূর্ণ আকারে পাননি। আরো কয়েক স্থান থেকে পরে সংগ্রহ করেছিলেন মালঞ্চের 'কথা'-র পূর্ণ রূপ।

সন্ন্যাসিনীর মুখে যে প্রাচীন বাংলা ভাষার নমুনা পেয়েছিলেন 'ঠাকুরদাদার ঝুলি' প্রথম মুদ্রণে সেই ভাষা যথাযথ তিনি ব্যবহার করেছিলেন। কিন্তু অক্ষয়চন্দ্র সরকার ("সাধারণী" সম্পাদক) প্রমুখ কেউ কেউ সে ভাষাকে দুর্বোধ্য বলে বর্জন করতে বলেন দক্ষিণারঞ্জনকে।

'ঠাকুরদাদার ঝুলি'র পরের সংস্করণে তিনি সেই সব অপ্রচলিত শব্দ পরিবর্তিত করে দেন। নচেৎ রক্ষা পেত স্থানীয় ভাষার কিছু খাটি নমুনা।...

১৯০৬ সালে দক্ষিণারঞ্জন কলকাতায় এলেন, পূর্ববঙ্গের 'কথা'-সাহিত্যের সঞ্চয় সঙ্গে নিয়ে। তখন থেকেই তিনি এ শহর নিবাসী। তবে মাঝে মাঝেই ঢাকা ময়মনসিংহে যাতায়াত করতেন। পল্লী গাথা সংগ্রহের কাজ তখনো ছিল অব্যাহত।

কলকাতায় গল্পগুলিকে তিনি লিখিত, মার্জিত রূপ

দিলেন। পুস্তকাকারে প্রকাশের চেষ্টা করতে লাগলেন।

এই সময়ে এক মহা 'শিক্ষিত' (ট্রিপ‌্‌ল্ এম. এ.) ব্যক্তিকে 'ঠাকুরমার ঝুলি' পাণ্ডুলিপি পড়তে দেন মতামতের জন্যে।

পড়বার পর ভদ্রলোক গম্ভীরভাবে বলেছিলেন, 'এ বই ছাপা হলে লোকে পাগল ভাববে না ত?'

দক্ষিণারঞ্জনের অভিমানী মন। কলকাতাতেও এসেছেন নতুন। তিনি ওই মন্তব্যের পর সঙ্কোচে কোন প্রকাশকের সামনে উপস্থিত হলেন না। স্থির করলেন, নিজেই প্রকাশ করবেন প্রেস পত্তন করে।

পিসিমার সাহায্যে, আরেক জনের সহযোগিতায় ছাপা-খানা ক্রয় করাও হল। তখন তাঁর সাহিত্য জগতেও প্রতিষ্ঠা হচ্চে নানা প্রথম শ্রেণীর পত্রিকায় লেখার ফলে।

সে সময় তাঁর 'পুষ্পমালা' স্বর্ণকুমারী দেবীর 'ভারতী'-তে প্রকাশিত হল। সম্পাদিকার উৎসাহ পেয়ে দক্ষিণারঞ্জন ভরসা পেলেন মনে। 'ঠাকুরমার ঝুলি' নিজের প্রেসেই ছাপাবার আয়োজন করলেন।

এমন সময় হঠাৎ তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এলেন দীনেশ চন্দ্র সেন। কিছুদিন আগে দক্ষিণারঞ্জনের লেখা বারোজন কবির 'মনসামঙ্গল' প্রবন্ধ 'সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা'য় পড়ে সেনমহাশয় তাঁর সঙ্গে আলাপ করতে আসেন।

প্রেসের সেই দোতলায় বসে সাগ্রহে তিনি দক্ষিণারঞ্জনকে বললেন, 'অন্ধ হরিদাসের আর কোন রচনা যদি থাকে, পরিষৎ পত্রিকায় দিন।'

কথার মধ্যে তাঁর দৃষ্টি পড়ল টেবিলে পাণ্ডুলিপির দিকে। জিজ্ঞেস করলেন, 'ওটা কি?'

'ঠাকুরমার ঝুলি।'

পাণ্ডুলিপি চেয়ে নিয়ে দীনেশচন্দ্র পড়তে লাগলেন।

খানিক পড়বার পরই জানতে চাইলেন, 'এইসব গল্প ছাপাবার কি ব্যবস্থা করেছেন?

সসঙ্কোচে দক্ষিণারঞ্জন বললেন, 'ভাবছি এই প্রেসেই ছেপে বার করব।'

দীনেশচন্দ্র উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে উঠলেন, 'আপনি যে বাংলা দেশের কত বড় কাজ করেছেন, তা বোধহয় জানেন না। বাংলা সাহিত্যে এ বই একেবারে নতুন জিনিষ। শুনুন, আপনি নিজে ছাপবেন না। কারণ তাহলে এর উপযুক্ত প্রচার হবে না। আমি ভাল পাবলিশার ঠিক করে দিচ্ছি। সেখান থেকে বই বার করুন, লোকে জানতে পারবে।'

তিনি প্রকাশ করতে বললেন ভট্টাচার্য সন্সের নাম করে। 'আমিই আপনার সঙ্গে পরিচয় করে দিয়ে সে ব্যবস্থা করব।'

কথা রেখেছিলেন দীনেশচন্দ্র। আর, সেই প্রথম দিন থেকে উৎসাহ, ভরসা, সাহায্য দিয়ে দক্ষিণারঞ্জনের সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠার পথ সুগম করে দিলেন। জীবনের শেষ পর্যন্তই তিনি থাকেন দক্ষিণারঞ্জনের পরম শুভার্থী।

বাংলা দেশ, তার সংস্কৃতি ও ইতিহাসের অক্লান্ত-কর্মা গবেষক দীনেশচন্দ্র মনে প্রাণে স্বজাতি ও স্বদেশপ্রেমী। বঙ্গ সংস্কৃতির একটি দিকের সাধনায় তন্নিষ্ঠ দক্ষিণারঞ্জনকে তাই তিনি অন্তরঙ্গ সুহৃদ করে নিলেন। তারপর থেকে 'কথা'-সাহিত্যের যত বই তাঁর রচিত ও প্রকাশিত হয়েছে,

তার প্রত্যেকটিতে মিশ্রিত থাকে দীনেশচন্দ্রের শুভ কামনা। সাহিত্য-জীবন থেকে আরম্ভ করে ব্যক্তিগত জীবনেও দক্ষিণারঞ্জন তাঁকে শ্রেষ্ঠ হিতৈষী মনে করতেন।

আমৃত্যু দীনেশচন্দ্রের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল তাঁর। অন্তিমেও তাঁকে শেষ দেখা করবার জন্যে সেনমহাশয় খবর পাঠান। দক্ষিণারঞ্জন যখন তাঁর শয্যা পাশে এসে দাঁড়ালেন, তখন তাঁর বাক্‌ রোধ হয়েছে। কিন্তু জ্ঞান ছিল। ঊর্ধ্ব দিকে আঙুলের সঙ্কেতে জানালেন—চল্‌লুম !

পরের দিনই তাঁর দেহান্ত হয়েছিল।

দীনেশচন্দ্রেরই উদ্‌যোগে রবীন্দ্রনাথ ভূমিকা লিখে দেন 'ঠাকুরমার ঝুলি'-র। বইখানি (১৯০৭ সালে) প্রকাশিত হলে দীনেশচন্দ্রের আশা সার্থক হয়েছিল। শ্রীঅরবিন্দ ('বন্দে মাতরম্‌' পত্রিকায়) প্রমুখ বাংলার অনেক মনস্বী অকুণ্ঠ প্রশংসা করেন দক্ষিণারঞ্জনকে।

তখন বঙ্গ-ভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে বাংলাদেশে নব-জাগরণের প্লাবন। বাঙ্গালীর মুকুলিত জাতীয়তাবোধ আত্ম-প্রকাশ করছিল জীবন ও সংস্কৃতির নানা ক্ষেত্রে। দক্ষিণারঞ্জনের সাহিত্যকর্ম তার সঙ্গে একাত্ম হল। কলকাতায় থেকে তিনিও জাতীয় কর্তব্য পালন করলেন 'মা বা আহুতি' নামে স্বরচিত গানের ডালি প্রকাশ করে (১৯০৮)। তাঁর এই গানগুলি এত জনপ্রিয় হয় যে এক সপ্তায় তিন হাজার পুস্তক বিক্রিত হয়ে যায়। সে সময় জাতীয়তাবাদী মাসিক 'সারথী'-রও প্রধান সম্পাদক হন দক্ষিণারঞ্জন। এই পত্রিকায় তাঁর অনেক রাজনৈতিক প্রবন্ধ প্রকাশ পায়।

তার পরের বছর (১৯০৯) প্রকাশিত বইখানিই পরে হয়েছিল বহুবিখ্যাত—'বঙ্গোপন্যাস—ঠাকুরদাদার ঝুলি।' দক্ষিণারঞ্জন এবার সাহিত্য-জগতে সুপ্রতিষ্ঠ হলেন। রবীন্দ্রনাথ এবং শ্রীঅরবিন্দ ভিন্ন তাঁকে অভিনন্দন জানালেন রমেশচন্দ্র দত্ত, নাট্যাচার্য গিরিশচন্দ্র, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, চিত্তরঞ্জন দাস, বিপিনচন্দ্র পাল প্রমুখ বাংলার বরেণ্য সুসন্তান। বিশেষ লক্ষণীয়, তাঁরা দক্ষিণারঞ্জনকে শিশুসাহিত্য রচনাকার বলে কীর্তিত করেননি। পরন্তু তাঁর দুখানি পুস্তকই স্বীকৃত হয়েছিল বঙ্গ সংস্কৃতির পরিচয়-বাহী সাহিত্য-সৃষ্টি রূপে।

'ঠাকুরমার ঝুলি' ও 'ঠাকুরদাদার ঝুলি' পাঠ করে পণ্ডিত-প্রবর হরপ্রসাদ শাস্ত্রী তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসেন। দক্ষিণারঞ্জন তখন বাস করতেন ভবানীপুর পদ্মপুকুর রোডে।

শাস্ত্রী মহাশয় তাঁকে আশীর্বাদ জানিয়ে বলেছিলেন, 'একটা কাজ করেছেন।'

'কথা'-সাহিত্যের আরো কি কি সঞ্চয় তাঁর আছে তারও খোঁজ নিয়েছিলেন হরপ্রসাদ। দক্ষিণারঞ্জনের সাহিত্য জীবনের সে এক পরম গৌরবের দিন!

তারপর ১৯১০ সালে (আরেকজনের সহযোগিতায়) তাঁর দু'খণ্ডে রচিত 'আর্যনারী' প্রকাশিত হয়। তার প্রথম খণ্ডে থাকে বৈদিক ও পৌরাণিক যুগের এবং দ্বিতীয় খণ্ডে রানী ভবানী পর্যন্ত ঐতিহাসিক পর্বের ভারতীয় নারীর পরিচয় কথা।

'আর্যনারী'-র পর দক্ষিণারঞ্জনের বই 'চারু ও হারু' (১৯১২)। এটি তাঁর শিশুসাহিত্যে উল্লেখ্য মৌলিক দান এবং সম্ভবত বর্তমান কালের প্রথম কিশোর উপন্যাস। তার আগে ছোটদের জন্যে তাঁর 'খোকাখুকুর খেলা' ও 'আমাল বই' দুখানি বেরিয়েছিল।

তারপর প্রকাশিত হয় 'ব্রতকথা—ঠানদিদির থলে' (১৯১২) এবং 'রসকথা—দাদামশায়ের থলে' (১৯১৩)। 'কথা'-সাহিত্যের চারটি বিভাগের পরিচয় দান সম্পূর্ণ করেন দক্ষিণারঞ্জন। এতদিনে তাঁর বহু বছরের উদ্‌যোগ, সাধন, আশা অনেকাংশে ফলবতী হল।

আগেই দেখা গেছে, তিনি স্বাক্ষর রেখেছেন সাহিত্যের নানা শাখায়। 'রসকথা—দাদামশায়ের থলে'র পরও তাঁর বিভিন্ন-মুখীন সাহিত্য-কৃতির পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর 'পূজার কথা' (১৯১৮), 'ভাদ্র' ইত্যাদি তার সাক্ষ্য।

১৯২৭ থেকে প্রধানত শিশু-সাহিত্য রচনায় দক্ষিণারঞ্জন আত্মনিয়োগ করলেন। 'ফার্স্ট বয়', 'লাস্ট বয়', 'উৎপল ও রবি' 'কিশোরদের মন', 'বাংলার সোনার ছেলে' (রবীন্দ্রনাথের কথা), 'পৃথিবীর রূপকথা', 'সবুজ লেখা', 'চিরদিনের রূপকথা', 'আমার দেশ', 'আশীর্বাদ ও আশীর্বাণী' প্রভৃতির জন্যে শিশু-সাহিত্যে একজন আচার্য-স্থানীয় গণ্য হলেন তিনি। তাঁর কোন নতুন 'কথা'-গ্রন্থ আর তারপর প্রকাশিত না হওয়ায় সাধারণভাবে দক্ষিণারঞ্জন শিশুসাহিত্যের লেখক বলে পরিচিত রইলেন। তবে, যাঁরা বাংলা সাহিত্যে ওয়াকিবহাল তাঁদের কাছে অবশ্যই নয়।

শেষোক্ত বইগুলির মধ্যে 'পৃথিবীর রূপকথা' অনুবাদ।

আর 'চিরদিনের রূপকথা' হল 'কথা'-সাহিত্যের রূপকথা বিভাগ। তা ভিন্ন সমস্ত বইগুলি তাঁর মৌলিক রচনা। তার মধ্যে আছে তাঁর গল্প, কবিতা, জীবনী, প্রবন্ধ, নাটিকা, গান, বিজ্ঞান প্রসঙ্গ ইত্যাদি সর্বপ্রকার শিশু-সাহিত্য। মৌলিক রূপকথা রচনায় তাঁর নৈপুণ্যের স্বাক্ষর আছে 'সবুজ লেখা'য়।

মনে রাখবার কথা, দক্ষিণারঞ্জনের সঙ্কলিত রূপকথাগুলি বিশেষভাবে পূর্ববঙ্গের। ময়মনসিংহ ও ঢাকা অঞ্চলের।

'ঠাকুরমার ঝুলি' ও 'ঠাকুরদাদার ঝুলি' থেকে তাঁর প্রায় সমস্ত রচনার একটি গুণ লক্ষ্য করবার। তাঁর ভাষায় চিত্রময়তা। তার কারণ তিনি চিত্রকরও ছিলেন। স্বভাব শিল্পী। আলেখ্য রচনায় তাঁর ছিল অশিক্ষিত পটুত্ব। 'বঙ্গোপন্যাস—ঠাকুরদাদার ঝুলি', 'ঠাকুরমার ঝুলি', 'চিরদিনের রূপকথা' ও আরও নানা বইয়ে তাঁর নিজের আঁকা অনেক ছবি মুদ্রিত হয়েছে।

দক্ষিণারঞ্জনের বিদ্যা শিক্ষা যেমন স্কুল কলেজের গণ্ডিতে নয়, তাঁর অঙ্কন বিদ্যাও তেমনি স্বোপার্জিত। 'বিচিত্রা' মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত দক্ষিণারঞ্জনের 'অলক্ষিত চিত্রাবলী' মৌলিকতার জন্যে প্রশংসিত হয়েছিল।

১৯৩০ থেকে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের সহ-সভাপতি থাকেন তিনি। পরিষদের মুখপত্র 'পথ'-এর প্রধান সম্পাদকও। পত্রিকায় বিজ্ঞানের নানা বিষয়ে তাঁর প্রবন্ধ প্রকাশিত হত। তাছাড়া, পরিষদের 'বৈজ্ঞানিক পরিভাষা সমিতি'র সভাপতিরূপে বিজ্ঞানের অনেক পারিভাষিক শব্দ রচনায় দান আছে দক্ষিণারঞ্জনের।

জীবনের শেষাংশ তিনি দক্ষিণ কলকাতায় যাপন করেছিলেন। মনোহরপুকুর রোডের দক্ষিণ প্রান্তে। সমাপ্তিপর্বের ব্যক্তি-জীবন তাঁর অতি দুঃখময়। নিদারুণ শোকের আঘাত পান উপর্যুপরি। একমাত্র পুত্র রবিরঞ্জন (লেখক), জামাতা সুশীলচন্দ্র রায়চৌধুরী (বিজ্ঞানের বিখ্যাত অধ্যাপক ও পাঠ্যপুস্তক রচয়িতা) দুজনেরই অকাল বিয়োগ, তার আগে স্ত্রীর মৃত্যু তাঁর অন্তর বিদীর্ণ করে দেয়। কিন্তু ক্ষুণ্ণ হতে দেখা যায়নি তাঁর স্বভাবের সৌম্য প্রশান্তি। সাহিত্যচর্চাও পরিত্যাগ করেননি। ছোটদের জন্যে রূপকথা জাতীয় রচনা ও স্নিগ্ধ মধুর সুরের ছোট ছোট কবিতা লিখে গেছেন শেষ পর্যন্ত।

মুখে সৌজন্যের অমায়িক হাসি, চোখের স্বপ্নময় দৃষ্টি, সহৃদয় কবিপ্রাণ তাঁর অম্লান ছিল। আর সেই চিররহস্যময় শিল্পী-মন। জনসমাজের মধ্যে থেকেও নিঃসঙ্গ। আপাত নিষ্ক্রিয়তার অন্তরালে শ্রমশীল সৃজন ক্রিয়ায় নিমগ্ন।....

কখনো স্মৃতিচারণায় উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে সুদূর পূর্ববঙ্গের নিভৃত পল্লী অঞ্চল। কোন্ অতীতের নদী জল চিত্তপটে ছলছল্ করে। বজরায় নৌকায় কত পাখি-ডাকা সকাল। কত উদাস-করা অপরাহ্ণ। পান্‌সি-বাওয়া গানের সেই সরল আকুল করা সুরের রেশ। মালঞ্চ মালা পুষ্পমালার করুণ কাহিনী। গাথা সংগ্রহ দিনের পর দিন। বছরের পর বছর। সেইসব মনে করে উন্মনা হয়ে পড়েন দক্ষিণারঞ্জন।....

অবশেষে একদিন সব স্মরণ মনন লেখনের অবসান হয়ে যায়। বয়স তখন প্রায় ৮০ বছর। সন ১৩৬৩ সালের শেষ

দিকে। মনোহর পুকুর রোডের সেই বাড়ির দোতলা ঘরে শেষ নিঃশ্বাস ফেলেন তিনি। স্তব্ধ হয়ে যায়—বহুকালের বঙ্গ-পল্লীর একটি মিষ্টি সুরের বাঁশি।

'কেন রে বাঁশি বাজিস না?
বাজি বারে বারে,
শুনতে কে পারে?
যে শোনে সেই সুর—
বুকে তার ঢেউ তোলে তের নদী সা-ত সমুদ্দুর।'

জীবনের অভিযান

কোথায় দক্ষিণ আমেরিকার ব্রেজিল। পৃথিবীর আরেক দিকে। আর কতকাল আগেকার কথা। প্রায় শত বর্ষ!

ব্রেজিল রাজ্যে তখন প্রচণ্ড অন্তর্বিপ্লব চলেছে। রাজকীয় বাহিনীর সঙ্গে সাধারণতন্ত্রীদের সংগ্রামে সারা দেশ আলোড়িত।

কিন্তু সে যুদ্ধে বীরত্বের পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছেন এক বিদেশের সন্তান! রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে, সাধারণতন্ত্রীদের পক্ষে। সাধারণ সৈনিক নন। এক সেনানায়ক তিনি। অতি সঙ্কট কালে অসীম সাহসে, রণদক্ষতায় সৈন্য পরিচালনা করেছেন।

ব্রেজিলের সেই ঐতিহাসিক নাথেরয় যুদ্ধের জয় পরাজয় তখন ভাগ্যের দোলায় দোদুল্যমান। সাধারণতন্ত্রীরা প্রায় বিপর্যয়ের মুখে। এমন সময় সেই বিদেশী যুবক মাত্র ৫০ জন সহ-যোদ্ধা নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লেন মহা বিপদ-সঙ্কুল শত্রু ব্যূহে। সেই আক্রমণই হল চূড়ান্ত। তাঁর দুর্জয় সাহস আর নেতৃত্ব-শক্তিতে যুদ্ধের মোড় ঘুরে গেল। বিজয়ী হল বিপ্লবী বাহিনী।

ব্রেজিলের আধুনিক ইতিহাসে স্মরণীয় কে এই ভিন্‌দেশী?

ভারতীয়! বাঙ্গালী সুরেশ বিশ্বাস।

নাথেরয় রণক্ষেত্রের আগেও ত তিনি ব্রেজিলে বিখ্যাত? রাজধানী রিও-ডি-জেনিরোর সম্ভ্রান্ত সমাজে মান্যগণ্য একজন?

পোর্তুগীস ইতালীয় স্পেনীয় ডাচ চার ভাষায় অবাধে কথোপকথন করতে পারেন? ল্যাটিন গ্রীকেও ব্যুৎপন্ন?

তিনিই গণিত রসায়ন দর্শন চিকিৎসা এমনি বিভিন্ন বিদ্যায় আপন চেষ্টায় পারদর্শী? মনস্বী বক্তা-রূপেও প্রতিষ্ঠা?

ব্রেজিলে রাজকীয় পশুশালার পরিদর্শক, রক্ষকও ছিলেন আগে? সার্কাসের প্রসিদ্ধ খেলোয়াড় হয়ে আসেন এ রাজ্যে?

ব্রেজিলের আগে মেক্সিকোতে, তারও আগে উত্তর আমেরিকায়? নিউইয়র্ক আর নানা সহরে সার্কাস দেখিয়ে বিখ্যাত?

আমেরিকার আগে সারা ইউরোপেও তাঁর সার্কাসে নাম দুর্ধর্ষ পশুদের খেলা দেখিয়ে? আরো তরুণ বয়সে?

লণ্ডনের বিরাট আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীতে বিপুল সম্মান ও স্বীকৃতি লাভ মাত্র একুশ বছরে?

কে এই অদ্ভুৎকর্মা অভিযাত্রী সুরেশ বিশ্বাস? প্রতিভার এত বিচিত্র প্রকাশ কি করে সম্ভব হল সুদূর বিদেশে?

কি অপরিমেয় পৌরুষ আর সংঘাতময় আত্মপ্রতিষ্ঠার কাহিনী। এমন নিত্য অভিনবত্বে পূর্ণ জীবনের অভিযান এক পরম বিস্ময়। শত বর্ষ পূর্বের বাঙ্গালী চরিত্রে দুর্লভ ব্যতিক্রম।

সেকালের নিস্তরঙ্গ নির্জীব বাঙ্গালী জীবনকে রবীন্দ্রনাথ যখন ধিক্কার দিয়েছিলেন—'ভদ্র মোরা শান্ত বড়, পোষমানা এ প্রাণ,/বোতাম আঁটা জামার নীচে শান্তিতে শয়ান।'
—তখন সুরেশ বিশ্বাসের কথা নিশ্চয় তাঁর জানা ছিল না।

'দাও সবে গৃহছাড়া লক্ষ্মীছাড়া করে'—কবির এ ক্ষুব্ধ আবেদনের মূর্তিমান উত্তর সুরেশচন্দ্র !

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে একই বছরে (১৮৬১) তাঁর জন্ম। নদীয়ার নাথপুর গ্রাম সুরেশের জন্মস্থান। কৃষ্ণনগরের সাত ক্রোশ পশ্চিমে, ইছামতী নদীর ধারে।

পিতামহ রামচাঁদ বিশ্বাসের কিঞ্চিৎ জমিদারি ছিল। তাঁর চার পুত্রের মধ্যে তৃতীয় গিরিশচন্দ্র। কলকাতায় কাজ করতেন সার্ভেয়ার জেনারেল অফিসে। ছুটিতে নাথপুরে যাওয়া আসা হত।

গিরিশচন্দ্রের দুই পুত্র তিন কন্যাদের জ্যেষ্ঠ সুরেশচন্দ্র।

ইংরেজীতে প্রবাদ আছে, সকালেই বোঝা যায় কেমন যাবে দিনটি। সুরেশও ছেলেবেলা থেকেই যেমন দুরন্ত তেমনি সাহসী। ভয়-ডর কাকে বলে তা অজানা আর অদ্ভুত সহ্যশক্তি। নাথপুরের সঙ্গে দুস্তর নাথেরয় রণক্ষেত্রের ব্যবধান যিনি ঘুচিয়েছিলেন, বাল্যজীবনও তার উপযুক্ত।

শৈশবেই আগুন দেখে এগিয়ে যেতেন। ঘরে একলা রাখতে হয়, তাই আগুনের ভয় দেখাতে চান জননী। প্রদীপের ওপরে তার হাত রাখেন তাপ বোঝাবার জন্যে। শিশু কিন্তু হাত সরায় না, যন্ত্রণায় কাঁদে না। হার মেনে-ছিলেন মা।

একটু বড় হতেই সঙ্গীদের নিয়ে সুরেশের দুরন্তপনার সূত্রপাত। নাথপুর গ্রামের পথে বিপথে, পরের বাগানে পুকুরে চড়াও হওয়া। সেই সঙ্গে গাছে উঠে আরেক মজার খেলা। তার পাখির বাসা থেকে পক্ষীশাবক তুলে আনা।

সেই এগারো বছর বয়সের ঘটনাটিও বলবার মতন।

সেদিন এক আম গাছে উঠেছেন। পাখির বাসায় হাতও বাড়িয়েছেন বাচ্চাটির দিকে। অমনি পাশের কোটর থেকে প্রকাণ্ড সাপ বেরিয়ে আসে। ফুঁসে উঠে দুলে দুলে এগোয় সুরেশের কাছে। গাছ থেকে নামবার উপায় নেই। তাহলে পার হতে হয় সাপকে। সুরেশ তাই আরেক ডালে গেলেন। সাপও ছোবল মারলে তৎক্ষণাৎ। ভাগ্যে একটি শাখায় বাধা পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে তার ফণা ধরে ফেললেন বাঁ হাতে। সাপও তাঁর হাত পাকে পাকে বেষ্টন করতে লাগল। সুরেশ নিত্য-সঙ্গী ছুরিটি দাঁত দিয়ে খুলে, দু টুকরো করে দিলেন সাপের গলা। তারপর পাখির বাসা আর মুণ্ডহীন সাপ নিয়ে বাড়ি ফিরলেন। বাবা মা আর সকলে জানতে পারলেন বৃত্তান্ত।

তার আগে থেকে কলকাতায় বাস ও স্কুল জীবন আরম্ভ হয়েছিল। গিরিশচন্দ্র বাড়ি কিনেছিলেন পার্ক সার্কাসের কড়েয়ায়। সুরেশকে ভবানীপুর লণ্ডন মিশন স্কুলে ভর্তি করেছিলেন। কিন্তু এখানেও দেখা যায় তার লেখাপড়ার চেয়ে খেলাধুলা, শরীর-চর্চা আর সদলবলে অভিযানের দিকেই ঝোঁক।

একবার ছুটিতে এসেছেন নাথপুরে। এখানে তখন পাগলা কুকুরের ভীষণ উপদ্রব। তাদের কামড়ে কজন মারা পড়েছে। গ্রামের অনেকেই বেরোয় না সন্ধ্যের পর। কিন্তু সব শুনেও সুরেশের সান্ধ্য ভ্রমণ বন্ধ নেই। একদিন সন্ধ্যের আগে ফিরছেন একা। এমন সময় একটা পাগলা কুকুর তাঁকে তাড়া করে এল। তাঁর হাতে কোন লাঠি

পর্যন্ত নেই। কুকুরটা লক্‌লকে জিভ বার করে আসতেই তিনি প্রয়োগ করলেন কলকাতায় শেখা পদ্ধতিটি। জোড়া পায়ে লাথি। সমস্ত শক্তিতে দু পায়ে এক সঙ্গে লাথি মারলেন। কুকুরটা ছিট্‌কে পড়ল পাশের নালায়। তখন তার মাথায় ইট মেরে শেষ করলেন। তাঁর বয়স তখন তেরো বছর।

তার কদিন পরেই নাথপুরের আরেক ঘটনা। গ্রামের এক ক্রোশ দূরে এক নীলকুঠি আছে। তার একদল সাহেব সেদিন বরাহ শিকারে বেরিয়েছেন, শিকারী কুকুরদের নিয়ে। তাঁদের বন্দুকের আওয়াজে আর কুকুরদের তাড়ায় বরাহ প্রাণভয়ে ছুটছে। এমন সময় সুরেশ সেদিক থেকে ফিরছিলেন মাছ ধরার পর, দুই অনুচরের সঙ্গে।

সাহেবরা তাঁদের দেখে চীৎকার করে পালাতে বললেন। তাঁর সঙ্গীরাও পালাল বিপদ বুঝে। সুরেশ কিন্তু বরাহটার দিকে এগিয়ে গেলেন। অমনি লালা-নিঃস্রাবী জন্তুটা লাফিয়ে পড়ল তাঁর ওপর। সুরেশও প্রাণপণে ছিপের বাড়ি মাথায় মারতেই বরাহ উল্টে পড়ল। ওদিক থেকে শিকারী কুকুরের দল ঘিরে ফেললে তাকে। তারপর সাহেবদের বন্দুকের কুঁদো আর সুরেশের ছিপের ঘায়ে বরাহ সাবাড় হল।

সাহেবরা বিস্মিত হলেন ছেলেটির সাহস দেখে। সুখ্যাতি, শেক হ্যাণ্ড্, খাতির করে নীলকুঠিতে যেতে বললেন। সুরেশও গিয়ে আলাপ পরিচয় করলেন একদিন। নীলকুঠিকে ঘিরে এ অঞ্চলের যে ইংরেজ-সমাজ, সেখানে তাঁর মেলামেশার তখন থেকেই সূত্রপাত। নাথপুর গেলেই

তিনি কুঠি-বাড়িতে যেতেন। সাহেব মেম সকলেই পছন্দ করতেন তাঁকে।

কলকাতাতেও সুরেশের লেখাপড়ার সঙ্গে সম্পর্ক নেই। ভাল লাগে কেবল ডানপিঠেপনা, মারপিঠ ইত্যাদি।

একদিন সঙ্গীদের নিয়ে বেড়াচ্ছেন ময়দানে। এমন সময় দুটো সাহেব তাঁদের নিগার শুয়ার বলে ডাকতেই সুরেশও চোটপাট গালিগালাজ করলেন। তাঁর অল্প বয়স দেখে ইংরেজযুগল তেড়ে এল হাতের সুখ করবার আশায়। তিনি একজনের নাকে ভারি ওজনের ঘুষি কষাতেই সে ঘুরে পড়ল। তারপর দুজনে মিলে আক্রমণ করলে তাঁকে। সুরেশ ঘুষির চোটে দুটোকেই ধরাশায়ী করে দিলেন।

এইভাবে কাটতে লাগল দিন। ছোটখাটো শিকার যাত্রা, দল বেঁধে ময়দানে হৈ চৈ, দরকারে অদরকারে দাঙ্গা বাধানো ইত্যাদি।

লণ্ডন মিশন স্কুলে মাসের মধ্যে কুড়ি দিনই সুরেশ গর-হাজির। দাঙ্গাবাজ ছেলেদের দলপতি হয়ে কাছাকাছি দোকানদারদের সন্ত্রস্ত করছেন। ক্রমে সব খবরই আসে গিরিশচন্দ্রের কানে। বকুনি ধমক মারধোর সব রকম শাসনই করেন। কিন্তু পুত্রের মতিগতি সংশোধনের অতীত।

মাতা-পিতার কি মনঃকষ্ট! এমন বুদ্ধিমান ছেলে, কিন্তু লেখাপড়ায় মন নেই, কেবল মারপিঠের দিকে ঝোঁক।

বাড়িতেও সুরেশ সকলের অপ্রিয় হতে লাগলেন। স্কুলের প্রিন্সিপ্যাল অভিযোগ জানালেন অভিভাবকের

কাছে। সবদিক থেকে পুত্রের নিন্দা শুনে পিতা অত্যন্ত কঠোর শাসন আরম্ভ করলেন। কিন্তু ফল হল আরো খারাপ।

পিতাকে এড়াতে সুরেশ বাড়ি থেকে পলাতক হতে লাগলেন। অনেক খৃষ্টান ছেলে স্কুলের বন্ধু। তাই খাওয়া থাকা ইত্যাদি চলে তাদের বাড়িতে।

তাদের সঙ্গে আহার বিহার ঘনিষ্ঠতা যত বাড়ে, স্বভাব চরিত্রেও ঘটতে থাকে আরো পরিবর্তন। পৈত্রিক হিন্দু সমাজের কিছুই আর ভাল লাগে না। উচ্ছৃঙ্খল হয়ে পড়লেন নানা বিষয়ে। আবার মিশনারিদের প্ররোচনায় খৃষ্ট ধর্মের দিকে মন গেল।

বাড়িতে জননী ভিন্ন একমাত্র স্নেহশীল ছিলেন কাকা কৈলাসচন্দ্র। এখন সুরেশের দুরাচরণে তিনিও বিরক্ত হলেন।

পিতা একদিন বেত্রাঘাত করলেন সুরেশের সর্বাঙ্গে। ত্যাজ্য পুত্র করারও ভয় দেখালেন।

তিনিও উত্তেজিত হয়ে উঠলেন তাড়নার ফলে। এতদিন শুধু মায়ের স্নেহে বাড়ির সঙ্গে সম্পর্ক রেখেছিলেন। সে বন্ধনও ছিন্ন হল এবার। একদিন পিতার সঙ্গে কলহের পর 'আর বাড়ি ফিরব না' বলে গৃহত্যাগ করলেন।

প্রথমে গেলেন খৃষ্টান বন্ধুদের বাড়ি। তারপর লণ্ডন মিশনের প্রিন্সিপ্যাল এ্যাস্টনের কাছে আত্মসমর্পন করলেন।

সাহেব বুঝিয়ে পড়িয়ে বাইব্‌ল্ পাঠ করতে দিলেন সুরেশকে। তাঁর ধর্ম-চিন্তা আর কি ? পিতা থেকে সমস্ত আত্মীয় স্বজনদের ওপর তখন জাত-ক্রোধ। সব আক্রোশ

চরিতার্থ করবার সহজ পন্থা—ধর্মান্তর—বেছে নিলেন। খৃষ্ট ধর্ম গ্রহণ করলেন তেরো বছর বয়সী 'অশিক্ষিত' বালক। যাঁর ধর্ম-বোধের বালাই ছিল না।

অগ্নিশর্মা গিরিশচন্দ্র এই সংবাদে ত্যাজ্য পুত্র ঘোষণা করলেন সুরেশকে। সব আত্মীয় স্বজনও সম্পর্ক চুকিয়ে দিলেন।

এ্যাস্টন সাহেব তাঁর বিনামূল্যে আহার, বাস ও বিদ্যা-শিক্ষার বন্দোবস্ত করলেন লণ্ডন মিশনে। কিন্তু লেখাপড়ায় সুরেশের মন বসল না। তাঁর জন্ম হয়নি সেজন্যে।

পরের গলগ্রহ থাকতেও অনিচ্ছা। অতএব চাকরির চেষ্টা করতে লাগলেন।

কাজ জুটল স্পেন্সেস হোটেলে-সেখানে ক'বছর আগে মাইকেল মধুসূদন থাকেন, বিলেত থেকে ফিরে। ইংরেজীতে কথাবার্তায় পটু বলে সুরেশ পেলেন এই চাকরি। কাজ হল—জাহাজ ঘাটে, রেল স্টেশনে লক্ষ্য রাখা আর বিলেত থেকে সাহেব মেম এলে স্পেন্সেসে নিয়ে আসা।

জাহাজে সাহেবদের আনা নেয়া করতে করতে তাঁর নিজেরই বিলেত যাবার ইচ্ছা জাগল। সমুদ্র যাত্রা, দূর দেশে ভ্রমণের জন্যে চঞ্চল হয়ে উঠল মন।

কিন্তু বিলেত যেতে ত অনেক টাকা দরকার। আপাতত বর্মা যাওয়া যাক। সেখানে ইংরেজী-জানা লোকের অভাব। একদিন তাই সুরেশ রেঙ্গুনে পাড়ি দিলেন। ডেক-টিকেট কিনে উঠে পড়লেন জাহাজে।

রেঙ্গুন পৌঁছেই চাকরির চেষ্টা আরম্ভ করলেন। কিন্তু কোন কাজ পেলেন না, কিছুদিন বাস করেও।

এখানে একদিন নিজের প্রাণ বিপন্ন করে এক নারীকে বাঁচান সুরেশ। সেদিন পথ চলতে দেখেন, একটি কাঠের বাড়িতে আগুন লেগেছে। এক মহিলা আর্তস্বরে চীৎকার করছে তার দোতলার জানলায়। রাস্তায় বিস্তর দর্শক। কিন্তু কেউ তাকে মুক্ত করতে এগিয়ে যাচ্ছে না। জনতাকে বিস্মিত, স্তব্ধ করে তিনি সেই অগ্নিশিখার মধ্যে দিয়ে উঠে গেলেন দোতলায়। মহিলাটিকে কাঁধে নিয়ে ফিরে এলেন।

কয়েকজন মাদ্রাজীর সঙ্গে আলাপ হয়েছিল রেঙ্গুনে। সুরেশ তাই মাদ্রাজ যাওয়া স্থির করলেন। ডেক-যাত্রী হয়ে মাদ্রাজের উদ্দেশে ভাসলেন চাকরির আশায়।

কিন্তু মাদ্রাজেও কোন কাজ মিলল না। শূন্য হাতে ফিরলেন কলকাতায়। বয়স তখন তাঁর ষোলো বছর চলেছে।

আবার এ্যাস্টন সাহেব অনুমতি দিলেন মিশনের বোর্ডিঙে থাকতে। কিন্তু যথাসাধ্য চেষ্টাতেও কোন চাকরি সুরেশ পেলেন না। বাড়িতে মাঝে মাঝে গোপনে যেতেন, মায়ের সঙ্গে দেখা করতে। আর কোন সম্পর্ক ছিল না।

এতদিনে সুরেশ বুঝলেন, বিদ্যার কত প্রয়োজন। তাই লেখাপড়ায় মন দিলেন। তবে তা স্কুলের নিয়মিত বিদ্যাশিক্ষা নয়। নতুন নতুন বিষয়, নতুন নতুন দেশের কথা জানবার জন্যে বই পড়তেন নানা রকম। কারণ মনে তখনো দূর সমুদ্র যাত্রার স্বপ্ন। বিলেত যাবার চেষ্টাও চলল সমানে।

প্রায়ই গঙ্গার ধারে, জাহাজ-ঘাটে যেতে লাগলেন। জেটিতে জেটিতে জানতে লাগলেন বিলেত যাবার খবরাখবর। জাহাজী সাহেবদের সঙ্গে তাদের ডেরায় গিয়ে ভাব করতে লাগলেন। জাহাজের জীবন কেমন, সমুদ্রে কিরকম লাগে,

শুনতেন জানতেন এই সব। আর তাদের নানা অভিজ্ঞতা আর দেশ বিদেশের কথাও।

ক'মাসের অবিশ্রান্ত চেষ্টায় সুরেশ জাহাজে কাজ পেলেন। খুব আলাপ হয়েছিল বি-এস্-এন্-এর এক জাহাজী কাপ্তেনের সঙ্গে। তিনিই তাঁকে এ্যাসিস্ট্যাণ্ট্ স্টুয়ার্ড করে নিলেন।

এতদিনের সাধ পূর্ণ হল। কয়েকদিন পরেই জাহাজ ছাড়ল বঙ্গোপসাগরে। তবে তিনি বোধহয় ভাবতে পারেননি, স্বদেশ থেকে এই তাঁর চির বিদায়!

লণ্ডনে পৌঁছে সুরেশ কদিন জাহাজেই রইলেন, কাপ্তেনের অনুমতিতে। তারপর ইস্ট এণ্ড নামে কুখ্যাত পল্লীতে বাস করতে গেলেন।

কদিনেই সেখানে নিঃশেষ হল হাতের টাকা। তখন খবরের কাগজ বিক্রি আরম্ভ করলেন। কিন্তু সে কাজ ভাল লাগল না বেশি দিন। ছেড়ে দিলেন। অথচ অন্য কাজ পাওয়াও অসম্ভব। তাই কখনো অর্ধাহার কখনো অনাহারে কাটতে লাগল। লণ্ডনে কাজ না করলে খাদ্য জোটে না বিদেশীর। ভিক্ষা মেলে না।

সুরেশ বিশ্বাস কুলিগিরি আরম্ভ করলেন লণ্ডনের রাজপথে। দেখলেন, খবরের কাগজ বিক্রির চেয়ে এতে রোজগার বেশি। ক'মাসেই কিছু সঞ্চয় করে এ কাজ ছেড়ে দিলেন। ইস্ট এণ্ড থেকে উঠে এলেন ভদ্রতর পল্লীতে।

কিন্তু এখানে এক নতুন বিপাকে পড়লেন। সকলের সঙ্গে মেলা-মেশায় প্রিয়পাত্র হবার ক্ষমতা ছিল তাঁর। এখানেও তাই হলেন। কিন্তু বিভ্রাট বাধালেন এক বিবাহিতা

মহিলা। তিনি আত্মহারা হয়ে পড়লেন সুরেশচন্দ্রের আকর্ষণে। উদ্দাম প্রেম নিবেদন করতে তাঁর ঘরে পর্যন্ত চড়াও হতে লাগলেন।

সুরেশ বিশ্বাস শুধু সে অঞ্চল নয়, লণ্ডনও পরিত্যাগ করলেন আত্মরক্ষার জন্যে।

ইংল্যাণ্ডের পল্লীগ্রাম ভাল করে দেখবার ইচ্ছা ছিল। সে সুযোগ মিলল এবার। সেজন্যে পেশা হল—ফেরিওলা। একটি পুরনো জিনিষের দোকান থেকে কেবল ভারতীয় সামগ্রী কিনলেন। আর সেই সব গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে বিক্রি করতে লাগলেন পায়ে হেঁটে।

বিদেশী ফেরিওলা, বিদেশী জিনিষপত্র দেখে কৌতূহলী গ্রামবাসীরা ডাকে। বিক্রিও হয় ভাল। দেশ-ভ্রমণ আর উপার্জন একই সঙ্গে চলতে থাকে। কিছু টাকাও জমল চার পাঁচ মাসে।

এইভাবে একদিন কেণ্টের এক সহরে এসে পড়েছেন। তখন সেখানে খেলা দেখাতে এল একটি সার্কাস দল। তিনি যে হোটেলে রয়েছেন, তার খেলোয়াড়রাও সেখানে উঠল। তাদের সঙ্গে আলাপ পরিচয়ও হল তাঁর। অমনি তিনিও সার্কাসে ঢোকবার জন্যে মেতে গেলেন।

শরীরচর্চা করতেন ত ছেলেবেলা থেকেই। লণ্ডন এসেও নানা রকম ব্যায়াম চলত। নিয়মিত চর্চায় বরং দেহ আরো সুগঠিত, শক্তিশালী হয়েছে এখন।

সার্কাস ম্যানেজারের কাছে সুরেশ বিশ্বাস আবেদন জানালেন। কিন্তু ম্যানেজার রাজি হলেন না তাঁর একহারা চেহারা দেখে।

তিনি গভীর প্রত্যয়ে বললেন, 'আপনি আমায় পরীক্ষা করে নিন। কোন্ পালোয়ানের সঙ্গে লড়ব, বলুন।'

'তাই নাকি ? আচ্ছা, এঁর সঙ্গে লড়ুন।' বলে, দলের সব চেয়ে বড় কুস্তিগীরকে দেখিয়ে দিলেন ম্যানেজার।

সেই অসুরাকৃতি মল্লকে সুরেশচন্দ্র ধরাশায়ী করলেন। দেখে অবাক হয়ে গেল সবাই। আর ম্যানেজার সেদিনই তাঁকে দলে নিলেন।

তারপর থেকে কাগজে বিজ্ঞাপন দিতেন—'এক ভারতীয় যুবক অদ্ভুত সব খেলা দেখাবে।'

সার্কাসের জন্যে সুরেশ বিশ্বাস দস্তুরমত পরিশ্রম করতে লাগলেন তখন থেকে। একনিষ্ঠ সাধনা যেন। আর, আশ্চর্য দক্ষতা দেখিয়ে সার্কাসটিকে জনপ্রিয় করে তুললেন। জিমন্যাস্টিকের কৌশল আর হিংস্র জন্তুদের দুঃসাহসী খেলা দেখিয়ে দর্শকদের চমৎকৃত করতে লাগলেন দিনের পর দিন। এই তাঁর সার্থকতার পথে প্রথম পদক্ষেপ।

এখানে বলা যায়, জন্মভূমির কথা তিনি কখনোই ভোলেননি। চিঠি লিখে যোগ রাখতেন কাকা কৈলাসচন্দ্রের সঙ্গে। বিদেশে নিজের অবস্থা আর অভিজ্ঞতার কথা সমস্তই জানাতেন। সেই পত্রাবলী থেকেই সংগৃহীত হয়েছে তাঁর জীবনীর উপকরণ। উত্তরকালের চিঠিগুলি থেকে তাঁর স্বদেশে ফেরবার, জননীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার আকুলতাও প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু সে ইচ্ছা পূর্ণ হয়নি কখনো।...

সেই সার্কাস দলে ক'টি তরুণী ছিল। তাদের মধ্যে একজন জার্মান। ইংরেজীতে সে অবাধে কথা বলতে পারে। আর, দলের সকলের চোখে সে সবচেয়ে সুন্দরী। সব

পুরুষ তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার জন্যে উদ্‌গ্রীব।

জার্মান বালা কিন্তু কাউকে আমল দেয় না। অল্পভাষিণী, গম্ভীর স্বভাব তার। চালচলন কথাবার্তায় দেখা দেয় বিশিষ্ট রকমের শিক্ষা দীক্ষা, আভিজাত্য। তার ঘন-কৃষ্ণ আস্কন্ধ কেশগুচ্ছ সুরেশ বিশ্বাসের ভারতীয় চক্ষুকে মুগ্ধ করে।

কন্যার কাছে প্রশ্রয় পায় না কেউ। কিন্তু এই ভারতীয় খেলোয়াড়টির প্রতি তার ব্যবহার অন্য প্রকার। অমিত শক্তি-মান বিদেশী যুবকের দিকে সে দৃষ্টি আরেক রকম। তৃতীয় ব্যক্তি না থাকলে জার্মান কুমারীর আঁখি কেমন কোমল হয়ে আসে। তার হাব-ভাব চাউনিতে যে অনুরাগ ফুটে ওঠে তা বোঝেন সুরেশ বিশ্বাস। তাঁর চিত্তেও সে বর্ণমাধুরী রঙীন হয়ে ওঠে।

দুজনেই মনে মনে আকৃষ্ট। কিন্তু সঙ্গোপনে, স্বভাব-সংযমে। কারুর কথায় তা উচ্ছ্বসিত হয়ে প্রকাশ পায় না।

হঠাৎ একদিন কাগজে এক বিজ্ঞপ্তি দেখে মেয়েটি। তার মা মৃত্যু-শয্যায়। কন্যাকে শেষ দেখবার ইচ্ছা জানিয়েছেন।

সার্কাস দল ছেড়ে দিয়ে যাত্রা করে সে। তিনি তাকে ট্রেনে তুলে দিতে গেলেন।

সেই বিদায় মুহূর্তে উদ্‌ঘাটিত হল তার হৃদয়। অদর্শনের আকুলতার মধ্যে মরমের সুর বেজে উঠল। আত্ম-নিবেদনের ইচ্ছা সে প্রকাশ করে ফেললে।

কিন্তু সুরেশচন্দ্র জানালেন, 'বিবাহ-মিলনে যে দুস্তর বাধা।'

অসমাপ্ত অনুভবের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটল। প্ল্যাটফর্ম

কম্পিত করে ট্রেন অদৃশ্য করে দিলে জার্মান কুমারীকে।

তিনি সার্কাসে ফিরে এলেন। যথারীতি খেলা দেখাতে লাগলেন দুর্ধর্ষ জন্তুদের নিয়ে। দর্শকদের উল্লসিত করে দিলেন। কিন্তু নিজে বিষণ্ণ, নিঃসঙ্গ। আপন মন কি বেদনা বিধুর।

তার মধু-স্মৃতি উন্মনা করে তোলে। পত্র লেখেন সুরেশ বিশ্বাস। উত্তর দেয় সে। 'সার্কাস দলে আর ফিরে আসা হবে না।' শুধু চিঠির আদান প্রদানে স্মরণের ডোর। সে মাধ্যমও ক্রমে ছিন্ন হয়ে যায়। তিনি ভাবেন, চোখের আড়াল থেকে মনের অন্তরালেও চলে গেল কি?

এদিকে আরেক পরিবর্তন আসে সুরেশচন্দ্রের জীবনে। সার্কাসে নামী হয়ে একটি নতুন কাজ পেয়ে গেলেন। প্রফেসর জাম্‌বাক দুর্দান্ত পশু বশের জন্যে সারা ইউরোপে তখন বিখ্যাত। ভারতবর্ষ থেকে আফ্রিকার জঙ্গলে পর্যন্ত থেকেছেন তিনি। হিংস্র জন্তুদের সম্পর্কে বিপুল অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন। সুরেশ বিশ্বাসের কৃতিত্ব দেখে তাঁকে নিজের সহকারী করবার অনুরোধ জানালেন জাম্‌বাক।

সুরেশচন্দ্র সম্মতি দিলেন। তাঁর সঙ্গে রইলেন দু' বছর। এমন বিশেষজ্ঞদের শিক্ষায় পশু বশে আরো অভিজ্ঞ হলেন। অর্থোপার্জন করলেন ভাল।

এবার ইউরোপের এক নামজাদা, বিরাট সার্কাসদলে যোগ দিলেন। গুণপনা দেখাতে লাগলেন বৃহত্তর এবং অভিজাত সমাজে। বাঘ সিংহের রোমহর্ষক খেলায় ক্রমে সমগ্র ইউরোপে প্রসিদ্ধ হলেন। ১৮৮২ সালে বিশাল আন্তর্জাতিক প্রদর্শনী হল লণ্ডনে। হিংস্র জন্তুদের খেলোয়াড়

সুরেশ বিশ্বাস সেখানে যশের মুকুট ধারণ করলেন। পদক, প্রশংসাপত্র, আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি ও প্রতিষ্ঠা পেলেন সেই একুশ বছর বয়সে।

কিছুদিন পরে, সেই সার্কাসের সঙ্গেই হ্যামবুর্গে এলেন। বিশেষজ্ঞ ব্যবসায়ী গাজেনবাকের এখানে বিরাট পশুশালা। তিনি বহু-গুণ বেতনে আমন্ত্রণ করলেন সুরেশ বিশ্বাসকে। তিনিও সার্কাস থেকে গাজেনবাকের পশুশালায় যোগ দিলেন। এখানে তাঁর দায়িত্ব—দুর্দান্ত পশুদের 'শিক্ষা' দেয়া। সেই সব 'শিক্ষিত' পশুদের গাজেনবাক উচ্চমূল্যে বিক্রয় করেন বিভিন্ন সার্কাস দলে।

সুরেশচন্দ্রেরও এখন প্রচুর উপার্জন হতে লাগল। এবার গণ্য হতে আরম্ভ করলেন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি হিসেবে। কারণ ক্রীড়াপ্রিয় ইউরোপে এ কাজ বিশেষ সম্মানিত।

এই দলের কাজেও ইউরোপের নানা শহরে তাঁর যাওয়া আসা হতে লাগল।

একদিন ভ্রমণ করছেন জার্মানীর এক সহরে। এমন সময়—পরমাশ্চর্য! সেই নায়িকার সঙ্গে এক দোকানে দেখা হয়ে গেল। যেমন অকল্পনীয় তেমনি তুলনাহীন যোগাযোগ।

বিস্ময়ানন্দের প্রথম আবেশের পর দুজনে বেরিয়ে এলেন। এসে বসলেন কাছাকাছি একটি নির্জন বাগানে।

জার্মান নন্দিনী নিজের বৃত্তান্ত জানালে। কত কথা। মায়ের মৃত্যুর পর পৈত্রিক বহু অর্থ সম্পদের সে অধিকারিণী। কিন্তু চিঠি-পত্র বন্ধ হয়ে গেল কেন? বদলে গেছে কি জীবনের ঠিকানা? আরো কত প্রশ্ন।

চক্ষু আনত করে সে বললে, 'আমি এখনো কুমারী।'

অভিভূত হলেন সুরেশ বিশ্বাস। সুন্দরীর হৃদয়ের সংবাদে আবেগোচ্ছ্বাসে ভরে গেল চিত্ত! এখনো প্রতীক্ষিতা!

তারপর প্রত্যহ দুজনের সাক্ষাৎ হতে লাগল। অবারিত অন্তর। তিনিও জীবনে প্রতিষ্ঠিত। প্রেমের পূর্ণতায় আর বাধা কোথায়?

কিন্তু বন্ধুর জীবনের পন্থা। সমাজে নিরঙ্কুশ কজন? স্বাধীন দেশের স্বাধীনা তনয়া, পৈত্রিক বিপুল সম্পদে যার একমাত্র উত্তরাধিকার, তারও কি বিপত্তি। অভিজাত নানা আত্মীয় স্বজন। এমন রূপবতী অর্থবতীর পাণি-প্রার্থীও মান্যগণ্য পরিবারে অল্প নয়। অথচ বরাঙ্গনার প্রথম প্রেম সকলের প্রতি বিমুখ। এই বিরূপতায় বিমূঢ় বিক্ষুব্ধ তারা।

তাই সে সমাজে কিছু প্রকাশ করতে চায় না। কিন্তু হৃদয় অধীর। তাই দিনের পর দিন সকলের দৃষ্টি এড়িয়ে চলতে থাকে অভিসার।

হঠাৎ একদিন গুপ্ত প্রণয়ের কাহিনী জানাজানি হয়ে গেল। ক্ষিপ্ত হল মেয়েটির স্বজনবর্গ। বিশেষ বিবাহের উমেদাররা। এদের সমস্ত আক্রোশ এই কৃষ্ণকায় বিদেশীর ওপর এসে পড়ল।

তারা প্রথমে ভয় দেখাতে লাগল সুরেশচন্দ্রকে। কিন্তু তিনি নির্ভীক। তখন সত্যই তাঁর প্রাণনাশের চেষ্টা আরম্ভ হল। আপন দেশে তাদের যেমন অর্থবল তেমনি প্রভাব প্রতিপত্তি। আর তিনি এখানে নিঃসহায় বিদেশী। সুতরাং অসমসাহসী হলেও এ অবস্থায় থাকা উচিত বিবেচনা করলেন না। হৃদয় উৎপাটিত করতে হল আপন হাতেই।

অশ্রুমুখীর কাছে চির-বিদায় নিলেন। জার্মানী ত্যাগ করলেন জীবনের পরম লগ্নকে ব্যর্থ করে দিয়ে!

কিন্তু তবু হতাশ পাণি-প্রার্থীদের আক্রমণ থেকে নিস্তার নেই! ইউরোপের যেখানে যান, সেখানেই জীবন বিপন্ন করতে আসে তাদের নিযুক্ত ভাড়াটিয়ারা। কি দুরদৃষ্ট! অগত্যা সুরেশচন্দ্র ইউরোপ ত্যাগই সমীচীন মনে করলেন।

বর্জন করতে হল এতদিনের এত কষ্টে অর্জিত প্রতিষ্ঠা। পথ চল্‌তে প্রস্ফুটিত অপরূপ হৃদ্‌কমল তাঁর ছন্দ-হারা জীবনকে মধুময় করেছিল। সে নারী-রত্নের একনিষ্ঠ প্রেমকে বিসর্জন দিলেন পথের ধূলায়। জীবনের স্থিতি আবার বিক্ষিপ্ত হয়ে গেল।

আমেরিকা দেখবার ইচ্ছা অনেকদিন থেকে মনে ছিল। এবার সে ব্যবস্থা করলেন একটি বড় সার্কাসে যোগ দিয়ে। কাজটি সহজেই পেলেন, সার্কাস ক্ষেত্রে তখন এত খ্যাতি তাঁর।

অতলাস্তিক পার হয়ে সুরেশচন্দ্র মার্কিন দেশে পাড়ি দিলেন। হৃদয় ভারাক্রান্ত। জীবন-নাট্যের ইউরোপীয় অঙ্কে কি বিয়োগান্তক যবনিকা পতন! সেই চব্বিশ বছর বয়সে!

প্রসিদ্ধ সার্কাসওয়ালা ওয়েলের দলে তিনি আমেরিকা পৌঁছলেন (১৮৮৫)। তাঁর হিংস্র জন্তুদের নিয়ে খেলাই হল সার্কাসের প্রধান আকর্ষণ। আমেরিকার সহরে সহরে এই দুঃসাহসী খেলোয়াড়ের পরিচয় সবাই পেতে লাগল। পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হল তাঁর অদ্ভুত নৈপুণ্যের বিবরণ, তাঁর ছবি। এমনিভাবে নিউইয়র্কেও তিনি সুপরিচিত হয়ে উঠলেন।

উত্তর আমেরিকায় পালার শেষে উপস্থিত হলেন দক্ষিণ আমেরিকা। প্রথমে মেক্সিকো। তারপর ব্রেজিলে। সে এক আশ্চর্য অজানা জগৎ।

দক্ষিণ আমেরিকার বৃহত্তম রাজ্য ব্রেজিল। নয়নানন্দ তার নৈসর্গিক শোভা। সে দেশে কোন বাঙ্গালীর আগমন আগে ঘটেনি। আকারে প্রায় ভারতবর্ষের তুল্য বিশাল। কিন্তু লোকসংখ্যা সে তুলনায় অতি অল্প। রাজ্যের বেশির ভাগই গভীর অরণ্য। যেন আদিম যুগের কোন অঞ্চল। দু'তিনটি মাত্র সহর। রেলপথ তৈরি হয়নি। অতলান্তিকের তীরে তার রাজধানী রিও-ডি-জেনিরো। লোকসংখ্যা প্রায় সাড়ে তিন লক্ষ। সুরেশ বিশ্বাস এখানে সার্কাস দেখাতে এলেন।

ব্রেজিলে প্রথম উপনিবেশ করে স্পেন। তারপর পোর্তুগাল। সেই ইউরোপীয়দের বসবাস আর ব্রেজিলীয় নারী বিবাহাদির ফলে এক মিশ্রিত জাতির উদ্ভব হয়। তাদের নাম ক্রিয়োল। ব্রেজিলে ক্রিয়োলের সংখ্যাই বেশি। তারপর মুলাটো, আরেকটি সঙ্কর গোষ্ঠী। পোর্তুগীজদের সঙ্গে কাফ্রী রমণীদের মিশ্রণজাত। স্পেন, পোর্তুগালের উপনিবেশকারী ছাড়া অনেক জার্মানেরও ব্রেজিলে বাস।

একটি রাজনৈতিক কথাও উল্লেখ্য। নেপোলিয়ন যখন পোর্তুগাল আক্রমণ করেন, পোর্তুগীস সম্রাট চলে আসেন ব্রেজিলে। সেই থেকে পোর্তুগীস সম্রাটরা ব্রেজিলে রাজত্ব করতে থাকেন। সাধারণতন্ত্রী বিপ্লবের অর্থাৎ সুরেশচন্দ্রের এখানে ক'বছর বাস করার পর পর্যন্ত।...

এই নতুন দেশে তাঁর প্রতিভা আরো নব নব ক্ষেত্রে

প্রকাশ পেতে লাগল। তাঁর প্রতিভার এক বৈশিষ্ট্য যে নিত্য নতুনত্ব, তার স্বাক্ষর রাখলেন পৃথিবীর আরেক প্রান্তীয় এই রহস্যে ঘেরা রাজ্যে। এই আশ্চর্য পরিণতির জন্যে প্রস্তুতি অবশ্য ইউরোপেই চলেছিল। সেখানে তিনি প্রাণপণ জীবনসংগ্রাম করেছিলেন কখনো বিপর্যস্ত, কখনো বিজেতা হয়ে। কিন্তু সেই দুস্তর পর্বেই তাঁর বিচিত্র অন্তর্লোক সুবর্ণ ভবিষ্যতের জন্যে মুকুলিত হতে থাকে।

ব্রেজিলে আসার পর প্রকাশিত হয় তাঁর বিভিন্ন ভাষায় কথোপকথন ক্ষমতা। আবাল্য বিদ্যায় অমনোযোগী সুরেশচন্দ্র এখানে পাঠেও মনোনিবেশ করেন। আপন চেষ্টায় ব্যুৎপন্ন হন দর্শন, রসায়ন, গণিতের মতন দুরূহ শাস্ত্রে। সুবক্তা বলেও এখানে খ্যাতিলাভ হল। রাষ্ট্রভাষা পোর্তুগীসে বক্তৃতা-শক্তিতে জয় করলেন এ দেশীয়দের মন। আর বীরত্বের ভূমিকায় ত তার ইতিহাসে স্থান করে নিলেন।

সুরেশচন্দ্রের বড় ভাল লাগল ব্রেজিল। তার নিসর্গ-সৌন্দর্যে, তার অনেক অধিবাসীদের ব্যবহারে মুগ্ধ হলেন। যেন শান্ত, বশীভূত হল এতদিনের ভ্রাম্যমান স্বভাব। এ দেশেই স্থায়ী হবার আহ্বান অন্তর থেকে শুনলেন। উপযুক্ত সুযোগও পেলেন যথাসময়ে। রাজকীয় পশুপালার পরিদর্শক রক্ষকের পদটি শূন্য ছিল। যোগ্য ব্যক্তি হিসেবে তাঁকেই নিযুক্ত করলেন রাজকর্মচারীরা।

সার্কাস-দল ছেড়ে তিনি সেই কাজ নিলেন। নিজের একটি মাঝারি লাইব্রেরি গড়ে তুললেন এবার। গভীর রাত্রি পর্যন্ত নানা বিষয় পাঠ করতে লাগলেন। দর্শন প্রভৃতি প্রিয় শাস্ত্র ত বটেই। চিকিৎসা বিদ্যাতেও কিছু জ্ঞান

অর্জন করলেন। সেই সঙ্গে ল্যাটিন ও গ্রীক ভাষা শিক্ষা। পোর্তুগীস, ইতালীয়, স্পেনীয়, ডাচ এই চার ভাষায় কথা বলবার অধিকারী আগে থেকেই ছিলেন। আবার কৌতূহলী হয়ে বিশেষ চর্চা করতে লাগলেন ইন্দ্রজালে। এক মানসিক রোগিনীকে ইন্দ্রজাল আর সম্মোহন শক্তি প্রয়োগে এই পর্বেই নিরাময় করলেন।

ব্রেজিলে আসার বছর খানেক পরে রাজধানীর এক চিকিৎসকের সঙ্গে পরিচিত হলেন সুরেশ বিশ্বাস। তারই ফলে তাঁর অভিনব পরিণতির সূচনা।

চিকিৎসক-কন্যাকে প্রথম দর্শনেই মুগ্ধ হয়ে গেলেন তিনি। কিন্তু তার সঙ্গে সামরিক জীবনের সম্পর্ক কি? সুরেশচন্দ্রের তা ধারণার অতীত ছিল। কিন্তু মানুষের কার্য কারণ পরম্পরা কি দুর্জ্ঞেয় হয়ে দেখা দেয় চলার পথে!

সেই প্রথম দিনের পর মাঝে মাঝেই তাঁদের সাক্ষাৎ হতে থাকে। চিকিৎসকের প্রিয়-পাত্র সুরেশ বিশ্বাস আসেন সে বাড়িতে। কন্যার সঙ্গে কথাবার্তাও কখনো হয়। তিনি সুযোগ খোঁজেন দেখা হওয়ার। সঙ্গ কামনায় উন্মুখতা জাগে।

কিন্তু ব্রেজিল-ললনা যেন শীতল। কোন আগ্রহ দেখা যায় না এ বিদেশীর প্রতি। সাধারণ ভদ্র ব্যবহার মাত্র।

এমনিভাবে কিছুদিন যায় মনের আবেগ কখনো ব্যক্ত করেন না সুরেশচন্দ্র।

ক্রমে পরস্পরে আরো জানা শোনা হয়। কথায় কথায় প্রকাশ পায় বিদেশী যুবকের বহু-বিচিত্র জীবন। নানা আশ্চর্য অভিজ্ঞতা আর দুঃসাহসিকতার কাহিনী।

নারী-চিত্তে দোলা লাগে। আরো কৌতূহল জাগে এই

অদ্ভুৎ-কর্মার পরিচয়ে। আর এক অজ্ঞেয় আকর্ষণ বোধ। কোন্ রহস্য-লোকের সোনার কাঠির মায়া-স্পর্শ। সুরেশ বিশ্বাসের রোমাঞ্চকর জীবন, কৈশোর থেকে এই যৌবনকাল পর্যন্ত পৃথিবীর দেশে দেশে অভিযান সেই মুগ্ধ মনে অপূর্ব অনুভব জাগায়। ভারতীয় যুবকের বেশ ধারণ করে রূপ-কথার রাজপুত্র।

তখন বন্ধুত্বের সীমা প্রায় লঙ্ঘন হয়ে গেছে। এমন একদিন তাঁর দিকে চেয়ে মানসী বললে, 'তোমাকে সৈনিকের পোশাকে বোধহয় চমৎকার মানাবে।'

হঠাৎ কিছু উত্তর দিলেন না তিনি। কিন্তু সপ্রশংস দৃষ্টির সঙ্গে এই অভিনব উক্তিটি তাঁর মর্মস্থলে গাঁথা হয়ে গেল। অন্তর ঝংকৃত, আলোড়িত হয়ে উঠল একটি মাত্র সাদর বাক্যে।

মন স্থির করে তিনি সরকারী পশুশালার অধ্যক্ষতায় ইস্তফা দিলেন। সেনা-বাহিনীতে প্রবেশ করলেন সাধারণ সৈনিক হয়ে। প্রণয়িনীর সাধ পূর্ণ করতে জীবনের গতিপথ একেবারে পরিবর্তিত হল। সামান্য সৈনিক থাকতে বাধ্য রইলেন তিন বছরের চুক্তিতে। তখন তিনি বিভিন্ন বিদ্যায় কৃতবিদ্য, সার্কাসে স্বনামধন্য, রাজকর্মচারী-রূপে জীবনে প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু এই স্বার্থত্যাগের জন্যে মনে তাঁর কোন গ্লানি নেই। বরং অনুরাগে রঞ্জিত, পুলকিত হৃদয়!

সুরেশ বিশ্বাসের জীবনের আরেক অধ্যায় আরম্ভ হল। কঠোর শ্রমে, উদ্যমে আয়ত্ত করতে লাগলেন সামরিক শিক্ষা-নিয়ম শৃঙ্খলা। বয়স তখন ২৬ বছর।

সৈন্যদলে এসে ব্রেজিলের বর্ণ-বিদ্বেষের পরিচয় তিনি

পেলেন। গণ্য হলেন, আরেক শ্বেতকায় জাতির পদানত ভারতের 'নেটিভ' বলে। এখানকার পর্তুগীস ও অন্যান্য সাদা কর্তাদের ঘৃণার পাত্র! উন্নতির প্রতি পদে অন্যায় বাধা পড়তে লাগল।

কিন্তু অসামান্য অধ্যবসায় ও প্রতিভায় সুরেশচন্দ্র পথ করে নিলেন। বিদ্বিষ্ট সামরিক কর্তৃপক্ষ রুদ্ধ করতে পারলেন না তাঁর অগ্রগতি। এক বছরের মধ্যেই তিনি একটি পদাতিক দলের কর্পোরাল হলেন।

তখন তাঁকে আসতে হল সাণ্টাক্রুজে। এখানে তাঁর কাজ সম্রাটের অশ্বরক্ষকদের তত্ত্বাবধায়ন। তাতে অল্পই সময় যায়। দীর্ঘ অবসর তিনি যাপন করেন নানা বিষয়ক গ্রন্থ পাঠে আর রাসায়নিক পরীক্ষায়।

তারপর স্থানান্তরিত হয়ে রিও-ডি-জেনিরোতে এলেন। এখানে হলেন সামরিক চিকিৎসাগারের তত্ত্বাবধায়ক (সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট্, মিলিটারি হসপিট্যাল)। আগে থেকেই চিকিৎসা-বিজ্ঞানের বইপত্র পড়ে কিছু অভিজ্ঞতা হয়। এবার সুযোগ পেলেন ব্যবহারিক বিদ্যালাভের, বিশেষ অস্ত্র চিকিৎসার। আর, এমন পারদর্শী হলেন যে এখানকার রোগীদের অস্ত্রোপচার পর্যন্ত করতে লাগলেন।

সৈন্যদলের মেয়াদ শেষ হল ১৮৮৯ সালে। তিনি কিন্তু সমর বিভাগ আর ত্যাগ করলেন না। আগেই তিনি পদ পরিবর্তন করে নেন, অশ্বারোহী থেকে পদাতিক শ্রেণীতে। বন্দুক চালনাও ভালভাবে শেখেন।

সে সময়েই দুটি মহাবিপদ ঘনিয়ে আসে ব্রেজিলে। মার্কিনের মারাত্মক ব্যাধি পীত জ্বর মহামারী আকারে দেখা

দেয়। সেই সঙ্গে রাজ্যে ব্যাপক বিদ্রোহ। পীত জ্বরে পীড়িত কিংবা যুদ্ধাদিতে আহত মানুষের দল আশ্রয় নিতে থাকে সরকারী চিকিৎসাগারে। সুরেশচন্দ্রের তখন কর্মবীর রূপ। রীতিমত যোগ্যতা ও নিষ্ঠায় তিনি যুগপৎ যুদ্ধ ও সেবার দায়িত্ব পালন করতে থাকেন। এ দেশীয় বহুজনের শ্রদ্ধাভাজন হন এই অভিনব ভূমিকায়।

তারপর কর্পোরাল থেকে তিনি পদাতিক বাহিনীর প্রথম সার্জেণ্ট হলেন। সেই উন্নীত পদে রইলেন ১৮৯৩ পর্যন্ত। সমপদস্থদের চেয়ে তাঁকে অনেক বেশি কাজ ও দায়িত্ব দেয়া হত। অথচ তাঁর পদোন্নতিতে বাধা পড়ত বর্ণ-বৈষম্যের জন্যে। নানা বীরত্বের কাজ, রাজ্যের নানা কল্যাণ করে যশস্বী হলেও, রাজকর্মচারীদের প্রশংসা পেলেও চার বছর কোন উচ্চতর পদ তাঁকে দেয়া হয়নি। চার বছর পরে হন প্রথম লেফটেনাণ্ট্।

এ পদের গুরুত্ব কম নয়। রেজিমেণ্টের দ্বিতীয় পদ। এবার তিনি একটি সেনাদলের অধিনায়ক হলেন। রাজ্যে তখন দুর্যোগের ঘনঘটা। বিদ্রোহ পরিণত হয়েছে ঘোর রাষ্ট্রবিপ্লবে।

লেফটেনাণ্ট হবার সময়কার ঘটনা বর্ণনা করে কাকা কৈলাসচন্দ্রকে তিনি পত্র লেখেন, —'আমি এখন যে পদ পেয়েছি, ভাববেন না সহজে পেয়েছি। আমি যে এদেশের সেনাদের মধ্যে একজন হব, এ আমি কখনো ভাবিনি। অনেক সময়েই আমার পদোন্নতির কথা উঠেছে আর প্রত্যেক বারই আবার নাম চাপা পড়েছে—আমি বিদেশী বলে আমার পদোন্নতিতে প্রত্যেকবার ব্যাঘাত ঘটেছে। সম্প্রতি দেশে

বিপ্লব উপস্থিত হয়েছে—আমি ও সমপদস্থরা একজন প্রধান সেনাপতির অধীনস্থ হয়েছি। ইনি আমাকে চিনতেন না—কিন্তু ন্যায়বান ব্যক্তি—লোকের গুণ গ্রহণে বিরত নন। আমি কোন্ দেশবাসী, আমি কে, তা একবারও দেখেননি। যুদ্ধক্ষেত্রে আমার সাহস ও যোগ্যতা দেখে প্রীত হয়ে আমার পদোন্নতির জন্যে রাজপুরুষদের লেখেন—তাতেই আমার এই পদোন্নতি ঘটেছে। তিনি আমার সম্বন্ধে এ দেশের মার্শাল ভাইস প্রেসিডেন্টকে বিশেষ রূপে লিখেছিলেন, তাতেই আমি লেফটেনাণ্টের পদ লাভ করেছি। আপনি বোধহয় শুনেছেন যে, আমি লেফটেনাণ্ট হয়ে নাথেরয় নামক জায়গায় যে ঘোর যুদ্ধ হয়েছিল, তাতে বিশেষ দক্ষতা দেখাই। আমাদেরই জয় হয়েছে।'

নাথেরয় রণক্ষেত্রে সুরেশচন্দ্রের বীরত্বের জন্যই বিজয়ী হয় সাধারণতন্ত্রী সৈন্যদল। আর এই বিদেশী যুবকের নাম ব্রেজিলের ইতিহাসে সগৌরবে স্থান পায়।

এই যুদ্ধের আগেই চরিতার্থ হয়েছিল তাঁর সেই পরম আকাঙ্ক্ষাটি। সামরিক জীবন বরণের সকল কাঁটা ধন্য করে প্রেমের পুষ্প কুসুমিত হয়েছিল। প্রেয়সীকে পেয়েছিলেন পত্নী-রূপে।

তাঁদের বিবাহ উপলক্ষ্যে যে উৎসব হয় তা' তাঁর প্রতিষ্ঠা প্রতিপত্তির উজ্জ্বল নিদর্শন। মহা সমারোহে সম্পন্ন সেই অনুষ্ঠানে রিও-ডি-জেনিরোর সমস্ত মান্যগণ্য ব্যক্তি উপস্থিত হয়ে তাঁকে শুভেচ্ছা জানিয়েছিলেন।

রাজধানীর অভিজাত সমাজে অনেক বন্ধু লাভ করে তিনিও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি হয়েছিলেন। স্বদেশ ও সমাজ থেকে

বহুদূরে থেকেও বন্ধুর অভাব কখনো বোধ করেনি সুরেশচন্দ্র। সহৃদয়, মিশুক স্বভাবের গুণে ব্রেজিলেও গণ্যমান্য সুহৃদ পরিবৃত হয়ে থাকতেন। রিও-ডি-জেনিরোর প্রধান জমিদার ও ধনী মিঃ লাজোস হলেন তাঁর সবচেয়ে অন্তরঙ্গ বান্ধব।

বিবাহিত জীবনেও সুখী হন তিনি।

নাথেরয় যুদ্ধে জয়লাভের পর তাঁর সামরিক জীবনও চূড়ান্ত উন্নতির পথে এগিয়ে যায়। প্রথমে হন পদাতিক সৈন্যদলের প্রথম লেফটেনাণ্ট। আর পরে—কর্ণেল। সেই বর্ণ-বিদ্বেষের পরিস্থিতিতে কোন বিদেশীর পক্ষে তাঁর এই পদোন্নতি এক অতুলনীয় দৃষ্টান্ত।

কর্ণেল সুরেশ বিশ্বাস—এই নামেই তিনি সবচেয়ে প্রসিদ্ধ থাকেন উত্তর জীবনে।

সেই সঙ্গে বৈষয়িক দিকেও তাঁর গৌরবের কাল আসে। রিও-ডি-জেনিরোর একজন অতিশয় সম্মানিত ও বর্ধিষ্ণু ব্যক্তি রূপে পরিগণিত হলেন। পারিবারিক জীবনে প্রেমময়ী স্ত্রী, তিন পুত্র ও এক কন্যা নিয়ে সুখী গৃহপতি। সমাজে বীর সজ্জন, সুপণ্ডিত কর্মী বলে খ্যাতি প্রতিপত্তি। বিজ্ঞানের একাধিক শাখায়, দর্শন শাস্ত্রে, চিকিৎসা বিদ্যায় ও ইউরোপীয় নানা ভাষায় অধিকার। ১৪ বছর বয়স থেকে যে বিপদসঙ্কুল জীবনের সূচনা, সুদূর বিদেশে তার এই আশ্চর্য সুপরিণতি। ৪৫ বছরের স্বল্পায়ত জীবনে এ্যাডভেঞ্চারের পরাকাষ্ঠা।

কিন্তু বহিরঙ্গ জীবনে এই বিপুল সার্থকতা সত্বেও তাঁর চিত্তের সংবাদ কি? বাইরে থেকে কেউ ধারণা করতে পারতেন না সে মনের গহনের পুঞ্জীভূত বেদনা! কি বিচিত্র রহস্য-অতল মানব-হৃদয়।

১৯০৫ সালের কথা। তখন তাঁর ৪৪ বছর বয়স। বাল্য-বন্ধু পি. মুখার্জীকে লেখা চিঠিতে সুরেশচন্দ্রের এক অজ্ঞাত অন্তর্দ্বন্দ্বের পরিচয় পাওয়া যায়,—'আমি মানসিক অশান্তি দূর করিবার জন্য ম্যাগনেটিস্‌ম, জ্যোতিষ, প্রেততত্ব, শারীর-তত্ব প্রভৃতি অধ্যয়ন করি। কিন্তু ইহাতে আমার অশান্তি দূর হইল না'।

কি সেই অব্যক্ত অশান্তি? ওই সুহৃদকেই লেখা পরের চিঠিতে সেই তীব্র মনঃকষ্টের স্বরূপ তিনি সরলভাবে প্রকাশ করেছেন। তাহল, পিতা মাতা ভ্রাতা ও অন্যান্য স্বজনদের কথা চিন্তা করে, সকলের সঙ্গে চিরবিচ্ছেদের জন্যে নিদারুণ অন্তর্বেদনা। ঘটনাচক্রে আপনজনদের ত্যাগ করে গেছেন। চিরবিদায় নিয়েছেন পরম্পরাগত নিজের সামাজিক পরিবেশ থেকে। কিন্তু সেই দুস্তর বিজাতীয় পারিপার্শ্বিকের মধ্যে অবস্থান করেও বিগত জীবনের জন্যে মর্মান্তিক আকুলতা বোধ করছেন। ভুলতে পারেননি আপনার মূল উৎসকে।

শেষ অধ্যায়ে তিনি স্মৃতির দংশনে যে কি জর্জরিত হয়েছিলেন তা হয়ত অজানা ছিল তাঁর অন্তরদের কাছেও।

ব্রেজিলে কেউ সম্ভবত ধারণা করতে পারেননি, কর্ণেল বিশ্বাসের মন কতখানি অধিকার করে রেখেছিল তাঁর স্বজন ও স্বদেশ!

মৃত্যুর কদিন মাত্র আগে, ১৯০৫ সালে লেখা শেষ চিঠিতে জানিয়েছিলেন যে, আরো অনেক কথা তাঁর বলবার আছে। পরে লিখবেন।

কিন্তু সে অবসর আর পাননি সুরেশ বিশ্বাস!

শেষ অঙ্কে নাট্যাচার্য

'সীতা'-র যুগ থেকে কত নাটকের পঞ্চমাঙ্কে দর্শকদের অভিভূত করেছিলেন শিশিরকুমার ভাদুড়ি। 'শ্রীরঙ্গম্' নিষ্প্রদীপ হবার সঙ্গে তাঁরই জীবন-নাট্যের চতুর্থ অঙ্কে যবনিকা পতন হল। ১৯৫৬ সালের জানুয়ারিতে সেই 'প্রফুল্ল' অভিনয়ের শেষে আরম্ভ পঞ্চম অঙ্ক।

অচিন্ত্য ভবিষ্যতের ভার বুকে নিয়ে 'যোগেশ' মঞ্চে প্রবেশ করেছিলেন সে সন্ধ্যায়। 'আমার সাজানো বাগান শুকিয়ে গেল'—শিশিরকুমারেরই মর্মক্রন্দন কিনা প্রেক্ষাগৃহের দর্শক-দের তা ধারণা করা সম্ভব ছিল না। কারণ তাঁরা জানতেন না, এ মঞ্চে এই তাঁর শেষ অবতরণ!

যখন স্থির হয়ে যায় যে, সেই অভিনয়ের পর 'শ্রীরঙ্গম্' পরিত্যাগ করতে হবে, তখন সম্প্রদায়ে কথা উঠেছিল, বিজ্ঞপ্তি দেয়া হোক—অদ্য শেষ রজনী।

নাট্যাচার্য আপত্তি জানান, 'শেষ রজনীর ঘোষণা যেন দর্শকদের কৃপা ভিক্ষা। ওটা কোর না।'

অভিনয়ের পর 'রমেশ'-রূপী ছবি বিশ্বাস আচার্যের কাছে বিদায় নিলেন। তারপর সম্প্রদায়ের সকলে এসে দাঁড়ালেন সামনে। নাটক শেষের ম্লানালোক মঞ্চে তখন বিষণ্ণ পরি-বেশ। সাশ্রুনয়ন অভিনেত্রীরা। শিষ্য নট-বৃন্দ বিষাদাচ্ছন্ন। শেষের রাত্রিতে আগামী দিনের কথা সবাই শুনতে চান। কোন আশার কথা, আশ্বাসের আভাস আচার্যের

কাছে পাওয়া যাবে কি? অন্য কোন নাট্যশালার সম্ভাবনা?

পরিশ্রান্ত শিশিরকুমার সেই অনন্নুকরণীয় কণ্ঠস্বরে জানালেন, 'ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত। পরের কথা আমি কিছুই ভাবতে পারছি না, কি বল্‌ব। আগে এমন অনেকবার হয়েছে। এক স্টেজ গেছে, আবার একটা হাতে এসেছে। কিন্তু এখন বয়েস হয়েছে আমার। এবার কি হয় বলতে পারি না। কিছু একটা ব্যবস্থা হলে তোমাদের খবর দেব। তোমরা আবার এস।'

পরের দিনই ১৪ বছরের আনন্দ বেদনা সাফল্য ব্যর্থতার শত স্মৃতি বিজড়িত 'শ্রীরঙ্গম' থেকে চিরবিদায়ের আয়োজন। শুধু মঞ্চ নয়, নাট্যাচার্যের বাসস্থানও সেই সঙ্গে পরিত্যাগ করতে হবে। নাট্যশালা সংলগ্ন পিছনের ছোট বাড়িটিতে এতকাল ছিলেন থিয়েটারের সঙ্গে কায়মনোবাক্যে একাত্ম হয়ে। আত্মজনদের নিয়ে পরিবারের কর্তারূপে বাস করতেন। বৃহৎ কক্ষটিতে চতুর্দিকে বিক্ষিপ্ত পুস্তকরাশির মধ্যে নিমগ্ন থাকতেন অবসরকালে।

সব পাট তুলে নিয়ে সিঁথির সেই ক্ষুদ্রতর গৃহে চলে গেলেন। ২৭৮ ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক্‌ রোডে। আগেও কখনো কখনো অবস্থা বিপর্যয়ে আশ্রয় নিয়েছেন এখানে। প্রায় ২০ বছর যাবৎ বাড়িটি তাঁর ভাড়া করাই ছিল। এখন স্থায়ীভাবে বাস আরম্ভ হল, যদিও প্রথমে ভেবেছিলেন, সাময়িক।

'নাট্য নিকেতন' মঞ্চকে যখন 'শ্রীরঙ্গম' নামাঙ্কিত করেন তখনই শিশিরকুমারের চতুর্থ অঙ্কের প্রথম দৃশ্য। সেই ১৯৪১ সালের নভেম্বরে 'জীবন রঙ্গ' নাটকের পট উত্তোলনের সঙ্গে।

তার কদিন আগেই আপন হাতে গড়া 'নাট্যনিকেতন' থেকে প্রবোধচন্দ্র গুহ বিদায় নিয়েছিলেন। বৃহত্তর জীবনেরই প্রতিরূপ যেন রঙ্গমঞ্চ! প্রবেশ আর প্রস্থানের পালায় ভরা।

পাঁচ বছর মঞ্চাভাবে অদর্শনের পর তখন শিশিরকুমার 'শ্রীরঙ্গমে' আসেন 'জীবনরঙ্গ' নাটকে নাট্যাচার্যের ভূমিকায় অভিবাদন করলেন দর্শকদের। তারপর ১৪ বছর যাবৎ তাঁর বিশিষ্ট নাট্য-রস পরিবেশন করে গেলেন, পরিণত বয়সেও যৌবনের দ্যুতিতে। একাদিক্রমে এতদিন কোন মঞ্চে নট-নাট্যাচার্যের ভূমিকা পালনের সুযোগ তাঁর হয়নি। এদেশে তাঁর পূর্ববর্তী কোন নাট্য-শিল্পীর ভাগ্যেও তা হয়েছে কিনা গবেষণার বিষয়।

'জীবনরঙ্গ' থেকে এখানে তাবৎ নাটকের প্রয়োগকর্তা এবং নানা প্রধান ভূমিকার অভিনেতাও তিনি। জীবনরঙ্গ (অমরেশ), উড়ো চিঠি (সুনীল), দেশবন্ধু (কল্হন), মায়া (জ্যেঠামশায়), মাইকেল (নাম চরিত্র), বিপ্রদাস (প্রথমে পরিচালনা। বিশ্বনাথ ভাদুড়ির মৃত্যুর পর নাম ভূমিকা), তাইতো (পরিচালনা), বিন্দুর ছেলে (প্রথমে পরিচালনা। মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য মঞ্চ-ত্যাগ করবার পরে যাদব চরিত্র), সিরাজুদ্দৌলা (গিরিশচন্দ্রের এই নাটকের শিশির-মঞ্চে প্রথম অভিনয়। প্রথমে পরিচালনা। পরে নাম ভূমিকা), দুঃখীর ইমান (পরিচালনা), পরিচয় (রায় বাহাদুর), তখ্‌ৎ-এ-তাউস (জাহান্দার শাহ্) প্রশ্ন (নীতীন্দ্র)প্রভৃতি। তা ভিন্ন, অন্য নানা ভূমিকা এবং তাঁর প্রথম ও মধ্য জীবনের প্রায় যাবতীয় স্মরণযোগ্য (নাদির শাহ্ ছাড়া) নাট্য চরিত্রেও শ্রীরঙ্গম মঞ্চে

তিনি অবতীর্ণ হয়েছেন। যথা—রাম, আলমগীর, চাণক্য, যোগেশ, জীবানন্দ, নিমচাঁদ, রাসবিহারী, রঘুবীর, মৃগাঙ্ক, লরেন্স ফস্টর, ঔরংজীব, সাজাহান (কোন কোন রজনীর 'সাজাহান' নাটকে পিতা পুত্রের দুটি চরিত্রেই যুগপৎ রূপদান), আবন, চন্দ্র, নিতাই, রসিক, দিগম্বর, বক্তিয়ার ও ঘাতক, বাঁড়ুজ্যে, বিদূষক প্রভৃতি।...

এখানে শিশিরকুমারের শেষ মঞ্চাবতরণ ১৯৫৬র প্রথমে, সেই যোগেশ চরিত্রে।

নাট্টাচার্যের এই অবসর গ্রহণ নাট্টজগতের এক বড় অঘটন। কিন্তু কেন ঘটল?

গিরিশচন্দ্রের পর অপ্রতিদ্বন্দ্বী অভিনেতা, রবীন্দ্রনাথ ভূষিত 'নটরাজ', অমৃতলাল বসু আখ্যাত 'শিশির, তুমি আমাদের মধ্যে প্রধান ও প্রথম প্রডিউসার', অর্ধেন্দুশেখরের পরে শ্রেষ্ঠ নাট্য শিক্ষক, বীর্য মাধুর্যে মণ্ডিত অনুপম কণ্ঠ-সম্পদের অধিকারী, ভাবাভিব্যক্তিতে অতুলনীয়, নটকুলে সর্বোত্তম বিদ্বান শিশির কুমার ভাদুড়ি! নাট্টাচার্য-নট-রূপে তখনো অক্ষুণ্ণ প্রতিভা। ব্যবসায়ী মঞ্চের অভিজ্ঞতা দীর্ঘ ৩৫ বছরের। সৌখীন পর্ব থেকে প্রায় ৫০ বছরের অভিনেতৃ জীবন। স্বাস্থ্য, উদ্যম, উৎসাহ, নিষ্ঠা, সংগঠনী শক্তি, নব নব প্রচেষ্টার সাহসিকতা সবই প্রায় অটুট। তবু তাঁর নাট্যশালা নিষ্প্রদীপ হবার কারণ কি?

শিশির-প্রতিভার যোগ্য নতুন নতুন নাটকের অভাব? মার্জিত-রুচি, বোদ্ধা দর্শকবর্গের ক্রম-স্বল্পতা? তরল-মতি যুগের নিম্নগামী চাহিদা? বাংলার বৃহত্তর সাংস্কৃতিক, সামাজিক ক্ষেত্রে বিপর্যস্ত অবস্থা? সেসবের মূল্যায়ন গবেষকের এক্তিয়ার।

কিন্তু বাস্তব শোচনীয়ভাবে প্রকট হতে থাকে।

আলোকোজ্জ্বল নাট্যশালার ওপর ঘনায়মান অশুভ ছায়া গত কয়েক বছর থেকে ক্ষুব্ধ চিত্তে লক্ষ্য করছিলেন নাট্যাচার্য। কিন্তু সুসংস্কৃত মানের আদর্শ জলাঞ্জলি দিয়ে অর্ধশিক্ষিত, নব-স্বাক্ষর-সম্পন্ন নিম্নরুচির মনোরঞ্জন করা তাঁর শিল্পীসত্তায় অকল্পনীয়।

'খেলো নাটক কিছুতেই করব না। তাতে বরাতে যা হয় হবে।'

এই ছিল তাঁর মুখের ও মনের কথা। তাই সংস্কৃতির অধঃপতনকালে আদর্শবান আর্টিস্টের জীবনে যা ঘটে, শিশিরকুমারেরও তাই হল। স্বদেশের নাট্য-কলায় যিনি নব যুগ ও সম্প্রদায় প্রবর্তক, তরুণ অভিনেতৃ কুলে যাঁর অভিনয় ভঙ্গী, অভিব্যক্তি, অঙ্গ সঞ্চালন, বাচন-রীতি অনুসরণ করে চলেছেন, বাঙ্গালীকে নাট্যমঞ্চ-মনা করতে যাঁর দান ঐতিহাসিক—সেই সর্বশ্রেষ্ঠ সংস্কৃতিবান নাট্যাচার্য-নট তাঁর সুপরিণত প্রতিভার দিনে মঞ্চ হারালেন!

সেই যে আর্ট থিয়েটারে (স্টার মঞ্চে, ১৯৩০ জুলাই) 'কর্ণার্জ্জুন' নাটকের দ্বিতীয় অঙ্ক পঞ্চম দৃশ্যে কর্ণের সংলাপ অনিন্দ্য, স্পন্দিত কণ্ঠস্বরে, আন্দোলিত বাহু সঞ্চালনে তিনি আবৃত্তি করেছিলেন—

'ভাগ্য—ভাগ্য! নাহি জানি ছায়া কিংবা কায়া—কোন্ মায়ার সৃজন:

নারী কিংবা নর—কি আকার তার,
পীড়নে যাহার ত্রস্ত ত্রিসংসার;
স্বেচ্ছাচার—শাসন দুর্বার—

অবহেলে করে পদানত দেবতা মানব।
নিয়তি—নিয়তি—কোথা তার স্থান?
বিশ্ব হতে কত—কত দূরে,
কোন্ স্বর্গে, ভীষণ নরকে, কিম্বা অন্ধতম রসাতলে-'
কর্ণ জীবনের সেই ট্রাজেডি শিশিরকুমারেরও!

কিন্তু ভাগ্যের হাতে আত্মসমর্পণ করবার মতন ব্যক্তিত্বহীন তিনি ছিলেন না। নাট্যশালায় সেই অসুস্থ লক্ষণ দেখে সচেষ্ট হয়েছিলেন তাকে রোধ করতে। বহুদিনের পরিপোষিত সাধ জাতীয় নাট্যশালা প্রতিষ্ঠার চিন্তা নতুন করে তাঁর মনে জাগল। পেশাদার রঙ্গমঞ্চের লাভ ক্ষতির নিত্য দুশ্চিন্তা ও অনিশ্চয়তার কবল থেকে মুক্ত নাট্যকলা সেবা। নির্বিঘ্নে নিরাপদে অর্থোপার্জন তাঁর লক্ষ্য নয়। সে উদ্দেশ্য থাকলে অন্য রঙ্গমঞ্চে যাপন করতেন নিশ্চিন্তে।

নাট্যলোক সম্পর্কে শিশিরকুমারের সত্তা ছিল সামগ্রিক। পরিশীলিত দর্শক-সমাজের জন্যে মার্জিত-রুচি নাট্য-প্রয়োগ পদ্ধতি, বিশেষ শিক্ষাপ্রাপ্ত, নট-গোষ্ঠি নিয়ে শিল্প-সুন্দর অভিনয় ধারা, উৎকৃষ্ট নাটক। সর্ব সমন্বয়ে সুসম্পূর্ণ তাঁর নাট্যাদর্শ। তাই যে কোনো মঞ্চে শুধু ব্যক্তিগত অভিনয়ে তাঁর প্রতিভা তৃপ্ত ও স্ফূর্ত হতে পারে না।

জাতীয় নাট্যশালায় পরিকল্পনা নিরুপায় হয়ে করেননি তিনি। 'শ্রীরঙ্গম্' পর্বের শেষ দিকে আর্থিক অসাফল্যের জন্যেও নয়। জাতীয় নাট্যশালা স্থাপনের চিন্তা তাঁর বহুদিনের। পেশাদারী নাট্য-জীবনের প্রথম থেকেই এ পরিকল্পনা তাঁর ছিল।

সফলতার স্বর্ণমণ্ডিত 'নাট্য মন্দির' যুগে তাঁকে অভিনন্দিত

করেছিলেন স্বদেশের বরণীয় সন্তান ও মনস্বীবৃন্দ। তাঁদের অন্যতম দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন। তিনি সর্ব্বস্বত্যাগী হয়েও ত্যাগ করতে পারেননি দেশের সংস্কৃতি-প্রীতি। নাট্যকলা, সঙ্গীত, কাব্য প্রভৃতির সমাদর। সংস্কৃতি সেবকদের প্রতি বাস্তব অনুরাগ। শিশিরকুমারের নবোদ্ভিন্ন প্রতিভার তিনি তখন অকুণ্ঠ গুণগ্রাহী।

নবীন নাট্যাচার্যের বিজয় বৈজয়ন্তী 'সীতা'র উদ্বোধন মনোমোহন নাট্যমন্দিরে দেশবন্ধুই করেছিলেন (৬ই আগস্ট, ১৯২৪)। তারও আগে, ম্যাডানের আমল থেকে তিনি শিশির-অভিনয়ের মুগ্ধ দর্শক। সেই 'আলমগীর', 'রঘুবীর', 'চন্দ্রগুপ্ত' প্রভৃতিতে সে প্রদীপ্ত প্রতিভার আত্মপ্রকাশের যুগে।

দেশবন্ধুর কারাবরণের দিন দেশ বিষাদাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। শিশিরকুমারের 'রঘুবীর' সেদিন মঞ্চস্থ হবার কথা। সেকথা সেই অবস্থায়ও মনে রেখেছিলেন চিত্তরঞ্জন।

কারা তোরণে প্রবেশ করবার আগে শিশিরকুমারের উদ্দেশে অনুজ্ঞা পাঠান—'থিয়েটার যেন বন্ধ না থাকে। প্লে হবে।'

জাতীয় নাট্যশালার পরিকল্পনা সেই মহাপ্রাণের কালের কথা। দেশবন্ধুর যখন জীবন-সায়াহ্ন এবং শিশিরকুমারের নাট্য-জীবনে উদ্ভাসিত মধ্যাহ্ন লগ্ন। সেই সব সুবর্ণ সময়, যখন একদিন নাটোর মহারাজ জগদিন্দ্রনাথ হাসতে হাসতে বলেছিলেন, 'শিশির, তোর ভাবনা কি? যা দালাল পেয়েছিস্!'

'আমার দালাল ?'

'হ্যাঁরে। মিস্টার সি. আর, দাস। যার সঙ্গে দেখা হচ্ছে তাকেই ধরে দাস সাহেব বলছেন—তুমি শিশির ভাদুড়ির সীতা দেখেছ? এখনো দেখোনি?'

সেই 'সীতা'-র পরিপূর্ণ প্রেক্ষাগৃহে রাত্রির পর রাত্রি যখন রামের সেই অপূর্ব আকুলতা 'কার কণ্ঠস্বর?' কিংবা সীতার পাতাল প্রবেশে শোকাহত তিন গ্রামে উচ্চারিত উদাত্ত উদ্বেল আহ্বান 'সীতা, সীতা, সীতা' দর্শকদের অভিভূত করত, তখন কজনের জানা ছিল—'রামচন্দ্র' ৮০ হাজার টাকা ঋণভার মস্তকে ধারণ করে নাট্যমন্দিরের এই প্রথম নাটকের যবনিকা উত্তোলন করেছেন? এবং অভূতপূর্ব জনপ্রিয়তা সত্ত্বেও প্রতিষ্ঠিত হতে পারেননি সুদৃঢ় আর্থিক ভিত্তিতে।

কিন্তু দরদী দেশবন্ধু সেকথা জেনেছিলেন। মূলধনের অভাব, বিপুল বাড়ি ভাড়া, সম্প্রদায়ের বেতন, মঞ্চ সরঞ্জাম ইত্যাদি ব্যয়ের বিবরণ শুনে বলেছিলেন, 'এমনভাবে কি করে চল্‌বে?'

শিশিরকুমার তখন তাঁকে জানান জাতীয় নাট্যশালার পরিকল্পনা।

দেশবন্ধু জিজ্ঞাসা করেন, 'ন্যাশানাল থিয়েটারের জন্যে মোট কত টাকা দরকার?'

প্রথমে কথা হয়েছিল, এক লক্ষ টাকা। কিন্তু কেবল নাট্য-সদন, মঞ্চ উপকরণ নয়। সেই সঙ্গে নাট্য শিক্ষালয়, প্রয়োজনীয় গ্রন্থাগার প্রভৃতি সমেত জাতীয় নাট্যশালার এক সার্বিক পরিকল্পনা পেশ করে শিশিরকুমার বলেন, 'দু লাখ হলে ভাল হয়।'

দেশবন্ধু আশ্বাস দেন, 'ন্যাশনাল থিয়েটারের জন্যে এ

টাকা বোধহয় তোমায় তুলে দিতে পারব। শরীরটা বড় খারাপ হয়েছে, শীগগীর দার্জিলিঙ যাচ্ছি। ফিরে এসেই টাকার ব্যবস্থা করব।'

কিন্তু দার্জিলিঙ থেকে আর ফেরেননি দেশবন্ধু!

তার ২২ বছর পরের কথা। 'শ্রীরঙ্গমে'র তখন মধ্য পর্ব। খণ্ডিত, স্বাধীন দেশের পশ্চিম বাংলার বিশিষ্ট মন্ত্রী কিরণশঙ্কর রায়। তিনি দেশবন্ধুর সহকর্মী থাকায় জাতীয় নাট্যশালা গঠনে তাঁর শিশিরকুমারকে ভরসা দেবার কথা জানতেন।

একদিন নাট্যাচার্যকে বললেন কিরণশঙ্কর, 'দেশবন্ধুর এই একটি শেষ ইচ্ছা পূর্ণ করা আমাদের কর্তব্য। এখন আমাদের হাতে ক্ষমতা এসেছে, এটা আমরা করব। আপনি সেই রকম স্কীম করে দিন।'

স্কীমও অবিলম্বে তৈরী হল। কিন্তু—'ভাগ্য-ভাগ্য! নাহি জানি ছায়া কিংবা কায়া…।' কিরণশঙ্কর কাল-ব্যাধিতে আক্রান্ত হলেন! তরুণ মন্ত্রী বিমলচন্দ্র সিংহকে তিনি উদ্‌যোগ করবার ভার দেন এ বিষয়ে। কিন্তু কিরণশঙ্করের মৃত্যুতে বিমলচন্দ্রের পক্ষে কিছু করা সম্ভব হল না।

পুনরায় বিধানচন্দ্রের আমলে কথাটা উঠল ক'বছর পরে। সম্ভবত বিমল সিংহের কাছে জেনে, একদিন শিশিরকুমারকে বিধানচন্দ্র আহ্বান করলেন। একেবারে কাযের কথা বললেন, 'কিরণবাবুর সেই স্কীমের কথা আমি শুনেছি। ওটা এবার আরম্ভ করা যাক। তবে একটা কমিটি হোক, গভর্নমেণ্ট সেই কমিটির হাতে টাকা দেবে।'

তখন শেষ পর্যায় চলেছে 'শ্রীরঙ্গম' মঞ্চের। নাট্যাচার্য নতুন আশায় বুক বেঁধে আবার পরিকল্পনা প্রস্তুত করলেন।

কথাবার্তা অগ্রসর হতে লাগল বিধানচন্দ্র তথা সরকারের সঙ্গে। স্থির হল, সমিতির সদস্য থাকবেন—পশ্চিম বাংলা সরকারের পক্ষে দুজন : উন্নয়ন অধিকর্তা এস. কে. দে, আই. সি. এস্ ও অর্থ বিভাগের উপসচিব নির্মল সেনগুপ্ত আই. সি. এস্ ; কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন প্রতিনিধি (শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়) ; বিশ্বভারতীর একজন প্রতিনিধি (চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য) ; কলকাতা কর্পোরেশনের একজন প্রতিনিধি এবং জনসাধারণের আস্থাভাজন একজন মনীষী (হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ অথবা সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়) প্রভৃতি। আর্থিক বিষয়ে পূর্ণ কর্তৃত্ব থাকবে সমিতির এবং মঞ্চ ও নাট্যাভিনয় সংক্রান্ত যাবতীয় ভারপ্রাপ্ত হবেন শিশিরকুমার। তবে যে নাটক তিনি অভিনয়ের জন্যে নির্বাচন করবেন তা সমিতির অনুমোদন সাপেক্ষ হওয়ার প্রয়োজন। এ পর্যন্ত উভয়পক্ষই —বিধানচন্দ্র ও শিশিরকুমার—একমত হলেন।

কমিটিতে সরকার পক্ষে আরেকজনেরও নাম আসে আলোচনার সময়ে। তিনি পশ্চিম বাংলা সরকারের প্রচার অধিকর্তা শ্রীমাথুর। তিনি নাটক নির্বাচন সম্পর্কে পরামর্শ দেবেন, কথা হয়। এ প্রস্তাবে আদৌ সম্মত হননি নাট্যাচার্য। স্পষ্ট ভাষায় আপত্তি জানিয়েছিলেন। বিধানচন্দ্রও তখন আর কিছু বলেননি মিঃ মাথুরকে নেবার জন্যে।

কিন্তু কয়েকদিন বৈঠকের পর, কথাবার্তা যখন অনেকদূর এগিয়েছে, বিধানচন্দ্র একদিন জোর দিয়ে বললেন, 'না, মাথুরকে কমিটিতে নিতে হবে। নাটক নির্বাচনের ব্যাপারে মাথুরের মতামত নেয়া দরকার।'

এখানেই গুরুতর মতানৈক্য ঘটল। নাটক কমিটির

অনুমোদিত হওয়া চাই—এ পর্যন্ত সম্মত ছিলেন শিশির-কুমার। কিন্তু একজন অবাঙ্গালী সরকারী কর্মচারী বাংলা নাটক নির্বাচনে হস্তক্ষেপ করবেন—এই সম্ভাবনায় তাঁর আত্মসম্মান ও নাট্যাদর্শে আঘাত লাগল। জাতীয় নাট্যশালা কি পর্যবসিত হবে একটা সরকারী প্রচার যন্ত্রে ? তাহলে এত কাণ্ডের প্রয়োজন কি ?

বিধানচন্দ্রকে তিনি সোজাসুজি বললেন, 'কিন্তু মিস্টার মাথুর বাংলা নাটকের কি জানেন ? নাটকের ব্যাপারে ওঁকে নিয়ে কাজ করতে পারব না। কেন, আপনার দুজন বাঙ্গালী আই. সি এস্. রইলেন তা কি যথেষ্ট নয় ?'

বিধানচন্দ্রের ওপর হয়ত অলক্ষ্যে বিশেষ চাপ পড়েছিল। তিনি অটলভাবে জানালেন, 'মাথুরকে না নিলে চলবে না'।

সুতরাং আলোচনা বা কথাবার্তা বন্ধ হল। জাতীয় নাট্য-শালার পরিকল্পনা বান্‌চাল হয়ে গেল এক অবান্তর কারণে ! 'নিয়তি—নিয়তি—কোথা তার স্থান ?...'

নিষ্প্রদীপ 'শ্রীরঙ্গম' মঞ্চে 'বিশ্বরূপা'-র আলো ঝল্‌সে উঠল। সিঁথির বিবর্ণ বাড়িটিতে বাস আরম্ভ করলেন আধুনিক বঙ্গ-রঙ্গমঞ্চের বর্ণাঢ্য নায়ক।

কিন্তু চির আশাবাদী তিনি। হতাশ্বাস হয়েও হতাশ মনোভাব পোষণ করতে পারেন না। আবার নতুন সংগ্রাম আরম্ভ করলেন বিরুদ্ধ ভাগ্যের সঙ্গে। অদৃষ্টের সঙ্গে যে যুদ্ধের সূচনা সেই ১৯৩০ থেকে। নটরূপে তাঁর অপূর্ব ব্যক্তিত্ব, উচ্চাঙ্গের প্রয়োগ-শিল্প, মার্জিত অভিনয়-সম্পদ সত্বেও রবীন্দ্র-নাথের 'তপতী'কে যেদিন (২৫, ডিসেম্বর, ১৯২৯) 'গ্যালারির দেবতারা' সবিদ্রূপে প্রত্যাখ্যান করে, তখন থেকেই তাঁর

ভাগ্যচক্রের বিপরীত আবর্তন। 'তপতী'র ব্যবসায়িক ব্যর্থতায় 'নাট্য-মন্দিরে'র গৌরব রবিও অস্তাচলে যায়। 'তপতী'র পরে 'প্রতাপাদিত্য' (রডা ও নাম ভূমিকা) ও 'মন্ত্রশক্তি' (মৃগাঙ্ক ও রমাবল্লভ) এখানেই অভিনয় করেছিলেন শিশিরকুমার। কিন্তু সূর্য আর দেখা দেয়নি উদয়াচলে। নাট্যমন্দিরের তুল্য প্রায় পাঁচ বছরের অবিচ্ছিন্ন সৌভাগ্য-রশ্মি আর বিকীর্ণ হয়নি তাঁর মঞ্চ জীবনে।

নাট্যমন্দিরের পর আর্ট থিয়েটারে কিছুদিন 'কর্ণার্জুন', তারপর আমেরিকায় সম্প্রদায় নিয়ে যাত্রা, ফিরে এসে রঙ-মহল ও নাট্যনিকেতনে অভিনয়ের পর পুনরায় স্টারে। এখানে 'কেদার রায়' ও 'দক্ষ যজ্ঞ' নাম ভূমিকায় মঞ্চস্থ করবার পর নতুন বন্দোবস্তে 'নব নাট্য মন্দির' নামে নিয়মিত অভিনয় আরম্ভ। এই পর্বে নানা নতুন, পুরণো নাটকের মধ্যে উল্লেখ্য নতুন নাটক 'বিরাজ বৌ, (২৮ জুলাই, ১৯৩৪ নীলাম্বর), 'বিজয়া' (২২ ডিসেম্বর, ১৯৩৪। প্রথমে রাস-বিহারী, পরে নরেন্দ্র), 'শ্যামা' (২৮ সেপ্টেম্বর, ১৯৩৫) প্রথমে চন্দনক, পরে উত্তীয়), 'রীতিমত নাটক' (১১ ডিসেম্বর ১৯৩১। দিগম্বর), 'অচলা' (২২ অক্টোবর, ১৯৩৬। প্রথমে কেদার, পরে সুরেশ), 'যোগাযোগ' (২৪ ডিসেম্বর, ১৯৩৬। মধুসূদন)। তারপর ১৯৩৭ সালে চির-যবনিকা পতন হয় নব নাট্য মন্দিরে।

পরের চার বছর বিভিন্ন মঞ্চে অনিয়মিত অবতরণের মধ্যে শিশিরকুমারের নাট্যজীবনে তৃতীয় অঙ্ক অভিনীত হয়ে যায়। তারপর ১৯৪১ থেকে শ্রীরঙ্গমে চতুর্থ অঙ্কের পটোত্তলন। ১৯৫৬ তে তার যবনিকা পতন।

সিঁথির বাড়িটিতে ৬৭ বছর বয়সের অলস অবসর যেমন অবাঞ্ছিত তেমনি দীর্ঘতর হতে থাকে। কর্ম-বিরত সৃষ্টি-হীন দিন বয়সের ভারে স্মৃতির ভারে মন্দাক্রান্তা।

নট বৃত্তির প্রথম দিকে সেই যে শরৎচন্দ্রের 'আঁধারে আলো' ছায়াচিত্রের নায়ক ও পরিচালক ছিলেন শিশিরকুমার, এখন বৃহত্তর অতীত জীবনের আলো আঁধারি এই পঞ্চমাঙ্কের মনের পটে ছায়াছবি উন্মোচন করে চলে।

সে কবেকার কথা। বিদ্যা চর্চার বেদী থেকে কোন্ অদৃষ্ট ইঙ্গিতে এসেছিলেন নটনাথের রঙ্গভূমিতে! তারও কত আগে এই দুর্বার নাট্যজীবনের সুচনা! অর্ধ শতাব্দ পূর্বে, ছাত্র জীবনেই সে নাট্য যাত্রা আরম্ভ।

স্কটিশ চার্চ কলেজের ছাত্র-অভিনেতা, সুদর্শন শিশির-কুমার ভাদুড়ি তখনই খ্যাতির সোপানে। শেক্‌স্‌পীয়রের মূল নাটকে অবতীর্ণ হয়েই অনিন্দ্য বাচন-ভঙ্গী ও অভিনয়ের জন্যে প্রসিদ্ধি: জুলিয়াস সীজারের ব্রুটাস (১৯০৮), হ্যাম-লেটের রাজা ও গোস্ট্ (১৯০৯), মার্চেণ্ট্ অফ্ ভেনিসের ব্যাসানিও (নরেশচন্দ্র মিত্র: শাইলক)। ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটে সেসব অভিনয়ের পর্ব।

সেই সময় (১৯০৯) বাংলা নাটকে তাঁর উল্লেখনীয় অভিনয় 'কুরুক্ষেত্রে' অভিমন্যুর ভূমিকা। ইনস্টিটিউটের সেই 'কুরুক্ষেত্র' তাঁর নাট্য পরিচালনারও প্রথম প্রয়াস হিসাবে স্মরণযোগ্য। তার চার বছর পরে সেই অভিমন্যু রূপেই সৌখিন তরুণ নট শিশিরকুমার দর্শক সাধারণের সামনে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন। লালদীঘির ডালহাউসি ইনস্টিটিউটে (এখন যেখানে টেলিফোন ভবন) যুদ্ধ ভাণ্ডারের সাহায্য

রজনীরূপে মঞ্চস্থ হয় 'কুরুক্ষেত্র'। অভিমন্যু চরিত্রে হৃদয়-স্পর্শী অভিনয়ে তিনি দর্শকদের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা পেয়েছিলেন। অভিমন্যুর সেই উদাত্ত স্বরে আকুল আকুতি 'মা গো মা গো' চমৎকৃত, অভিভূত করেছিল সকলকে।

তারপর আট বছর বিদ্যাসাগর কলেজে ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপনা। অবশেষে ১৯২১ থেকে আত্মপ্রকাশের প্রেরণায় নাট্যলোককেই জীবনের কর্মক্ষেত্ররূপে বরণ। নাট্য-শালার মাধ্যমে জাতির সেবা করবেন, এই জাতীয়তা বোধও শিশিরকুমারকে অনুপ্রাণিত করেছিল।

ম্যাডান কম্প্যানীতে যোগ দিয়ে মঞ্চস্থ করলেন 'আলমগীর' (১০ ডিসেম্বর, ১৯২১), 'রঘুবীর' (১১ মার্চ, ১৯২২), 'চন্দ্রগুপ্ত' (১ জুলাই, ১৯২২) প্রভৃতি। নাট্যজগতে সাড়া পড়ে গেল। শুধু অভিনয় নয়। প্রয়োগ-শিল্পেও অভিনবত্বের সূচনা হল তাঁর নেতৃত্বে। এখানে মনোমত পরিবেশ ও পূর্ণ কর্তৃত্ব না থাকায় সম্প্রদায় প্রবর্তনের সুযোগ শিশিরকুমার পাননি। তবু নিজের অভিনয় ধারায় শিক্ষা দেন হীরালাল দত্ত (পূর্ব যুগের অভিনেতা, কিন্তু শিশির নির্দেশে নতুন ধারা চমৎকার গ্রহণ করেন। শিশির সম্প্রদায়ের 'সাজাহান'-এর অনিন্দ্য দিলদার), গোপাল ভট্টাচার্য্য ('আলমগীর'-এর রামসিংহ ও নাট্যমন্দিরে 'ষোড়শী'র প্রথম এককড়ি), শীতল পাল, সুহাস সরকার প্রভৃতিকে। এঁরাই শিশিরকুমারের প্রথম পর্বের শিষ্য।

তারপর ইডেন গার্ডেন প্রদর্শনীতে (ডিসেম্বর, ১৯২৩) তাঁর প্রতিভার নতুন প্রকাশ দেখা গেল। চার রাত্রি দ্বিজেন্দ্র লালের 'সীতা' অভিনয় করলেন অপূর্ব সাফল্যে। পরের

বছরেই মনোমোহন থিয়েটারের মঞ্চে তাঁর নিজস্ব সম্প্রদায়ে 'সীতা'র উদ্বোধন হল। এ নাটক কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলালের নয়। প্রতিদ্বন্দ্বী নাট্যশালার চক্রান্তে দ্বিজেন্দ্রলালের 'সীতা'-র অভিনয়-অধিকার থেকে বঞ্চিত হন শিশিরকুমার। কিন্তু অদম্য উৎসাহে সে বাধাও অতিক্রম করলেন। অল্পকালেই নতুন 'সীতা' নাটক রচনা করালেন নাট্যক্ষেত্রে অপরিচিত যোগেশ চৌধুরীকে দিয়ে। তাঁর বিবিধ পরামর্শ নির্দেশাদির ফলেই অতি অল্পকালের মধ্যে যোগেশচন্দ্রের 'সীতা' রচিত হল। নাটকের গান রচনা করলেন শিশির-সুহৃদ সাহিত্যিক হেমেন্দ্রকুমার রায়। গানে সুর দিলেন গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় (শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের দৌহিত্র)। নৃত্য পরিকল্পনা মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের।

নাট্য-মন্দিরের 'সীতা' অভিনয়ে, প্রয়োগ সৌকর্যে, সঙ্গীতে নৃত্যে সুসমঞ্জস হয়ে বাংলার নাট্যক্ষেত্রে নব যুগ প্রবর্তন করে। 'সীতা' শিশির-প্রতিভার বিশিষ্ট ধারায় অভিনব নাট্য সৃষ্টি। ঐতিহ্যবাহী হয়েও নতুন রূপায়ন। অভিনয়-কলা ও প্রয়োগ-পদ্ধতিতেই শুধু যুগান্তর সাধন নয়। রঙ্গ-মঞ্চের ব্যবস্থাপনায়ও তিনি প্রশংসনীয় পরিবর্তন ঘটালেন নাট্যমন্দিরে। সুশিক্ষিত শিশিরকুমারের জাতীয়তাবাদী মনেরও প্রকাশ সেই সঙ্গে দেখা গেল। বাংলা নামকরণ এই প্রথম হল বাংলা নাট্যশালার। পূর্ব যুগের দৃষ্টান্ত ছিল— ন্যাশনাল, গ্রেট ন্যাশনাল, বেঙ্গল, মিনার্ভা, ক্ল্যাসিক, এমারেল্ড, স্টার, কোহিনুর, অরোরা, সিটি, গ্র্যাণ্ড ন্যাশনাল, থেসপিয়ান টেম্পল, আর্ট থিয়েটার ইত্যাদি। ব্যতিক্রম কবি রামকৃষ্ণ রায়ের বীণা থিয়েটার, কিন্তু সেখানেও মনোমোহনের

মতন 'থিয়েটার'। 'নাট্যমন্দির' জাতীয়তার আদর্শ স্থাপন করলে। প্রথম দেখা গেল বাংলায় মুদ্রিত 'প্রবেশ পত্র'। বিদেশী অনুকরণ কন্সার্টের বদলে শানাইয়ে ভারতীয় রাগ-সঙ্গীত ধ্বনিত হল। মঞ্চে পাদপ্রদীপের সারি উঠিয়ে দিলেন প্রয়োগকর্তা। মঞ্চের প্রত্যেক নট নটী স্বাভাবিকভাবে সক্রিয় থাকতেন; নিজের সংলাপের পর পুতুলের অচল অবস্থান না করে। ('When on the stage, everybody must act'—বলতেন নাট্যাচার্য্য)।

এইসব বহিরঙ্গ সংস্কারের সঙ্গে শিশিরকুমারের প্রধান দান অবশ্য ভাবসমৃদ্ধ, অভিব্যক্তি সমুজ্জ্বল, উচ্চারণ ও বক্তব্য অনুসারী হস্ত তথা অঙ্গ সঞ্চালনে অর্থপূর্ণ পরিশীলিত অভিনয়-ধারা। কান্ত কলার শ্রীমণ্ডিত এমন সামগ্রিক প্রয়োগ পরিকল্পনার কোন পূর্ব দৃষ্টান্ত বাংলার নাট্যমঞ্চে ছিল না।

নব্য রীতির রূপায়নে কৃতী শিষ্য মণ্ডলী অর্থাৎ সম্প্রদায় গঠন করলেন নাট্যাচার্য্য। ম্যাডান আমলে যার উন্মেষ, নাট্যমন্দিরে তারই সুপরিণতি। শিশিরকুমারের নাট্যজীবনের পর্বে পর্বে শিষ্যকরণও বঙ্গীয় নাট্য-ইতিহাসের অঙ্গ স্বরূপ।

নাট্যমন্দির অধ্যায়ে জীবন গঙ্গোপাধ্যায়, রবি রায়, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, যোগেশ চৌধুরী, অমলেন্দু লাহিড়ী, (নির্মলেন্দুর ভ্রাতা), নৃপেশ রায়, তারাকুমার ও বিশ্বনাথ ভাহুড়ি, শৈলেন্দ্র চৌধুরী, ভূমেন রায়, ধীরেন্দ্রনাথ দাস (গায়ক), অমিতাভ বসু (অধ্যাপক মন্মথমোহন বসুর পুত্র), তুলসী বন্দ্যোপাধ্যায়, জয়নারায়ণ মুখোপাধ্যায়। চারুশীলা (পূর্ব যুগে নৃত্যগীতের ভূমিকায় অবতীর্ণা হতেন। যেমন, 'আলিবাবা'র-মর্জিনা। নাট্যাচার্যের শিক্ষায় 'ষোড়শী'-র নাম

ভূমিকা, 'দিগ্বিজয়ী'-র সিরাজী চরিত্রে অভিনয়), প্রভাবতী (নর্তকীর ভূমিকা থেকে তাঁর শিক্ষায় 'সীতা' ভূমিকায়। পরবর্তীকালের সর্বশ্রেষ্ঠা অভিনেত্রী), কৃষ্ণভামিনী, কঙ্কাবতী প্রমুখ। তা ভিন্ন, কোন কোন নাটকে তাঁর নির্দেশ নেন, যেমন প্রতিভাধর নট রাধিকানন্দ মুখোপাধ্যায় (সাজাহান নাটকে ঔরংজীব)।

নব নাট্যমন্দির (স্টার মঞ্চে) পর্যায়ে—অমল বন্দ্যোপাধ্যায়, কানু বন্দ্যোপাধ্যায়, জীবেন বসু, অরুণ চট্টোপাধ্যায়, পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায়, রাণীবালা প্রভৃতি।

শ্রীরঙ্গম পর্বে—নীতীশ মুখোপাধ্যায়, কমল মিত্র, কালী সরকার, অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়, মুরারিমোহন ও ভবানীকিশোর ভাদুড়ি, বাণীব্রত, অনুপকুমার (ধীরেন্দ্রনাথ দাসের পুত্র), দুর্গা সান্যাল, গণেশ শর্মা, আদিত্য ঘোষ। নিভাননী, রাজলক্ষ্মী (ছোট), রেবা, সাবিত্রী, কেতকী (প্রভার কন্যা), শেফালিকা (পূর্বে অন্য মঞ্চের), রাধারাণী (গায়িকা), বন্দনা, ঝর্ণা (শেফালিকার কন্যা) প্রভৃতি। কোন কোন ভূমিকার জন্য তাঁর শিক্ষা পান মিহির ভট্টাচার্য্য (দ্বিজদাস), জহর গঙ্গোপাধ্যায় (গদাই), রঞ্জিত রায়, শম্ভু মিত্র (দিলীর খাঁ), মলিনা ('বিপ্রদাসে'র বন্দনা, 'তাইতো'-র নায়িকা), সীতাদেবী (বিজয়া) প্রভৃতি।

শ্রীরঙ্গম নিষ্প্রদীপ হবার অনেক আগে থেকেই তাঁর এই সুবৃহৎ শিষ্যমণ্ডলী মহাকালের আক্রমণে ক্ষীয়মান। স্মৃতির প্রদীপ জ্বেলে নাট্যাচার্য কখনো হয়ত সে বিগতকালের রঙ্গশালার দৃশ্য দেখেন। তার পটে যত আলোর ছটা, তত গাঢ় অন্ধকার। খসে পড়েছে কত তারকা। ইহলোকের অভিনয়

শেষে সময়ে অসময়ে একে একে চলে গেছে তারা : অমলেন্দু লাহিড়ী, নৃপেশ রায়, শীতল পাল, অমিতাভ, যোগেশ চৌধুরী, শৈলেন চৌধুরী, জীবন গাঙ্গুলী, মনোরঞ্জন ভটাচার্য, অমল বন্দ্যোপাধ্যায়, রবি রায়, বিশ্বনাথ, চারুশীলা, কঙ্কা, প্রভা, রাণীবালা, ভবানীকিশোর ('সিরাজুদ্দৌলা'-র করিম চাচা, 'পরিচয়ে'-র ডাক্তার আলী, 'শেষরক্ষা'-র বিনোদ, বিপ্রদাসের দ্বিজদাস, মিহিরের পরে) ···। শেষ পর্য্যায়ের প্রতিভাবান শিষ্য, পরম স্নেহের সর্বকনিষ্ঠ ভ্রাতা ভবানীরও অকালে বিদায় (১৯৫৭) !

এমন বিয়োগ-পঞ্জী। আর জীবনের অবলম্বন মঞ্চ থেকে অনভিপ্রেত অবসর। 'The best moments of my life are on the stage': এই ছিল নাট্যাচার্যের প্রাণের কথা।

এই নিঃসঙ্গ অবস্থাতেও মনোলোকে নটনাথেরই নিত্য আবাহন। সদা-জাগ্রত জাতীয় নাট্যশালার স্বপ্ন। কিন্তু কেবল স্বপ্নে দিনাতিপাত হতে পারে না। অভিনয় সুবিধা মতন করতে হয় এখানে সেখানে। সাংস্কৃতিক সম্মেলনে, নাট্যোৎসবে। কোন কোন অর্ধ-সৌখিন দলে। নিজের অংশ ভিন্ন অন্য কোন দায়িত্ব নেই সেখানে। মঞ্চজীবনে যা আগে অভাবিত ছিল। অন্তরঙ্গদের কাছে নিজেকেই পরিহাস করে বলেন, 'ভাড়াটে কেষ্ট হয়েছি।'

এত বড় ট্র্যাজেডির মধ্যেও নাট্যলোকই ধ্যান জ্ঞান এবং সঞ্জীবনী। তাই একটি অনুরাগী গোষ্ঠীর আগ্রহে এক নাট্য পরিষদ গঠন করতে সম্মত হন (১৯৫৮, জুন)। সেখানে এসে পাঠ করেন নাটক। নাটক সম্বন্ধে আলোচনা

হয়। প্রাথমিক প্রস্তুতি চলে রবীন্দ্রনাথের 'মালিনী' অভিনয়ের।

রঙ্গমঞ্চের রহস্যলোকের বাইরে শিশিরকুমারের 'ক্লোস্ আপ্' দেখা যায়। কথাবার্তায় ব্যবহারে সহৃদয় সৌজন্য। আলাপচারিতে যেমন বিদগ্ধ তেমনি সরস, কৌতুকপ্রিয়। নাটক, কাব্য, সাহিত্য সব চেয়ে প্রিয় প্রসঙ্গ। মননে বাচনে অকৃত্রিম জাতীয়তাবাদী। দেশহিতৈষী, মনস্বী। মধ্যজীবনে যে সুরাপান মাঝে মাঝেই প্রকট হত, শ্রীরঙ্গম শেষ হবার চার-পাঁচ বছর আগে থেকেই তা সম্পূর্ণ বর্জিত। সিঁথির বাড়িতে কোন আহম্মক সুরা উপহার দিতে এলেও ফিরিয়ে দিতেন। এখন তিনি সৌম্য প্রাজ্ঞ জ্ঞান-বৃদ্ধ। কিন্তু জরাজীর্ণতা আসেনি যে বার্ধক্যে। চিরদিনই তিনি অক্লান্ত পাঠক। এখন বিত্তার সমন্বয় সাধন হয়েছে।

জাতীয় নাট্যশালার জন্যে অন্তরাত্মার সেই হাহাকারের দিনে দেখা গেল একটি মর্মন্তুদ প্রহসন। কেন্দ্রীয় সরকার থেকে তাঁকে 'পদ্মভূষণ' উপাধি ভূষণের বার্তা এল—শ্রীরঙ্গমের ঠিকানায়! প্রায় তিন বছর আগে যা তাঁকে ত্যাগ করতে হয়েছে এবং যার তখন 'বিশ্বরূপা'-রূপ।

বিক্ষুব্ধ চিত্তের অভিমানে এই সম্মান প্রদর্শনের প্রস্তাব নাট্যাচার্য প্রত্যাখান করলেন!...

দিন চলে যায় আশ্বাসবিহীন সম্ভাবনা-হীন। নবসৃষ্টির স্বপ্ন দিবা স্বপ্নে পর্যবসিত হতে থাকে। অতৃপ্তির সীমা নেই মনে। দেহপট তখনো প্রায় অটুট, শুধু চক্ষু অল্প-জ্যোতি। বিস্তৃত কপাট বক্ষ, অপরূপ কণ্ঠ-মাধুর্য, শিক্ষাদানে উৎসাহ,

নাট্যসংগঠনী শক্তি এখনো অন্তর্ধান করেনি। কিন্তু চার দেয়ালে প্রায় বন্দী প্রমিথিউস যেন!

আবার আলোর হাতছানি—প্রদোষের পূর্বক্ষণে! এক সভায় শিশিরকুমারের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার ফলে তাঁর জাতীয় নাট্যশালার পরিকল্পনায় সমর্থন জানালেন শৈবাল কুমার গুপ্ত। ক্যালকাটা ইম্প্রুভমেণ্ট ট্রাস্টের তখন চেয়ারম্যান তিনি। তাঁর সংস্থার পক্ষে সহযোগিতার আশ্বাস দিলেন।

সে সম্পর্কে করণীয় সম্পন্ন করবার জন্যে সংগঠিত হল একটি সমিতি। তার সঞ্চালকদের মধ্যে রইলেন তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর (নাট্যাচার্যের প্রতি বহুদিনের শ্রদ্ধাপরায়ণ) প্রমুখ।

এই সময় (১৯৫৯, এপ্রিল) শিশিরকুমারের একটি চোখে অস্ত্রোপচার করা হল।

সেই চক্ষু চিকিৎসাগারে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এলেন সৌমেন্দ্রনাথ।

তাঁর উদ্‌যোগে কেন্দ্রীয় শিক্ষা-মন্ত্রী জাতীয় নাট্যশালা স্থাপনে সহায়তার আশ্বাস দিয়েছেন।

কলকাতা পৌরসভার প্রধান আগ্রহী হয়েছেন এ প্রস্তাবে। সেজন্যে প্রয়োজনীয় জমি পৌর প্রতিষ্ঠান থেকে দেওয়া যেতে পারে, একথাও বলেছেন।

চিকিৎসাগারে অবস্থানের মধ্যেই এসব সংবাদ পেলেন শিশিরকুমার।

কিন্তু নানা কারণে এই সংগঠন সমিতির কাজ আর অগ্রসর হল না। পথ রোধ করে দাঁড়াল সেই 'ছায়া কিংবা কায়া—কোন্ মায়ার সৃজন' ভাগ্য!

চোখ একটু সুস্থ হবার পর তিনি মহাজাতি সদনে ছু রাত্রি অভিনয় করলেন। ৮ ও ১০ই মে (১৯৫৯)—আলমগীর ও রীতিমত নাটক।

সেই যে তাঁর শেষ ভূমিকা তা সকলেরই ধারণার অতীত ছিল। কারণ স্বাস্থ্য সুগঠিত দেখাত, সত্তর বছরেও।

কিন্তু রীতিমত নাটক অভিনয়ের সাত সপ্তা পরেই এল সেই কাল ৩০ জুন তারিখ।

সেদিন সকাল থেকেই শরীরে অস্বস্তি বোধ করতে লাগলেন। বুকে কেমন কষ্ট হতে লাগল বেলা বৃদ্ধির সঙ্গে। এই বাড়িতে একমাত্র সঙ্গী এবং সেবক ভ্রাতা মুরারিমোহন ('সিরাজুদ্দৌলা'-র নাম ভূমিকায় প্রথম অবতীর্ণ শ্রীরঙ্গমে, ১৯৪৭)।

তিনি চিকিৎসক নিয়ে এলেন। পরীক্ষান্তে জানা গেল, হৃদ্-যন্ত্র আক্রান্ত। চিকিৎসকের নির্দেশে, ওষুধের গুণে একটু সুস্থ বোধ করলেন যেন। বিকালটা প্রায় একরকম গেল।

কিন্তু সন্ধ্যার পর থেকে বাড়তে লাগল যন্ত্রণা।

চিকিৎসক আবার এসে পরীক্ষা করলেন। ওষুধ দিলেন ছুরকম। প্রথমটি এখন থেকেই চল্‌বে। যদি কষ্ট না কমে, তখন দ্বিতীয়টি খাবেন।

'আপনি সেরে উঠবেন।'

তখনো সেই স্নিগ্ধ-মধুর অনুপম বাণীধ্বনি, 'সেজন্যে ভাবি না, ডাক্তার। আমার কুষ্ঠিতে আছে, আরো তিন বছর বাঁচব। আরো তিনটে নতুন নাটক করবার ইচ্ছে আছে।

কিন্তু, কিন্তু (বুকে হাত দিয়ে) এই painটা যে একেবারে upset করে দিচ্ছে...

রাত তখন নটা বেজে গেছে। ওষুধ ইত্যাদির ব্যবস্থা করে দিয়ে বিদায় নিলেন চিকিৎসক।...

জীবন-নাটকের অন্তিম দৃশ্য বর্ণনীয় নয়।...

রাত প্রায় দেড়টায় যবনিকা পাত হল।...

আর কোনদিন কোন মঞ্চে প্রবেশ করবেন না শিশিরকুমার!